উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০২১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে "এ" গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই ১২B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল— 'কোর কোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং 'ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগত মানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : স্কিল ইনহেন্সমেন্ট কোর্স

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা

কোর্স কোড : NSE-BG-01

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ২০২৫

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission -Distance Education Bureau.

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
চতুর্বার্ষিক স্নাতক ডিগ্রি প্রোগ্রাম

(Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes)

স্নাতক (সাম্মানিক) বাংলা পাঠক্রম (NBG)

কোর্স : স্কিল ইনহেন্সমেন্ট কোর্স

কোর্সের শিরোনাম : বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা

কোর্স কোড : NSE-BG-01

স্কিল ইনহ্যান্সমেন্ট কোর্স ঃ ০১ Skill Enhancement Coures : 1	**লেখক** Course writer	**সম্পাদক** Editor
মডিউল ঃ ১ ও ২ Module : 1 & 2	**শ্রী সায়নদীপ ব্যানার্জি** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	**অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল** বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
মডিউল ঃ ৩ Module : 3	**ড: অপরূপা ঘোষ** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ জঙ্গীপুর কলেজ	

ফরম্যাট এডিটিং:শ্রীসায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

স্নাতক-বাংলা বিষয় সমিতি:

ড শক্তিনাথ ঝা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ

ড নীহারকান্তি মণ্ডল, সহযোগী অধ্যাপক, মুরলীধর গার্লস কলেজ, কলিকাতা

ড চিত্রিতা ব্যানার্জি, সহযোগী অধ্যাপক, শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা

আব্দুল কাফি, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ড অনামিকা দাস, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

আমন্ত্রিত সদস্য

ড প্রাপ্তি চক্রবর্তী,সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সায়নদীপ ব্যানার্জি, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গীতশ্রী সরকার, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র

নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

Netaji Subhas
Open University

UG : Bengali
(HBG)

NBG
Subject : BENGALI

কোর কোর্স : বাংলা মুদ্রণ : প্রারম্ভিক ধারণা
কোর্স কোড : NSE-BG-01

মডিউল ১ : বাংলা মুদ্রণ : প্রারম্ভিক ধারণা

একক ১ ❑ বাংলা হরফ বিবর্তনের ইতিহাস 9
একক ২ ❑ কপিরাইট ও মুদ্রণ সংক্রান্ত আইন 23
একক ৩ ❑ প্রযুক্তি ও বাংলা মুদ্রণশিল্প 37

মডিউল ২: বাংলার বানান

একক ৪ ❑ বানান সংস্কারের ইতিহাস 69
একক ৫ ❑ মান্য বাংলা বানানবিধি 86
একক ৬ ❑ বাংলা পরিভাষা 105

মডিউল ৩ : বাংলা সম্পাদনা ও প্রকাশনা

একক ৭ ❑ প্রুফ সংশোধন 127
একক ৮ ❑ সম্পাদনার প্রকারভেদ 145
একক ৯ ❑ বাংলা প্রকাশনার ইতিবৃত্ত, গ্রন্থবিন্যাস ও অলংকরণ 165

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

মডিউল- ১

বাংলা মুদ্রণ : প্রারম্ভিক ধারণা

একক ১ : বাংলা হরফ বিবর্তনের ইতিহাস

১.১. উদ্দেশ্য

১.২. প্রস্তাবনা

১.৩. বাংলা লিপির উৎস ও বিবর্তন

১.৪. প্রাক-মুদ্রণ যুগের বাংলা হরফ

১.৫. বাংলা ছাপার হরফের নেপথ্য-কথা

১.৬. মুদ্রণ যুগের বাংলা হরফ

১.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলী

১.১ উদ্দেশ্য

বাংলা টেক্সটে ব্যবহৃত বাংলা লিপির স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি ছাড়াও সংখ্যাচিহ্ন, যতিচিহ্ন, বন্ধনী, গাণিতিক প্রয়োগের চিহ্নাদি, বিশেষ নির্দেশক-চিহ্ন, তারাচিহ্ন ইত্যাদির প্রতিটিই একেকটি বাংলা হরফ। মুদ্রণশিল্পের আবির্ভাবের আগে হরফগুলি হাতে লেখা হত। মুদ্রণশিল্পের আবির্ভাবের পরে এগুলি ছাপাখানাতে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ছাপা হওয়া শুরু হয়। টাইপরাইটারের আবির্ভাবের পর এগুলি ছাপাখানার বাইরে ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরাও ছাপাতে শুরু করেন। টাইপরাইটার বা ছাপাখানায় মুদ্রিত বাংলা হরফকে বাংলা মুদ্রাক্ষর বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে ডেস্কটপ কম্পিউটারভিত্তিক প্রকাশনাতে ডিজিটাল উপায়ে বাংলা হরফ ছাপানোর প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু হয়। কাজেই হাতে লেখা পুথির সময় থেকে আজকের কম্পিউটারে ছাপার যুগ পর্যন্ত বাংলা হরফ কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরাই এই এককটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি এই এককটি পাঠ করলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারব। -

১. এই এককটি পাঠ করলে আমরা বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তুলতে পারব।

২. পুথির যুগে বাংলা হরফ কেমনভাবে লেখা হ'ত সে সম্পর্কেও একটি ধারণা গড়ে তোলা এই এককটি নির্মাণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩. বাংলা ছাপার হরফ কেমনভাবে তৈরি হল সে বিষয়ে আমরা জানতে পারব এই এককটি পাঠ করলে।

৪. সর্বোপরি, আজকের যুগে বাংলা হরফের যে চেহারা তা কীভাবে বিবর্তিত হল সে সম্পর্কেও একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে এই এককটি পাঠ করলে।

১.২ প্রস্তাবনা

এককথায় বাংলা হরফ হল বাংলা লিপিতে লিখিত বা মুদ্রিত বিষয়বস্তু তথা টেক্সটে লিখনের দৃশ্যমান মৌলিক উপাদান। সর্বপ্রথম ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দে আমস্টারডাম থেকে প্রকাশিত “চায়না ইলাস্ট্রেটা” নামক বইয়ে বাঙলা বর্ণমালা'র নমুনা ছাপা হয়েছিলো। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স হুগলিতে ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেডের লেখা 'অ্যা গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' বইটি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে এটি প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত বই। পঞ্চানন কর্মকার তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত প্রযুক্তিজ্ঞান নিয়ে বাংলা হরফ প্রস্তুতের কাজে চার্লস উইলকিন্সকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তৈরি হয় নিখুঁত কেতাদুরস্ত নতুন বাংলা হরফ।/পঞ্চাননই/বাংলা মুদ্রণাক্ষরের স্রষ্টা ও মুদ্রণশিল্পের প্রযুক্তিবিদ। যিনি 'বাঙালি/ক্যাক্সটন' হিসেবে পরিচিত। বর্ণগুলো দেখতে ছিলো আকারে বড়ো, এখনকার বর্ণের চেয়ে একটু আলাদা, তবে অত্যন্ত সুশ্রী ও সাজানো-গোছানো। ১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন ছাপখানা বিশেষজ্ঞ। তারা সেখানে পঞ্চানন কর্মকারের চাকরির ব্যবস্থা করেন। এদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা হরফের চেহারার উন্নতি হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকেই বাংলা ছাপার চেহারা অনেকখানি পাল্টে যায়। ১৮৩১ সালে ভিনসেন্ট ফিগিন্স সম্ভবত প্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ছাপা অক্ষরের সুদর্শন যে রূপটি সংবাদপত্র, বইপত্র, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, গণমাধ্যম, মাল্টিমিডিয়াসহ সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা আসলে ৭০-এর দশকে সৃষ্ট এই লাইনোটাইপ বেঙ্গলির একটি বিশেষ রূপ।

ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড
চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

১.৩ বাংলা লিপির উৎস ও বিবর্তন

মনোভাব-প্রকাশের তাগিদেই মানুষের যাবতীয় ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু মানুষের মুখের ভাষা স্ব-কালে ও স্ব-স্থানে সীমাবদ্ধ থাকে। এই সীমার বন্ধন থেকে ভাষাকে মুক্ত করবার প্রয়োজনেই লিপির উদ্ভব ঘটে। মানুষের ভাষা প্রথম লিপি-রূপ পায় চিত্রাঙ্কনের ও গ্রন্থিলিপির মাধ্যমে। তাই 'আলেখ্য ও স্মারক চিত্র পদ্ধতি'কেই লিপির প্রথম পর্যায় বলে মনে করা হয়। এর দ্বিতীয় লিপি বৈচিত্র্য পর্যায় 'ভাবচিত্র পদ্ধতি'-অনেকেই একে পৃথকভাবে ভাষালিপি (Ideogram) ও চিত্রলিপি (Pictogram) নামে অভিহিত করেন। তৃতীয় পর্যায়ে 'চিত্রপ্রতীকে'র (Hieroglyph) সাহায্যে শব্দলিপি (Phonograph) রচিত হয়।

চীনালিপি এবং প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। শব্দলিপি থেকে চতুর্থ পর্যায়ে সৃষ্ট হ'লো 'অক্ষরলিপি' (Syllabic Script)। বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য লিপি এই পর্যায়ভুক্ত, কারণ এই লিপিতে প্রতিটি ব্যঞ্জনকেই 'অ' স্বরধ্বনিযুক্ত ক'রেই পড়তে হয়। পঞ্চম পর্যায়ে অক্ষরলিপির পরবর্তী স্তর 'ধ্বনিলিপি' (Alphabetic Script)। এই লিপিতে প্রতিটি ধ্বনির জন্য এক একটি বর্ণ (letter) নির্দিষ্ট রয়েছে। রোমক লিপি (A, B, C, D প্রভৃতি) এই পর্যায়ভুক্ত।

বর্তমান কালে পৃথিবীতে যত প্রকার লিপি প্রচলিত রয়েছে, তাদেরকে পাঁচটি বা ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে।

(১) সুমেরীয় লিপি প্রাচীন সুমের জাতির ব্যবহৃত এই লিপি সম্ভবত ছ'হাজার বছরের প্রাচীন। তীরের ফলার মত অক্ষরগুলিকে বলা হয় বাণমুখ লিপি বা 'কীলক লিপি' (Cuneiform)। পারস্যের প্রাচীন হখামনীয় লিপিতেও এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

(২) 'মিশরীয় লিপি'- প্রাচীন মিশরের পিরামিডে প্রাপ্ত এই লিপিতে চিত্র, ভাব ও ধ্বনির সমন্বয় ঘটেছে। এই দুই জাতীয় লিপি বর্তমানে অপ্রচলিত।

(৩ক) 'ফিনিসীয় লিপি'- সম্ভবত মিশরীয় লিপিকে মূল রূপে গ্রহণ ক'রে ফিনিসীয় বণিকগণ ২২টি বর্ণের সাহায্যে এই লিপি সৃষ্টি করেছিল। এই লিপির চরম বিকাশ ঘটে গ্রিকদের হাতে। বর্তমান কালে ইউরোপে প্রচলিত যাবতীয় লিপির মূলে আছে এই লিপি।

(৩খ) 'আরামীয় লিপি'- মিশরীয় লিপিরই অপর একটি ধারা এই আরামীয় লিপি। হিব্রু, আরবী, ফারসি এবং অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত 'খরোষ্ঠী লিপি' এই লিপি থেকে উদ্ভূত। এই লিপি ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হয়।

(৪) 'চীনালিপি'- এটি মূলতঃ চিত্রলিপি থেকে উদ্ভূত হলেও এটি এখনো ধ্বনিলিপিতে পৌঁছতে পারেনি। চীনা লিপিতে প্রতিটি শব্দের জন্য এক একটি অক্ষর রয়েছে। ফলতঃ চীনা লিপিতে অক্ষরের সংখ্যা অন্যূন ৫০ হাজার। জাপানিরা চীনালিপিকে মূল হিশেবে গ্রহণ করেও তাকে ধ্বনিলিপিতে পরিণত ক'রে নিয়েছে। ফলে জাপানি লিপিতে অক্ষর সংখ্যা মাত্র ৪৭টি।

(৫) 'ভারতীয় লিপি'- ভারতীয় লিপির উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মতান্তর থাকলেও অনুমান করা হয়, স্বাধীনভাবেই এই লিপি ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল। একালের পণ্ডিতদের ধারণা খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতকেই বেদের মতো উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচিত হলেও তৎকালে ভারতবর্ষে কোন লিপি প্রচলিত ছিল না। অশোকের শিলালিপিকেই ভারতের প্রাচীনতম লিপি বলে মনে করা হয়। অশোক-অনুশাসনে দু'জাতীয় লিপি পাওয়া যায় একটি আরামীয় লিপি-জাত 'খরোষ্ঠী লিপি', অপরটি 'ব্রাহ্মীলিপি'। এই ব্রাহ্মীলিপিই রূপান্তরিত হ'য়ে কালে কালে ভারতবর্ষের যাবতীয় লিপি, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার বা ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন লিপির জন্মদান করেছে।

ব্রাহ্মী (উপরে বাম), খরোষ্ঠী (উপরে ডান), গ্রীক (নীচে বাম) এবং আরামাইক (নীচে ডানদিকে)।
চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

এই পাঁচটির বাইরে রয়ে গেছে আরো কিছু প্রত্নলিপি যাদের পাঠোদ্ধার না হবার ফলে এদের গোত্রনির্ণয় সম্ভবপর নয়। এদের মধ্যে আছে ক্রীট দ্বীপে প্রাপ্ত খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় সহস্রাব্দের 'মিনোয়ান লিপি', আমেরিকার আদি অধিবাসীদের ব্যবহৃত 'মায়ালিপি', 'আজতেক লিপি' প্রভৃতি এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ প্রাপ্ত প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন 'সিন্ধুলিপি'। সিন্ধুলিপির অন্যূন ৪০০টি প্রতীকচিহ্ন পাওয়া যাওয়াতে মনে হয় যে এগুলি ছিল ভাবচিত্রলিপি ও ধ্বনিমূলক চিহ্ন।

ভারতীয় আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদের নামান্তর 'শ্রুতি'। শুনে শুনেই এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করতে হতো। এতে 'লিপি' বা লেখার পদ্ধতি-বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, এমন কি এ-জাতীয় কোন শব্দও পাওয়া যায় না। অবশ্য বৈদিক যুগের পূর্বেই সিন্ধু সভ্যতার যুগে লিপির প্রচলন ছিল, কিন্তু এই লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়াতে এর সঙ্গে বৈদিক যুগের অথবা পরবর্তী যুগের লিপি পদ্ধতির কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, তা' বলা সম্ভব নয়। অশোকের শিলালিপিতেই আমরা ভারতীয় লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন পাই বলা চলে। এই লিপির নাম 'ব্রাহ্মীলিপি'। অশোক-অনুশাসনে প্রাপ্ত অপর লিপি খরোষ্ঠী ক্রমশ লোপ পেয়ে যায়।

ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব-বিষয়ে মতান্তর থাকলেও এই বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রাহ্মীলিপি স্বাধীনভাবে ভারতে উদ্ভূত এবং বিকশিত হয়েছে। এই ব্রাহ্মীলিপি থেকেই পরবর্তীকালে বঙ্গলিপি-আদি যাবতীয় ভারতীয় লিপির উদ্ভব ঘটেছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি খ্রীঃ পূঃ যুগের মহাস্থানগড় লিপিও ব্রাহ্মীলিপির রূপভেদ মাত্র। গুপ্তযুগেই (খ্রীঃ চতুর্থ শতক থেকে) ব্রাহ্মীলিপির ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই যুগের লিপিকে সাধারণভাবে 'গুপ্তলিপি' নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়েই জাপানের হরিয়ুজি নামক এক বৌদ্ধমঠে আনুমানিক ৫২০ খ্রীঃ রচিত দু'খানি পুথি পাওয়া যায়। এদের

লিপির সঙ্গে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় লিপির সাদৃশ্য পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের পর খ্রিঃ সপ্তম থেকে নবম শতকের মধ্যে বর্ণের উপর মাত্রাদানের ফলে 'কুটিল লিপি'র উদ্ভব ঘটে। পূর্বাঞ্চলীয় এই কুটিল লিপির নাম 'সিদ্ধমাতৃকা'। লিপির বিবর্তনে মধ্য পশ্চিমাঞ্চলে 'নাগরলিপি' এবং উত্তরাঞ্চলে 'শারদা লিপি'র সৃষ্টি হয়।

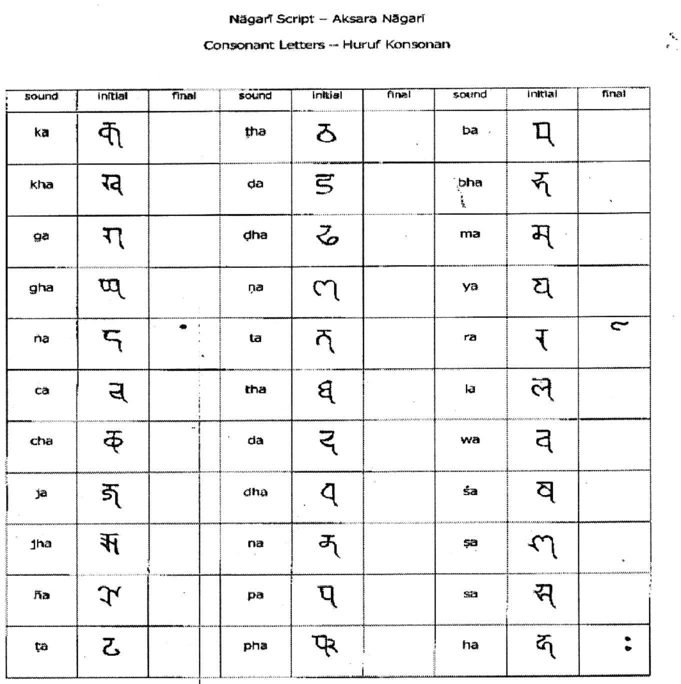

নাগরী লিপি, চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

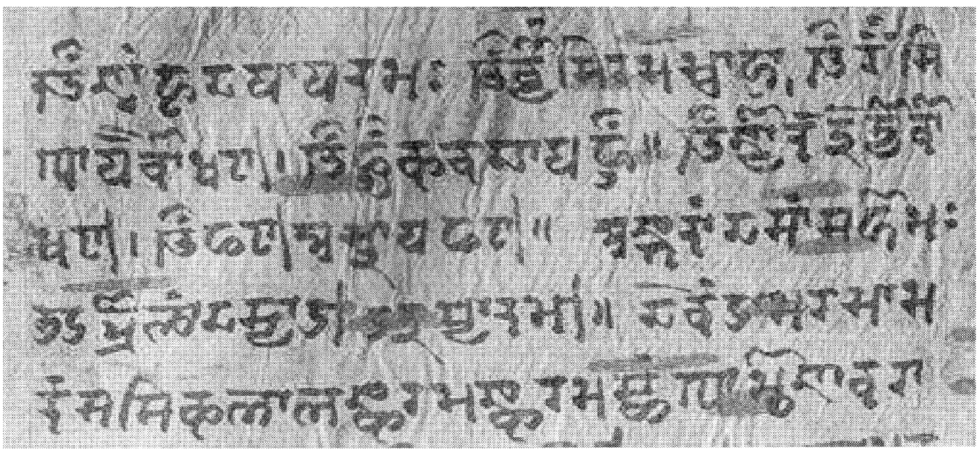

শারদা লিপিতে লেখা কাশ্মীরি শৈব পুঁথি। চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

নবম শতাব্দীতে রচিত নারায়ণপালের ‘তাম্রশাসনে’ কুটিল লিপি থেকে উদ্ভূত ‘বঙ্গ- লিপি’র প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। এই কালের লিপিকে ‘পাল-লিপি’ নামে অভিহিত করা হয়। একাদশ শতকের বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে আধুনিক বঙ্গাক্ষরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ যুগের লিপির প্রচলিত নাম ‘সেন-লিপি’। দ্বাদশ শতকে লক্ষ্মণসেনের ‘তর্পণদীঘি’তেও বঙ্গলিপির নিদর্শন রয়েছে। বাঙলা ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ ‘চর্যাপদে’ এবং ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ যে লিপি ব্যবহৃত হয়েছে, তা খ্রীঃ চর্তুদশ থেকে ষোড়শ শতকের বলে অনুমিত হয়। এগুলিতে ব্যবহৃত কোন কোন সংযুক্ত বর্ণের আকার বর্তমান কাল থেকে পৃথক। এর পরবর্তীকালে বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সকল পুরনো হাতের লেখা পুথি পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে মোটামুটি অক্ষর সাদৃশ্য থাকলেও অঞ্চলভেদে ও ব্যক্তিভেদে কিছুটা বৈচিত্র্যেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মুদ্রণের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত লিপির কোন সুনির্দিষ্ট মান স্থাপিত হতে পারেনি।

বাঙলা লিপির মুদ্রিত রূপের প্রাচীনতম নিদর্শন ১৬৯২ খ্রীঃ লিখিত একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৭২৫ খ্রীঃ জার্মানিতে মুদ্রিত Urent Szeb নামক গ্রন্থে কয়েকটি বাঙলা সংখ্যা এবং “শ্রীসরজন্ত বলপকাং মার” (Sergeant Wolfgang Meryer)- এই নামটি বাঙলা অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে।

ভারতবর্ষে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড-রচিত (১৭৭৮ খ্রীঃ) ‘A Grammar of the Bengal Language’-এর বাঙলা অক্ষরের ছাঁচ তৈরি করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হুগলি কুঠির এক ইংরেজ রাইটার চার্লস উইলকিন্‌স প্রাচীন পুথির অক্ষরের সঙ্গে কালীকুমার রায় ও খুশমৎ মুন্সী নামক দুই ব্যক্তির হস্তাক্ষর মিলিয়ে যে বাঙলা অক্ষরের কাঠামো করে দেন, তাকেই আদর্শরূপে গ্রহণ ক’রে মুদ্রণের অক্ষর তৈরি হয় এবং এখন পর্যন্ত মোটামুটিভাবে বাঙলা অক্ষরের এই আদল চলে আসছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এর কিছুটা সংস্কার সাধন করেছিলেন বলে জানা যায়।

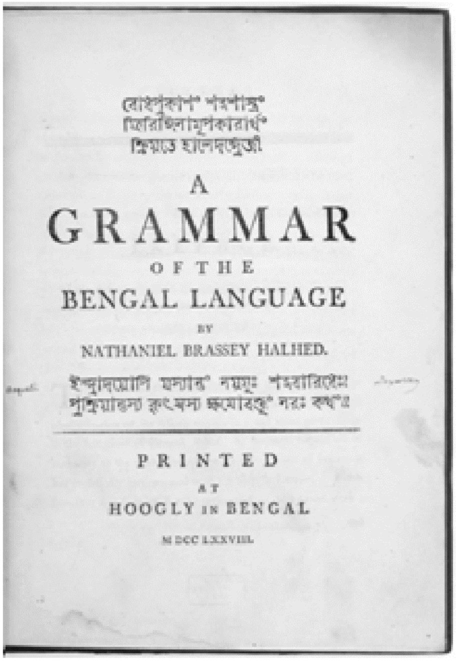
A
GRAMMAR
OF THE
BENGAL LANGUAGE
BY
NATHANIEL BRASSEY HALHED.
PRINTED
AT
HOOGLY IN BENGAL
M DCC LXXVIII.

চিত্র- হ্যালহেডের ‘A Grammar of the Bengal Language’

১.৪ প্রাকমুদ্রণ যুগের বাংলা হরফ

ছাপাখানা আসার আগে বাংলা লিপি হাতে লেখা হত। স্বাভাবিকভাবেই তখন বাংলা হরফের কোন সার্বজনীন রূপ ছিল না। তা স্বত্ত্বেও সে সময় বাংলা লিপি লেখার কিছু ন্যূনতম নিয়মকানুন গড়ে

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

উঠেছিল। পুরাতন বাংলা পুঁথি-পত্র ও দলিল-দস্তাবেজে এগুলির উদাহরণ রয়েছে। এগুলির উপর ভিত্তি করেই বাংলা ছাপাখানার প্রাথমিক যুগের হরফগুলি প্রস্তুত করা হয়। তাই এগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

এসময় বাংলা হরফগুলির উপর মাত্রা অর্থাৎ একটি আনুভূমিক রেখা দেওয়া হত। অর্থাৎ ছাপাখানা আসার আগেই বাংলাতে দেবনাগরী হরফের মত মাত্রা দেবার প্রচলন ছিল। কিন্তু ওড়িয়া, গুজরাতি, ইত্যাদি ভারতীয় লিপিতে মাত্রা ছিল না। বাংলা হরফে মাত্রার পরিমাণ দেবনাগরী হরফের তুলনায় অনেক কম। খ, শ, ণ, প, ইত্যাদি বাংলা হরফে মাত্রার পরিমাণ খুব কম। দেখা গেছে প্রাকমুদ্রণ যুগে কোন্ বাংলা হরফে কী রকম মাত্রা হবে, সেই নিয়মনীতিগুলিই আজও বাংলা হরফে প্রচলিত। বাংলা হরফের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু স্বতন্ত্র জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য এই প্রাকমুদ্রণ যুগেই নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এগুলির মধ্যে নিচেরগুলি উল্লেখযোগ্য—

- অনুভূমিক মাত্রা এবং বিভিন্ন হরফে এর পরিমাণ।
- বেশির ভাগ বাংলা হরফে ব্যবহৃত উল্লম্ব রেখাকৃতি অংশটি।
- ক, ঝ, ধ, ব, র ইত্যদি হরফে ব্যবহৃত ত্রিভুজাকৃতি রূপটি। একই ত্রিভুজটির খানিকটা বিকৃত রূপ খ, ঘ, থ, ফ, য, ষ, ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায়।
- লেখার দিকের সাথে অর্ধ-সমকোণে অঙ্কিত বিভিন্ন রেখাংশ বিভিন্ন হরফে দেখতে পাওয়া যায়। ই, ছ, হ, ইত্যাদির নিচের অংশে, এবং গ, প, শ, ইত্যাদিতে উল্লম্ব রেখার সাথে সংযুক্ত অবস্থায় এরকম রেখাংশ দেখতে পাওয়া যায়।

উপরের সবগুলিই বাংলা হরফকে নিজস্ব জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছে এবং অন্যান্য লিপি থেকে আলাদা করেছে।

এই সময়কার বাংলা হরফে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলি বর্তমান বাংলা হরফে অনুপস্থিত। যেমন -

- র হরফটিকে ব-এর পেটে দাগ কেটে দেখানো যেত। অর্থাৎ পেট-কাটা ব দিয়ে এটি নির্দেশ করা হত। বর্তমানে এটি অসমীয়া লিপিতে প্রচলিত হলেও বাংলায় আর প্রচলিত নেই।
- বর্তমান বাংলা বেশ কিছু হরফের নিচে ফুটকি বা বিন্দু দেয়া হয়। এই ফুটকিগুলি এই যুগে প্রচলিত ছিল না। র-কে পেটকাটা ব দিয়ে নির্দেশ করা হয়। য়-এর নিচে কোন বিন্দু ছিল না; এটি শব্দে অবস্থানভেদে ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হত। আবার ড় এবং ঢ়-এরও কোন অস্তিত্ব ছিল না। ড এবং ঢ শব্দের মাঝে বসলে ড় এবং ঢ়-এর মতো উচ্চারিত হত।
- ত+উ ব্যঞ্জন-স্বর সমবায়টি "ত্তু" দিয়ে প্রকাশ করা হত। আজও কোন কোন আধুনিক বাংলা যুক্তাক্ষরে, যেমন স+ত+উ=স্তু (যেমন— বস্তু) এবং ন+ত+উ=ন্তু (যেমন—কিন্তু) — এই দুইটি যুক্তাক্ষরের ত+উ অংশে এর ফসিল দেখতে পাওয়া যায়।

এ সময় বাংলা ছাপা বইও বের হয়েছে। এগুলিতে বইয়ের একটি পাতা প্রথমে হাতে লেখা হত।

তারপর সেই পুরো পাতার একটি প্রতিলিপি কাঠে বা ধাতুতে খোদাই করে নেওয়া হত। শেষে এই কাঠ বা ধাতুর ফলকে কালি লাগিয়ে একই পাতার অনেক কপি ছাপানো হত। একই লোকের হাতের লেখাতে যে বৈচিত্র্য থাকতে পারে, সেগুলি এই ছাপায় শুধরানো যেত না।

১.৫ বাংলা ছাপার হরফের নেপথ্য-কথা

বাংলায় মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস খুব পুরাতন নয়। কোম্পানীর একজন সিভিলিয়ান- ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড কর্তৃক রচিত ও ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত 'A Grammar of the Bengal Language' গ্রন্থে বাংলা ছাপার অক্ষর সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত এখান থেকেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলা দেশে ইংরেজ-শাসন সুপ্রষ্ঠিত হবার পর ইংরেজরা এদেশের ভাষা শেখার প্রয়োজন অনুভব করতে আরম্ভ করেন। এই প্রয়োজনের বশে ওয়ারেন হেষ্টিংস যখন গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন তখন ন্যাথানিয়েল ব্রাসী হালহেড বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করেন। এই গ্রন্থ লিখিত হবার পর প্রশ্ন ওঠে বাংলা টাইপ ছাড়া তা কী করে ছাপানো যেতে পারে? এর আগে উইলিয়ম বোল্টসবিলেতে এক প্রস্থ (ফাউন্ট) বাংলা অক্ষর তৈরি করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা একেবারে বিফল হয়। এই অবস্থায় ওয়ারেন হেষ্টিংস চার্লস (পরে স্যর চার্লস উইলকিন্স নামে কোম্পানির একজন সিভিলিয়ানকে বাংলা অক্ষরের ছেনি কাটে দিতে অনুরোধ করেন। উইলকিন্স একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংসের উৎসাহে ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করে ১৭৮৫ সনে প্রকাশ করেন। এর আগে কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি। এদেশের ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তা ছাড়া তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ইতিপূর্বে শুধু নিজের খুশিতে বাংলা অক্ষরের দু-একটি ছেনি প্রস্তুত করেছিলেন। এই ঘটনা ওয়ারেন হেষ্টিংসের জানা ছিল বলেই তিনি উইলকিন্সকে বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করবার জন্য অনুরোধ করেন। হালহেডের সঙ্গেও উইলকিন্সের বন্ধুত্ব ছিল। সুতরাং তিনি সাগ্রহে এই কাজে প্রবৃত্ত হলেন। তার জন্য তিনি নিজের হাতে ছেনি কাটা, ঢালাই ও ছাপা প্রভৃতি সকল কাজ করেন। এই ভাবেই প্রথম বাংলা ছাপার হরফের প্রবর্তন হয়।

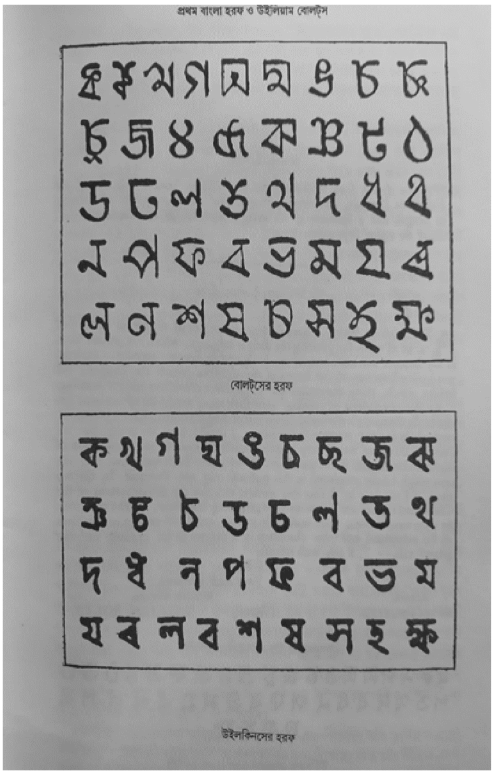

চিত্রঋণ: 'যখন ছাপাখানা এল', শ্রীপান্থ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

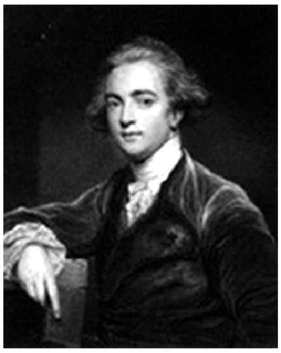

চার্লস উইলকিনস চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

বাংলা অক্ষর তৈরি করতে প্রথম থেকেই উইলকিন্সের সহকর্মী হন একজন বাঙালী; তার নাম পঞ্চানন কর্মকার। উইলকিন্স স্বহস্তে তাঁকে অক্ষরের ছেনি কাটা শিখিয়েছিলেন। এই পঞ্চাননের কর্মপটুতা ও কৃতিত্বের উল্লেখ সমসাময়িক বহু বিবরণে পাওয়া যায়। হালহেডের ব্যাকরণে যে বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছিল, পঞ্চানন তা আরও সুন্দর করে একটি ফাউন্ট তৈরি করেছিলেন। এই অক্ষরে ১৭৯৩ সনে কর্ণওয়ালিসের কোড মুদ্রিত হয়। অনেক দিন ধরে এই টাইপটির প্রচলন ছিল। পঞ্চাননের জন্যই টাইপ নির্মাণ একটি স্থায়ী শিল্পে পরিণত হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ায় পঞ্চানন শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ছাপাখানায় কাজ করতে আরম্ভ করেন। উইলিয়ম কেরী তখন সংস্কৃত ব্যাকরণ মুদ্রণের জন্য উপযুক্ত দেবনাগরী অক্ষরের কথা ভাবছিলেন। এমন সময় পঞ্চাননকে পেয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'নোটবহি'তে পঞ্চানন কীভাবে কেরী সাহেবের সঙ্গে যুক্ত হন তার উল্লেখ আছে। সংস্কৃতভাষাবিৎ বিখ্যাত কোলব্রুক সাহেব তখন পঞ্চাননকে ছেনি কাটার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, পঞ্চানন কলকাতার গার্ডেনরীচে তার মনিবের বাসার কাছাকাছি থাকতেন। কেরী শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কাজের জন্য বারবার কোলব্রুকের কাছে পঞ্চাননকে প্রার্থনা করে বিফল মনোরথ হন, পঞ্চাননের কাছে এ বিষয়ে লিখেও কোন ফল হয় না। কেরী তখন কৌশলের আশ্রয় নেন, গোপনে গোপনে তিনি পঞ্চাননকে বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে বশীভূত করে মাত্র দু-চার দিনের জন্য কাছে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পঞ্চাননকে নিয়ে যান। কোলব্রুকের অনুমতি ছাড়া পঞ্চাননের যাওয়ার উপায় ছিল না, কারণ কেরীর ভয়ে তিনি তার উপর কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন। পাদরি সাহেবের কথায় ভুলে কোলব্রুক পঞ্চাননকে ধার দিলেন বটে কিন্তু তাকে আর ফিরে পান নি। ভিতরে ভিতরে ডেনিশ-সরকারের অনুমোদনে কেরী পঞ্চানন কর্মকারকে শ্রীরামপুরে আটক করে ফেলেন, অবশ্য পঞ্চাননের একেবারে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়। পঞ্চানন কোলব্রুককে লিখলেন তাকে আটক করা হয়েছে। কোলব্রুক এই ব্যাপার নিয়ে একটা সোরগোল তুললেন। ইংরেজ সরকারের দাবীতেও ডেনিশ-সরকার টললেন না। ব্যাপারটা শেষে বিলাত পর্যন্ত পৌঁছেছিল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। কেরীর যুক্তি ছিল এই যে পঞ্চাননের মতো ভারতবর্ষের একমাত্র খোদাইকারক কারও একচেটিয়া সম্পত্তি হতে পারে না।

এই ঘটনা থেকে তখনকার দিনে ছেনি কাটার কাজে পঞ্চাননের কী গুরুত্ব ছিল তা বুঝতে পারা যায়। কেরী অবিলম্বে পঞ্চাননকে দেবনাগরী অক্ষরের একটি ফাউন্ট রচনায় নিযুক্ত করলেন। দেবনাগরী অক্ষরে বহু যুক্তাক্ষর থাকায় সাতশ' ছেনির প্রয়োজন হয়েছিল। কাজটি সত্তর সম্পন্ন করবার জন্য মনোহর নামে একজন কর্মপটু যুবককে পঞ্চাননের সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। এই মনোহর পঞ্চাননের জামাতা। এই কাজে নিযুক্ত থাকা কালে পঞ্চানন বাংলা অক্ষরের আরও একটি ফাউন্ট তৈরি করেন। নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম সংস্করণ যে-অক্ষরে মুদ্রিত হয়, এই নতুন অক্ষর তার থেকে আকারে ছোট এবং দেখতে আরও সুন্দর। ১৮০৩ সনে এই নতুন অক্ষরে নিউ টেস্টামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হতে আরম্ভ হয়। শ্রীরামপুর মিশন পঞ্চানন কর্মকারকে পেয়ে শ্রীরামপুরে একটি টাইপ-ঢালাইয়ের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় প্রবেশ করার বছর তিনেক পরে পঞ্চাননের মৃত্যু হয়।

১.৬ মুদ্রণ যুগের বাংলা হরফ

১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের লেখা 'A Grammar of the Bengal Language' প্রকাশনার মাধ্যমে বাংলা মুদ্রণশিল্পের জন্ম হয়। বইটি ইংরেজি ভাষাতে লেখা হলেও এতে বাংলা বর্ণপরিচয় ও বাংলা লেখার নিদর্শন সবই বাংলা মুদ্রাক্ষরে ছাপা হয়। এই মুদ্রণে প্রথমবারের মত "বিচল হরফ" (movable type) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। জার্মানির ইয়োহানেস গুটেনবার্গ ছিলেন এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক। এই কৌশলে প্রতিটি হরফের জন্য আলাদা একটি ব্লক থাকে, যে ব্লকটিকে ইচ্ছামত নড়ানো ও বসানো যায়। বাংলা মুদ্রণে হালহেডের বইতে চার্লস উইলকিন্স এবং তার সহকারী পঞ্চানন কর্মকার এই প্রযুক্তি প্রথমবারের মত প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতিতে ধাতুর ব্লকে ঢালাই করা একই আকৃতি একই হরফের জন্য একাধিক পাতাতে ব্যবহার করা যায় ব'লে বাংলা ছাপা হরফে একটা স্থায়ী, বৈষম্যহীন রূপ এসেছিল। তবে এই পদ্ধতিতে প্রথম দিককার হরফগুলি খুব সুদৃশ্য ও পরিণত ছিল না। ইংরেজির তুলনায় বাংলা হরফের আকারও ছিল বেশ বড়। ইউরোপে এর প্রায় তিনশ' বছর আগেই বিচল হরফে ছাপার প্রযুক্তি শুরু হয়ে গেলেও বাংলাতে এটি ছিল একেবারেই নতুন একটি ঘটনা। চার্লস উইলকিন্স ও তার সহকারী পঞ্চানন কর্মকার সম্ভবত এ বিষয়ে অভিজ্ঞ কারিগর ছিলেন না।

১৮০০ সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ড ছিলেন ছাপাখানা বিশেষজ্ঞ। তাঁরা সেখানে পঞ্চানন কর্মকারের চাকরির ব্যবস্থা করেন। এদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলা হরফের চেহারার উন্নতি হতে থাকে। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশকেই বাংলা ছাপার চেহারা অনেকখানি পাল্টে যায়। ১৮৩১ সালে ভিনসেন্ট ফিগিন্স সম্ভবত প্রথম বাণিজ্যিকভাবে বিক্রির জন্য বাংলা হরফ তৈরি করেছিলেন। এই সময়কার বাংলা হরফের বৈশিষ্ট্যগুলি এরকম :

- অনুস্বরের নিচের দাগটি ছিল না। ছিল কেবল গোল চিহ্ন।
- ব্যঞ্জনের খাড়া দাগের সাথে য-ফলা মিলে বাঁকিয়ে কমলার কোয়ার মত একটা চেহারা ছিল।

এগুলি আজও কখনো কখনো দেখতে পাওয়া যায়। আধুনিক কম্পিউটারের লিখন ফন্টে স্য-তে এর দেখা মেলে।

- "ত্থ" যুক্তাক্ষরটি বর্তমান চেহারা পায়। অর্থাৎ ত-এর নিচে ু বসিয়ে।
- স্থ (স+থ) যুক্তবর্ণটি হালেদের সময়ে, অর্থাৎ ১৮শ শতকে স-এর নিচে পরিষ্কার থ লিখে দেখানো হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি স-এর নিচে ছোট হ-এর মত অক্ষর বসিয়ে নির্দেশ করা হয়। ফলে যুক্তাক্ষরটি অস্বচ্ছ রূপ ধারণ করে। এখনও এই অস্বচ্ছ রূপটিই ব্যবহার করা হয়। এরকম আরও বহু যুক্তাক্ষরের অস্বচ্ছ রূপ ঊনবিংশ শতকের শুরুর এই পর্বে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।
- র বর্ণটি হরফটি হালেদের সময়ে পেট কাটা ব এবং ব-এর নিচে ফুটকি উভয় রূপেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ১৮শ শতকের মাঝামাঝিতে এই পর্বের শেষে এসে বর্তমান ফুটকিযুক্ত রূপটিই সর্বত্র প্রচলিত হয়ে যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য একটি ছাপাখানা খোলেন। বিদ্যাসাগর বাংলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য অনেকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এগুলি হল এরকম:

- সংস্কৃতের "অন্তঃস্থ য়" বর্ণটি বাংলায় "য" হরফ দিয়ে লেখা হত, কিন্তু শব্দে অবস্থানভেদে এর উচ্চারণ বর্তমান বর্গীয় জ কিংবা অন্তঃস্থ য়-এর মতো উচ্চারিত হত। বিদ্যাসাগর বর্গীয় জ উচ্চারণের ক্ষেত্রে য বর্ণটি ব্যবহার এবং অন্তঃস্থ য় উচ্চারণের ক্ষেত্রে য-এর নিচে ফুটকি দিয়ে নতুন "য়" বর্ণটি ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন।
- একইভাবে ড ও ঢ-এর নিচে ফুটকি দিয়ে বিদ্যাসাগর ড় ও ঢ় হরফ দুইটির প্রচলন করেছিলেন।
- বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় অব্যবহৃত দীর্ঘ- ও দীর্ঘ- বর্ণ দুইটি বর্জন করেছিলেন। তবে কেবল "ঌ" বর্ণটিরও বাংলায় প্রচলন ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগর এ নিয়ে কিছু বলেননি।
- এছাড়া সংস্কৃত স্বরবর্ণমালার অন্তর্গত অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ), এবং চন্দ্রবিন্দু (ँ) যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ব্যঞ্জনবর্ণ সেহেতু বিদ্যাসাগর এই বর্ণগুলিকে ব্যঞ্জনবর্ণমালার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণ হলেও যেহেতু এগুলি স্বতন্ত্র বর্ণ নয়, অযোগবাহ বর্ণ সেহেতু কোন বাংলা অভিধানেই বিদ্যাসাগরপ্রণীত বর্ণক্রমটি গৃহীত হয়নি।

বিদ্যাসাগর ণ-ন এবং শ-ষ-স-এর মধ্যে উচ্চারণের সমতা সম্ভবত লক্ষ্য করলেও এর কোন সংস্কার করেন নি। সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত হরফ সরাসরি নকল না করে বাংলা ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বাংলা হরফ নেবার বৈপ্লবিক উদ্যোগ বিদ্যাসাগরই প্রথম নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর বাংলা হরফের স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের জন্যও বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন:

- তিনি য-ফলাকে ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত করে কমলার কোয়ার মতো না লিখে আলাদা করে লেখার ধারা প্রচলন করেন। ফলে সর্বত্র য-ফলার আকার একই রূপ পেল।

- বিদ্যাসাগরের আগে ঋ-কার ব্যঞ্জনের তলে বিভিন্ন রূপে বসত। বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যঞ্জনের নিচে পরিষ্কারভাবে ৃ চিহ্নটি বসিয়ে লেখা প্রচলন করেন। একইভাবে হ্রস্ব-উ কারের জন্য ু লেখা প্রচলন করেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সংস্কারগুলি সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। অনেকগুলি অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের চিহ্ন অস্বচ্ছই থেকে গিয়েছিল। যেমন - তু ত-এর নিচে উ-কার দিয়ে লেখা হলেও ন্তু, স্তু যুক্তাক্ষরগুলিতে পুরনো অস্বচ্ছ রূপটিই থেকে গেল। ইংরেজি বিচল হরফগুলি একটি ডালায় দুই খোপে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী সাজানো থাকত। কিন্তু বাংলায় এ নিয়ে তেমন কোন চিন্তা হয় নি। বিদ্যাসাগরই প্রথম বাংলা হরফের জন্য ডালার একটি নকশা এবং কোন হরফের পর কোন হরফ বসবে তার নিয়ম স্থির করে দেন। তার এই নকশাই ক্রমে সমস্ত বিচল হরফ ব্যবহারকারী বাংলা ছাপাখানাতে গৃহীত হয়। বাংলা মুদ্রণশিল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় সমতা। বিদ্যাসাগর বাংলা মুদ্রণশিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। মূলত তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়মনীতি অনুসারেই পরবর্তী একশো বছর, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা হরফ মুদ্রিত হয়।

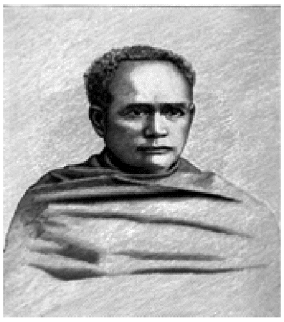

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সময়ের সাথে বিদ্যাসাগরীয় হরফের সামান্য কিছু পরিমার্জনের চেষ্টাও করা হয়েছে। বিদ্যাসাগর নিজে *বর্ণপরিচয়*-এর ৬০তম সংস্করণ থেকে শব্দের শেষে অন্তর্নিহিত ও উচ্চারণযুক্ত ব্যঞ্জন, যেমন- "বিগত", "কত" শব্দের শেষের ত-টা, যেন ৎ-এর মত উচ্চারণ না হয়, সেজন্য এগুলির উপর তারাচিহ্ন দেয়া প্রবর্তন করেন। বিংশ শতাব্দীতে অনেক লেখক একই কাজে ঊর্ধকমা (') ব্যবহার করেছেন, যেমন- একশ', ইত্যাদি। তবে এই সংস্কারটি সর্বজনগৃহীত হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিদ্যাসাগরীয় হরফের দুই ধরনের এ-কার (মাত্রাছাড়া ও মাত্রাসহ) দুইটি ভিন্ন কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। তিনি শব্দের শুরুর মাত্রাযুক্ত এ-কার দিয়ে "অ্যা" ধ্বনি বুঝিয়ে ছাপানো শুরু করেন। তবে বিশ্বভারতী ছাড়া অন্য বেশির ভাগ প্রকাশকই এই রীতিটি গ্রহণ করেনি।

ইউরোপে ১৯শ শতকের শেষ দিকে লাইনোটাইপ মেশিনে ছাপানোর চল হয়। ১৯৩০-এর দশকে বাংলা হরফও লাইনো মেশিনে ছাপানোর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। লাইনোটাইপ মেশিনে ছাপানোর অনেক সুবিধা থাকলেও এর একটি অসুবিধা ছিল এতে আড়াইশো-র মত চিহ্ন রাখার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরীয় পদ্ধতিতে হরফের সংখ্যা ছিল বিশাল। "করণ টাইপ" নামের এক পদ্ধতিতে এর সংখ্যা কমলেও তার পরেও সব মিলিয়ে প্রায় ৬০০-র মত হরফের ব্লক প্রয়োজন হত। আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থার/সুরেশচন্দ্র মজুমদার/রাজশেখর বসুর পরামর্শে বাংলা হরফের বিরাট আকারের সংস্কার সাধন করেন। তিনি স্বরবর্ণের কার-চিহ্নগুলি সকল ক্ষেত্রে একই আকারের রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এগুলি ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জনের নিচে বা উপরে না বসিয়ে সামান্য ডানে বা বামে সরিয়ে আলাদা অক্ষর হিসেবে ছাপার ব্যবস্থা করলেন। এছাড়াও তিনি অনেক যুক্তব্যঞ্জনের একই উপাদান ব্যঞ্জনাক্ষরের সাধারণ আদল

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

আলাদা করে সেটির হরফ বানালেন, ফলে যুক্তব্যঞ্জন ছাপানোতেও হরফের সংখ্যার অনেক সাশ্রয় হল। শেষ পর্যন্ত সুরেশচন্দ্র বাংলা হরফের সংখ্যাকে চাবির ডালায় ১২৪টি এবং বিবিধ আরও ৫০টিতে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমা বিশ্বে অফসেট লিথোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং এর সূত্র ধরে ফটোটাইপসেটিং নামক হরফ বসানোর প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়াতে ফটোটাইপসেটার নামের একটি যন্ত্রের মাধ্যমে আলোকচিত্র-কাগজে হরফের সারি ছাপানো হয়, যা পরবর্তীতে অফসেট মুদ্রণ প্রক্রিয়াতে ব্যবহার করা হয়।

১৯৭০-এর দশকে শেষের দিকে আনন্দবাজার পত্রিকা যুক্তরাজ্যে অবস্থিত লাইনোটাইপ-পল লিমিটেড নামের সংস্থাকে ফটোটাইপসেটিং প্রক্রিয়াতে ব্যবহারের জন্য একটি নতুন বাংলা মুদ্রাক্ষর-ছাঁদ (typeface) তৈরি করার অর্ডার দেয়। লাইনোটাইপ-পল লিমিটেডের মুদ্রাক্ষরশৈলী (Non-Latin typography) বিভাগের প্রধান ফিওনা রস, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে আগত ডক্টর তারাপদ মুখোপাধ্যায় এবং মুদ্রাক্ষর-নকশাবিদ টিম হলোওয়েকে নিয়ে গঠিত দল ১৯৭৮ সালে এই নতুন মুদ্রাক্ষর-ছাঁদ তৈরিতে হাত দেন। এই লক্ষ্যে ফিওনা রস ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত ইন্ডিয়া অফিস সংরক্ষণশালা থেকে বহু পুরাতন বাংলা পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ক'রে সেগুলি বিশ্লেষণ করেন; তারাপদ মুখোপাধ্যায় এ-কাজে তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন। রসের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি ক'রে নকশাবিদ হলোওয়ে নতুন ছাঁদটি নকশা করেন। এই ছাঁদটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন। লাইনোটাইপ বা অন্য কোন কোম্পানির দ্বারা অতীতে ব্যবহৃত কোন হট মেটাল বা তপ্তধাতু হরফের ছাঁদকেই এই নকশাতে মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। ছাঁদটির নাম দেওয়া হয় লাইনোটাইপ বেঙ্গলি (Linotype Bengali)।

মুদ্রাক্ষরশৈলীর দৃষ্টিকোণ থেকে লাইনোটাইপ বেঙ্গলি প্রতিভাবান নকশাবিদ টিম হলোওয়ের এক অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি। ফিওনা রসের গবেষণার উপর ভিত্তি করে হলোওয়ে তার প্রতিটি বাংলা হরফের নকশায় যেসব সমতাবিধায়ক মূলনীতি (principle), ফিচার (feature) ও জেশ্চার (gesture) ব্যবহার করেছেন, তা একেবারেই মৌলিক। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাপা অক্ষরের সুদর্শন যে রূপটি সংবাদপত্র, বইপত্র, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, গণমাধ্যম, মাল্টিমিডিয়াসহ সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায়, তা আসলে ৭০-এর দশকে সৃষ্ট এই লাইনোটাইপ বেঙ্গলিরই কোনও না কোন রূপ।

১.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) 'বাঙালি ক্যাক্সটন' নামে কাকে অভিহিত করা হয়?

২) কত সালে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩) বাংলা মুদ্রাক্ষর বলতে কী বোঝায়?

৪) কবে, কোথায় প্রথম বাংলা বর্ণমালার নমুনা ছাপা হয়েছিল?

৫) প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত বই কোনটি? এটি কে, কত খ্রিস্টাব্দে রচনা করেন?

৬) শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসে ছাপাখানার কাজে কারা বিশেষজ্ঞরূপে নিযুক্ত ছিলেন?

৭) বাণমুখ লিপি বলতে কোন লিপিগুলিকে বোঝায়? এর আকৃতি কেমন ছিল?

৮) সম্রাট অশোকের অনুশাসনে কয় প্রকার ও কোন কোন লিপি দেখতে পাওয়া যায়?

৯) কুটিল লিপির উদ্ভব কোন সময়ে ঘটে? অঞ্চলভেদে কুটিল লিপি কি কি রূপ লাভ করেছে?

১০) 'লাইনোটাইপ বেঙ্গলি' কার সৃষ্টি?

১১) বঙ্গলিপির প্রাচীনতম নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

১২) ভারতবর্ষে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কোনটি? এই গ্রন্থে বাংলা অক্ষরের ছাঁচ কারা নির্মাণ করেন?

১৩) 'বিচল হরফ' বা Movable type প্রযুক্তি কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হয়? এই প্রযুক্তির উদ্ভাবক কে ছিলেন?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) টীকা রচনা করুন : বাংলা মুদ্রাক্ষর, ব্রাহ্মী লিপি, লাইনোটাইপ বেঙ্গলি

২) বাংলা হরফের পরিমার্জনায় বিদ্যাসাগরের অবদান কতখানি? উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৩) মানুষের মুখের ভাষা কতগুলি পর্যায় অতিক্রম করে কী কীভাবে লিপিতে পরিণত হয়েছে? এ সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৪) ভারতীয় লিপি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করুন।

বিস্তারিত প্রশ্ন :

১) বর্তমানকালে পৃথিবীতে যতপ্রকার লিপি প্রচলিত আছে সেগুলিকে কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক ভাগগুলি সম্পর্কে কিছু লিখুন।

২) প্রাকমুদ্রণ যুগে বাংলা হরফের বিশেষত্ব কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৩) মুদ্রণ যুগের বাংলা হরফের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

একক ২ : কপিরাইট ও মুদ্রণ সংক্রান্ত আইন

২.১. উদ্দেশ্য

২.২. প্রস্তাবনা

২.৩. কপিরাইট কী ও কেন?

২.৪. কপিরাইট আইন

২.৫. ভারতীয় কপিরাইট আইন ও কুম্ভীলকবৃত্তি

২.৬. দেশীয় মুদ্রণ আইন

২.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলী

২.১ উদ্দেশ্য

মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের আগে সৃজনশীল রচনা প্রচারের সুযোগ খুবই সীমিত ছিল। সেই সঙ্গে সৃষ্ট রচনার অপব্যবহারেরও সম্ভাবনা ছিল কম। মুদ্রণ শিল্প প্রবর্তনের সঙ্গে যখন পাণ্ডুলিপি ইচ্ছামত সংখ্যায় কপি করা সহজসাধ্য হল, তখন থেকেই রচয়িতার স্বত্ব সংরক্ষণের জন্য কপিরাইট আইনের প্রয়োজন দেখা দিল। কোন বস্তুগত জিনিসের যেমন মালিকানা থাকে, তেমনই প্রতিভা ও মেধা দিয়ে তৈরি সম্পদেরও মালিকানা থাকে। কপিরাইট মানে হচ্ছে মেধাসম্পদের উপর মালিকানার স্বীকৃতি। কোনো মেধাসম্পদের ব্যবহার, বিপণন বা ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যিনি তা সৃষ্টি করলেন তার অধিকার সুরক্ষিত করে এই কপিরাইট আইন। পৃথিবীর দেশে দেশে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের কপি বা পুনরুৎপাদন, অবৈধ ব্যবহার ইত্যাদি বন্ধের জন্য আইন বিধান রাখা হয়। যেহেতু এই আইন কপি বা পুনরুৎপাদনের অধিকার সংরক্ষণ নিয়ে তৈরি তাই এটিকে কপিরাইট (Copyright) আইন বা সংক্ষেপে কপিরাইট বলে। বক্ষ্যমাণ এককটি এই আইনকে কেন্দ্র করেই নির্মিত। এই এককটি নির্মাণের একাধিক উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন—

১. এই এককটি পাঠ করলে আপনারা কপিরাইট কাকে বলে, কপিরাইটের গুরুত্ব কী, কেন কপিরাইট প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে বিশদ আকারে জানতে পারবেন।

২. কপিরাইট আইন সম্পর্কে বিশদে জানতে পারবেন।

৩. ভারতে এই আইন কীভাবে প্রযুক্ত হয় সে সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।

৪. এই আইন আমাদের কোন কোন অধিকার প্রদান করে সে সম্পর্কেও ধারণা লাভ করতে পারবেন।

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

৫. দেশীয় মুদ্রণ আইনের পাশাপাশি আমরা এই এককটি পাঠ করলে কুম্ভীলক বৃত্তি সম্পর্কেও জানতে পারব।

২.২ প্রস্তাবনা

কপিরাইট (বা লেখকের অধিকার) হল একটি আইনি শব্দ যা নির্মাতাদের সাহিত্য এবং শৈল্পিক কাজের উপর যে অধিকার রয়েছে তা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। কপিরাইট সেই মূল সৃষ্টিকে আইনত রক্ষা করার জন্য একটি সুরক্ষা হিসাবে কাজ করে। কপিরাইট আইনে বলা হয়েছে যে-কোনো কাজ যদি লেখক স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং কোথাও থেকে অনুলিপি না করে তৈরি করে তাহলে সেটি আসল। আপনার পণ্যের সেই কপিরাইট থাকলে, কেউ আপনার কাজ ব্যবহার বা প্রতিলিপি করতে পারবে না। কপিরাইট আইন না থাকলে চিন্তাবিদ ও শিল্পীদের রচনা ও শিল্পকর্ম যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হওয়ায়, স্রষ্টা তাদের ন্যায্য সামাজিক স্বীকৃতি ও আর্থিক প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এরূপ পরিবেশে জ্ঞান ও শিল্পচর্চার প্রবণতা স্তব্ধ না হলেও, হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে, কপিরাইট আইন শুধু জ্ঞান ও শিল্প-চর্চাকে উৎসাহিতই করে না, নতুন চিন্তাধারা ও শিল্প প্রকাশ ও প্রচারের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগে প্রায় সকল রাষ্ট্রই কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের উপযুক্ত কপিরাইট আইন প্রবর্তন করেছে।

২.৩ কপিরাইট কী ও কেন?

মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যমান একটি আইনি অধিকার, যাতে কোনও মৌলিক সৃষ্টিকর্মের মূল সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কোনও পক্ষ সেই সৃষ্টিকর্ম ব্যবহার করতে পারবে কি না কিংবা কোন শর্তে ব্যবহার করতে পারবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে মূল সৃষ্টিকর্তাকে একক ও অনন্য অধিকার প্রদান করা হয়। মেধাস্বত্ব সাধারণত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ওই মেয়াদের পর কাজটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্রের বা জনক্ষেত্রের (Public Domain) অন্তর্গত হয়ে যায়।

মেধাস্বত্ব ছাড়াও আরেক ধরনের মেধা সম্পদ অধিকার বা স্বত্ব আছে, সেটি হল শিল্প-সম্পত্তি স্বত্ব। এই অনন্য অধিকারগুলি পরম অধিকার নয়, বরং এগুলির সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রম আছে (যেমন, ন্যায্য ব্যবহার বা Fair Use)। বৌদ্ধিক বা মেধাভিত্তিক সৃষ্টিকর্মটি যদি কোনও গ্রন্থ হয়, তাহলে বাংলাতে তার মেধাস্বত্বকে বিশেষ একটি পরিভাষা "গ্রন্থস্বত্ব" দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এছাড়া গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য রচনার জন্য সাধারণভাবে "লেখকস্বত্ব", "রচনাস্বত্ব" ইত্যাদি পরিভাষাও প্রচলিত। মেধাস্বত্ব বা কপিরাইটের আন্তর্জাতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে গেলে ইংরেজি Copyright শব্দের আদ্যক্ষর C-কে একটি বৃত্তের ভেতরে স্থাপন করা হয়, এবং কিছু কিছু স্থানে বা আইনের এখতিয়ারে এটার বিকল্প

হিসেবে (c) বা (C) লেখা হয়। সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শিল্পের বিভিন্ন প্রকার কাজের একটা বিরাট পরিব্যাপ্তিতে মেধাস্বত্ব থাকতে পারে বা হওয়া সম্ভব। কবিতা, অভিসন্দর্ভ, নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, চলচ্চিত্র, নৃত্যবিন্যাস (নাচ, ব্যালে ইত্যাদি), সঙ্গীত রচনা, ধারণকৃত শব্দ, চিত্রকর্ম, অঙ্কন, মূর্তি বা প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, সফটওয়্যার, বেতার ও টেলিভিশনের সরাসরি ও অন্যান্য সম্প্রচার, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিল্প-নকশা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন) এর অন্তর্গত।

ছাপাখানার প্রসার হওয়ার আগে পর্যন্ত মেধাস্বত্ব উদ্ভাবিত হয়নি। আঠারো শতকের শুরুর দিকে ছাপাখানাগুলোর একচেটিয়া আচরণের প্রতিক্রিয়ায় প্রথমে ব্রিটেনে এরকম একটা আইনের ধারণা জন্ম নেয়। ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস বইগুলির অনৈতিক অনুলিপি তৈরির ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে, রাজকীয় বিশেষাধিকার প্রয়োগ করে লাইসেন্স বা অনুমোদন বিধিমালা, ১৬৬২ জারি করেন; এর ফলে অনুমোদনপ্রাপ্ত বইগুলির একটি নিবন্ধন তালিকা প্রতিষ্ঠা করতে হয়, এবং এটার একটা অনুলিপি সমস্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে জমা রাখতে হয়, এবং প্রয়োজন অনুসারে সুপ্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুমোদন দেওয়া শুরু করা হয়।

'দ্য স্ট্যাচু অব অ্যান' ছিল মেধাস্বত্ব দ্বারা সংরক্ষিত প্রথম সৃষ্টিকর্ম। এর লেখককে নির্দিষ্ট সময়ের মেধাস্বত্ব প্রদান করা হয়েছিল এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ের পরে মেধাস্বত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট বই ও মানচিত্র প্রকাশের এবং অনুলিপি নিয়ন্ত্রণের একটি আইনি ক্ষেত্র থেকে সম্প্রসারিত হয়েছে এবং প্রায় সকল আধুনিক শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাববিস্তারকারী বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে শব্দধারণ, চলচ্চিত্র, আলোকচিত্র, সফটওয়্যার এবং স্থাপত্যের কাজ মেধাস্বত্বের আওতাভুক্ত। ১৮৮৬ সালের বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতা প্রথমে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিতে মেধাস্বত্বের স্বীকৃতি দেয়। এই বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতা অনুসারে, মৌলিক কাজের মেধাস্বত্ব অর্জন করতে বা ঘোষণা করতে হবে না, কারণ সেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সৃষ্টির সাথে সাথে কার্যকর হয়: বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতায় স্বাক্ষরকারী কোনও রাষ্ট্রের একজন লেখককে মেধাস্বত্বের জন্য কোন আবেদন বা নিবন্ধন করার প্রয়োজন হবে না। যখনই কাজটা সম্পন্ন হবে, অর্থাৎ লিখিত কিংবা অন্য কোনও মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হবে, এর স্রষ্টা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সেই কাজ এবং সেখান থেকে উৎপন্ন অন্যান্য কাজের সমস্ত মেধাস্বত্বের অধিকারী হবেন, যদি না সেই স্রষ্টা সুনির্দিষ্টভাবে তার সৃষ্টিকর্মের স্বত্ব ত্যাগ করার ঘোষণা দেন কিংবা মেধাস্বত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। বিদেশি লেখকের মেধাস্বত্বের অধিকারও বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতা স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ স্বদেশী লেখকদের মতই সমভাবে নিশ্চিত করে। যুক্তরাজ্য ১৮৮৭ সালে বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতাতে স্বাক্ষর করে কিন্তু ১৯৮৮ সালের কপিরাইট ডিজাইন এন্ড প্যাটেন্ট অ্যাকট (মেধাস্বত্ব, নকশা ও কৃতিস্বত্ব বিধিমালা) অনুমোদিত হওয়ার আগের ১০০ বছর সমঝোতার বিরাট অংশের কোনও আইনি প্রয়োগ করেনি। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৯ সালের আগে পর্যন্ত বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতাতে স্বাক্ষর করেনি। বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতার বিধিমালা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার TRIP চুক্তির সাথে একীভূত করা হয়, এবং এভাবে বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

এবার এককথায় আমরা এই কপিরাইট আইনের সুবিধার দিকগুলি চিহ্নিত করতে পারি।—

১. এই আইন লেখকের উদ্ভাবিত সৃজনকর্মের সুরক্ষাকে প্রসারিত করে।

২. কপিরাইট আইনের বলে লেখক বেআইনি অনুলিপিকারীকে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে তা বন্ধ করতে পারেন।

৩. কপিরাইট আইন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪. কপিরাইট আইনের মূলে রয়েছে উদ্ভাবনের জন্য একটি গভীর উদ্দীপনা।

কপিরাইট আইন আমাদের দুই প্রকার অধিকার প্রদান করে, —

১. অর্থনৈতিক অধিকার- অর্থনৈতিক অধিকার লেখকের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে এবং লেখককে একটি কাজের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের অনুমতি দেয়।

২. নৈতিক অধিকার— নৈতিক অধিকার একটি কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা স্রষ্টার সৃজনশীল অখণ্ডতা এবং খ্যাতি রক্ষা করে। কপিরাইট আইনে মুদ্রণ, বণ্টন ও প্রদর্শন দ্বারা রচনাকে জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার স্বত্বগুলি রচয়িতাকে একান্ত নিজস্বভাবে ভোগ করার অধিকার দেওয়া আছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অধিকারগুলি হচ্ছে:

১. রচনা প্রকাশন ও বণ্টন।

২. সর্বসাধারণের জন্য (প্রকাশ্যে) আবৃত্তি ও অভিনয়।

৩. রচনার অনুবাদ করা, এবং সেই অনুবাদ প্রকাশ ও বণ্টন।

৪. রচনাকে চলচ্চিত্র বা রেকর্ডে রূপায়িত করা।

৫. বেতার বা লাউড স্পিকার মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশন।

৬. রচনা অবলম্বনে নতুন কিছু সৃষ্টি করা-অভিযোজন (Adaptation), যথা- নাটককে গল্পে বা উপন্যাসে রূপান্তরিত করা; গল্প বা উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা; অভিনয় বা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিবেশন করার উপযুক্ত করা, রচনাকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে চিত্রে রূপায়িত করে প্রকাশ করা মূল রচনার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করা।

কপিরাইট আইনের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ নিয়মে যে-কোন মৌলিক রচনার রচয়িতা কপিরাইট স্বত্বাধিকারী-রূপে গণ্য হন। অনামা বা ছদ্মনামে রচনা প্রকাশ কপিরাইট আইনে স্বীকৃত। অনেক রাষ্ট্রের আইনে এরূপ রচনার প্রকাশককে গ্রন্থস্বত্বাধিকারীরূপে কাজ করার অধিকার দেওয়া আছে। সাধারণত রচয়িতা যদি কোন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা বা কোন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, বা তার কর্মী বা শিক্ষানবিশ থাকাকালে সেই সংবাদপত্র, পত্রিকা বা সংস্থার প্রকাশের জন্য কোন রচনা সৃষ্টি করেন, এবং চুক্তিতে রচনার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বিশেষভাবে কোন উল্লেখ না থাকে, সে ক্ষেত্রে সেই নিয়োগকারী সংবাদপত্র, পত্রিকা, বা সংস্থা রচনার প্রথম স্বত্বাধিকারীরূপে গণ্য হয়। তবে

ভারতীয় কপিরাইট আইনে এরূপ ক্ষেত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার জন্য সৃষ্ট রচনার রচয়িতার পক্ষে আইনটি বিশেষভাবে শিথিল করা আছে।

কপিরাইট আইন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (Unesco) বলেছে যে মানুষের সৃষ্ট সম্পদই মানুষের সব থেকে নিজস্ব সম্পদ। কপিরাইট আইন এই নীতির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং লেখক ও শিল্পীর রচনা ও শিল্পকর্মের ওপর তাদের একচেটিয়া স্বত্ব কপিরাইট আইনে স্বীকৃত। এই স্বত্ব স্বীকার ক'রে কপিরাইট আইন গ্রন্থ ও শিল্পকর্মকে অন্যের দ্বারা যথেচ্ছ ব্যবহার বা অপব্যবহার থেকে রক্ষা করে, এবং রচয়িতা ও শিল্পীর আর্থিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখে।

২.৪ কপিরাইট আইন

কপিরাইট আইন সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় ইংলন্ডে, ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে। আঠারো শতকের মধ্যেই ইউরোপের অনেক রাষ্ট্রে এবং মার্কিন দেশেও কপিরাইট আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে প্রচারের নতুন নতুন মাধ্যম আবিষ্কৃত হচ্ছে। প্রচারের মাধ্যম যখন কেবল মুদ্রণ ছিল, তখন স্বল্প আইনের দ্বারা রচনা ও রচয়িতার স্বত্ব ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা সম্ভব ছিল। ক্রমশ বেতার, চলচ্চিত্র, অনুচিত্র (microfilms), জেরক্স কপি (Photocopy) প্রভৃতি আবিষ্কারের সঙ্গে কপিরাইট আইনও প্রয়োজনমত সংশোধন করে রচনা ও রচয়িতার স্বত্ব সংরক্ষণের চেষ্টা চলে আসছে। ভবিষ্যতেও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে। নতুন নতুন প্রচার মাধ্যম আবিষ্কারের সঙ্গে মোকাবিলা করতে কপিরাইট আইনেরও সংশোধন প্রয়োজন হবে। বর্তমানে ভারতে প্রচলিত কপিরাইট আইন ও আন্তজাতিক কপিরাইট সম্মেলনগুলির বহু ধারা ও উপধারার মাধ্যমে শিল্প ও গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

আন্তজাতিক কপিরাইট আইন বলতে কিছু নেই। আছে দুটি কপিরাইট সম্মেলন। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে। সেইসময় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে দেশ-বিদেশের মধ্যে গ্রন্থ আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছিল। সুতরাং তখন প্রয়োজন হয়েছিল বিদেশেও নিজেদের গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। সেই ব্যবস্থা করতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ চুক্তি Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ওরফে The Berne Copyright Convention, সংক্ষেপে বার্ন কনভেনশন (Berne Convention) বলা হয়। Berne Convention-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে পারস্পরিক ভিত্তিতে গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা করা। নতুন নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে Berne Convention সংশোধিত হয়েছে পাঁচবার প্যারিস (১৮৯৬), বার্লিন (১৯০৮), রোম (১৯২৮), ব্রাসেলস(১৯৪৮), এবং দ্বিতীয় প্যারিস সংশোধন (১৯৭১)। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভারত Berne Convention-এর অন্যতম সদস্য।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা হচ্ছে ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশন (Universal Copyright Convention); সংক্ষেপে ডড্ডঙ্খ বলা হয়। United Nations-এর একটি এজেন্সি United Nations Educational, (cientific and Cultural Organization (Unesco)-এর উদ্যোগে Universal Copyright Convention-এর খসড়া ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে জেনেভায় অনুষ্ঠিত কনফারেন্সে গৃহীত হয়ে, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ থেকে কার্যকরী হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ UCC-এর সদস্য রাষ্ট্র।

Berne Convention ও UCC, এ-দুটি আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থার কার্যধারার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও, উভয়ের মূল উদ্দেশ্য একই সদস্য রাষ্ট্রগুলোতে বিদেশের রচনার স্বত্ব সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করা। একটু বিস্তারিতভাবে বললে দাঁড়ায় স্বদেশে গ্রন্থকারের রচনার স্বত্ব আইনের দ্বারা যেভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে, বিদেশি রাষ্ট্রেও রচনার স্বত্ব সেই একইভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

সম্মেলন দুটি গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণের সময়সীমা পৃথকভাবে নির্ধারিত করেছে। UCC-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে রচয়িতার মৃত্যুর পর তাঁর রচনা সংরক্ষণকাল ন্যূনতম পঁচিশ বছর। অপরদিকে Berne Convention অনুযায়ী এই সময়সীমা পঞ্চাশ বছর। তবে, উভয় সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এই সময়সীমা বর্ধিত করার স্বাধীনতা দেওয়া আছে এবং ভারত, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক রাষ্ট্রেই গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর তাঁর রচনার স্বত্ব আইন দ্বারা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখা হয়।

ভারতে বর্তমানে প্রচলিত কপিরাইট আইন The Copyright Act, ১৯৫৭ নামে পরিচিত। আইনটি ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়ে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে কার্যকরী হয়েছে। বর্তমান প্রয়োজনের উপযোগী রাখতে আইনটি The Copyright (Amendment) Act, ১৯৮৪ দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে। The Copyright Act, ১৯৫৭-এর ধারা অনুসারে একটি Copyright Office স্থাপিত হয়েছে ও একটি Copyright Board গঠিত হয়েছে। Copyright Office-এর কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য Registrar of Copyright, এবং Copyright Board-এর জন্য Chairman-এর পদগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। Copyright Office-এ একটি Register রাখা হয়, যাতে কপিরাইট রেজেস্ট্রীকৃত রচনাগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা থাকে। কপিরাইট গ্রহণেচ্ছু লেখক বা প্রকাশককে নির্দিষ্ট আবেদন পত্রে প্রদেয় অর্থসহ Registrar of Copyright-এর কাছে আবেদন করতে হয়। সেই আবেদনপত্র যথাযথ বিচারের, বা প্রয়োজনে যথাযথ অনুসন্ধানের পর, রচনার বিবরণ Copyright Register-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। The Copyright Act, ১৯৫৭ প্রবর্তনের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের The Indian Copyright Act, 1914 বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

২.৫. ভারতীয় কপিরাইট আইন ও কুম্ভীলকবৃত্তি

ভারত সরকার তাঁদের কপিরাইট সংক্রান্ত ওইয়েবসাইটে কপিরাইট আইন সম্পর্কে জানিয়েছেন-

“The Copyright Act– 1957 (the ‘Act’) came into effect from January 1958. The

Act has been amended five times since then– i.e., in 1983, 1984, 1992, 1994, 1999 and 2012. The Copyright (Amendment) Act, 2012 is the most substantial. The main reasons for amendments to the Copyright Act; 1957 include to bring the Act in conformity with two WIPO internet treaties concluded in 1996 namely; the WIPO Copyright Treaty ("WCT") and WIPO Performances and Phonograms Treaty ("WPPT"); to protect the Music and Film Industry and address its concerns; to address the concerns of the physically disabled and to protect the interests of the author of any work; Incidental changes; to remove operational facilities; and enforcement of rights. Some of the important amendments to the Copyright Act in 2012 are extension of copyright protection in the digital environment such as penalties for circumvention of technological protection measures and rights management information, and liability of internet service provider and introduction of statutory licenses for cover versions and broadcasting organizations; ensuring right to receive royalties for authors– and music composers, exclusive economic and moral rights to performers– equal membership rights in copyright societies for authors and other right owners and exception of copyrights for physically disabled to access any works.

Prior to the Act of 1957, the Law of Copyrights in the country was governed by the Copyright Act of 1914. This Act was essentially the extension of the British Copyright Act– 1911 to India. Even the Copyright Act– 1957 borrowed extensively from the new Copyright Act of the United Kingdom of 1956. The Copyright Act– 1957 continues with the common law traditions. Developments elsewhere have brought about certain degree of convergence in copyright regimes in the developed world.

Presently– the Act is compliant with most international conventions and treaties in the field of copyrights. India is a member of the Berne Convention of 1886 Sas modified at Paris in 1971V, the Universal Copyright Convention of 1952 and the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement of 1995. Though India is not a member of the Rome Convention of 1961– the Act is fully compliant with the Rome Convention provisions.

Substantial amendments were made to the provisions of the Act in the year 2012. These amendments had the effect of making the Act compliant with the WCT and WPPT. Both WCT and WPPT came into force in 2002 and were negotiated essentially to provide for protection of the rights of copyright holders, performers and producers of phonograms in the Internet and digital era.

India acceded to both these treaties in 2018; Further, the provisions of the Act are also in harmony with two other WIPO treaties namely, the Beijing Audio-visual Performers Treaty, 2012 and the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired or Otherwise Print Disabled Persons, 2013.

The Copyright SAmendmentV Rules, 2016 were published in Official Gazette of India on 10th August 2016 and came into effect from 12th August 2016 replacing the old Copyright Rules of 2013. These Rules inter alia brought about amendments to the terms and conditions of the office of Chairman and members of the Board and in the process of application for registration of copyright. Particularly In Rule 70, Sub-Rule (6), the phrase òòin relation to any goods, was substituted by the words "in relation to any goods or services". Accordingly, item 14 under the Statement of Particulars' of FORM XIV under the First Schedule of the Act, the words in relation to any goods were substituted by "in relation to any goods or services". (http- copyright.gov.in)

বঙ্গানুবাদ:

কপিরাইট আইন ১৯৫৭ 'অ্যাক্ট' ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়। তারপর থেকে আইনটি পাঁচবার সংশোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ ১৯৮৩, ১৯৮৪, ১৯৯২, ১৯৯৪, ১৯৯৯ এবং ২০১২ সাল পর্যন্ত। কপিরাইট (সংশোধন) আইনে, ২০১২ সাল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কপিরাইট আইন, ১৯৫৭-এর সংশোধনের প্রধান কারণগুলির মধ্যে রয়েছে আইনটিকে ১৯৯৬ সালে সমাপ্ত দুটি WIPO ইন্টারনেট চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, যথা, WIPO কপিরাইট চুক্তি ("WCT") এবং WIPO পারফরম্যান্স এবং ফোনোগ্রামস চুক্তি ("WPPT"); সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করা এবং এর উদ্বেগগুলিকে সমাধান করা; শারীরিকভাবে অক্ষমদের উদ্বেগের সমাধান করা এবং যেকোনো কাজে লেখকের স্বার্থ রক্ষা করা; আকস্মিক পরিবর্তন; অপারেশনাল সুবিধা অপসারণ করা; এবং অধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করা। ২০১২ সালে কপিরাইট আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী হল ডিজিটাল পরিবেশে কপিরাইট সুরক্ষার সম্প্রসারণ করা যেমন প্রযুক্তিগত সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখা এবং অধিকার ব্যবস্থাপনা তথ্যের ছত্রভঙ্গের জন্য জরিমানা করা, এবং ইন্টারনেট পরিষেবা প্রদানকারীর দায়বদ্ধতা বজায় রাখা; কভার সংস্করণ এবং সম্প্রচারের জন্য সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স প্রবর্তন করা। সংগঠনে লেখক এবং সঙ্গীত রচয়িতাদের জন্য রয়্যালটি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা, অভিনয়শিল্পীদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকার প্রদান করা, লেখক এবং অন্যান্য অধিকার প্রাপ্ত মালিকদের জন্য কপিরাইট সমিতিতে সমান সদস্যতার অধিকার দেওয়া এবং শারীরিকভাবে অক্ষমদের জন্য কপিরাইট ব্যতীত কোনো কাজ অ্যাক্সেস করার জন্য।

১৯৫৭ সালের আইনের আগে, দেশ ১৯১৪ সালের কপিরাইট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এই

আইনটি মূলত ব্রিটিশ কপিরাইট আইন। এটি ১৯১১ ভারতে সম্প্রসারিত ছিল। এমনকি ১৯৫৭ কপিরাইট আইনটি, ইউনাইটেড কিংডমের ১৯৫৬ সালের নতুন কপিরাইট আইন থেকে ব্যাপকভাবে ধার করা হয়েছে। ১৯৫৭ র কপিরাইট আইন সাধারণ আইনের ঐতিহ্যের সাথে অব্যাহত রয়েছে। উন্নত বিশ্বে কপিরাইট শাসন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মাত্রায় অভিন্নতা এনেছে।

বর্তমানে, আইনটি কপিরাইটের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ভারত ১৮৮৬ সালের বার্ন কনভেনশনের সদস্য (যেমন ১৯৭১ সালে প্যারিসে সংশোধিত), ১৯৫২ সালের ইউনিভার্সাল কপিরাইট কনভেনশন এবং ১৯৯৫ সালের বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়ের চুক্তি (TRIPS) চুক্তির সদস্য। যদিও ভারত ১৯৬১ সালের রোম কনভেনশনের সদস্য নয়, তাহলেও আইনটি রোম কনভেনশনের বিধানগুলোর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২০১২ সালে আইনের বিধানগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংশোধন করা হয়েছিল। এই সংশোধনগুলি আইনটিকে WCT এবং WPPT-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রভাব ফেলেছিল। WCT এবং WPPT উভয়ই ২০০২ সালে কার্যকর হয়েছিল এবং ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল যুগে কপিরাইট ধারক, অভিনয়কারী এবং ফোনোগ্রামের প্রযোজকদের অধিকার রক্ষার জন্য মূলত আলোচনা করা হয়েছিল। ভারত ২০১৮ সালে এই উভয় চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল; আরও, আইনের বিধানগুলি আরও দুটি WIPO চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যথা, বেইজিং অডিওভিজ্যুয়াল পারফর্মারস চুক্তি, ২০১২ এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যথায় প্রিন্ট অক্ষম ব্যক্তিদের দ্বারা প্রকাশিত কাজগুলিতে অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে মারাকেশ চুক্তি, ২০১৩।

কপিরাইট (সংশোধন) বিধিমালা, ২০১৬ ১০ই আগস্ট ২০১৬-এ ভারতের অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ২০১৩ সালের পুরানো কপিরাইট বিধিগুলি প্রতিস্থাপন করে ১২ই আগস্ট ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়েছিল। এই বিধিগুলি অন্য বিষয়গুলির সাথে অফিসের শর্তাবলীতে সংশোধন এনেছে। বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের এবং কপিরাইট নিবন্ধনের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ার মধ্যে। বিশেষ করে বিধি ৭০, উপ-বিধি (৬), "যেকোনো পণ্যের সাথে সম্পর্কিত" বাক্যাংশটি "যে কোনো পণ্য বা পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তদনুসারে, আইনের প্রথম তফসিলের অধীনে FORM XI)-এর 'বিশেষ বিবরণের বিবৃতি'-এর অধীনে আইটেম ১৪, "যে কোনো পণ্যের সাথে সম্পর্কিত" শব্দগুলি "যে কোনো পণ্য বা পরিষেবার সাথে সম্পর্কিত" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। (http: copyright.gov.in)

ভারতীয় কপিরাইট সম্পর্কে আগ্রহী পাঠক উপরের লিংকে গিয়ে কপিরাইট আইনের প্রতিটি ধারা এবং উপধারা জানতে পারবেন। এই কপিরাইট আইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কুম্ভীলক বৃত্তি ও প্ল্যাগিয়ারিজম শব্দবন্ধটি। 'কুম্ভীলক' শব্দটি তৎসম। যে-কোনো চৌর্যবৃত্তিকে কুম্ভীলক বলা হয়। বর্তমানে

গবেষণাপত্র রচনার সময় 'কুম্ভীলক বৃত্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই শব্দের দ্বারা মূলত গবেষককে সচেতন এবং সতর্ক করা হয়। অনেকসময় দেখা যায়, গবেষক নিজের অজ্ঞাতেও কুম্ভীলক বৃত্তির শিকার হন। গবেষণাকালে অন্যের রচনা কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, সে সম্পর্কে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা না-থাকায় তিনি এই ধরনের কাজ করে থাকেন। ফলে গবেষণার সময়ে গবেষককে কুম্ভীলক বৃত্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকা দরকার। এক্ষেত্রে তিনি কীভাবে অন্যের রচনা ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে তাঁর পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। তিনি যখনই অন্যের লেখা গবেষণাপত্রে ব্যবহার করবেন, তখন অবশ্যই মূল আলোচনায় উপযুক্তভাবে সিঙ্গল কোটেশন, ডবল কোটেশন, ইনডেন্ট ব্যবহার ক'রে উদ্ধৃতি দেবেন এবং উদ্ধৃতির শেষে সুপারস্ক্রিপ্ট বা উৎস-সূচক উল্লেখ ক'রে অন্ত্যটীকায় পুরো রেফারেন্স দেবেন। গবেষণার প্রাইমারি সোর্স এবং সেকেন্ডারি সোর্স কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তাও গবেষককে জানতে হবে। নতুবা তিনি চৌর্যবৃত্তি করেছেন- সেখানে এই অভিযোগ উঠবে। প্রাইমারি সোর্স কথার অর্থ-গবেষক যেখানে গবেষণায় প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ বা পত্রিকা নিজের চোখে দেখেছেন, পড়েছেন এবং ব্যবহার করেছেন। তারপর সেখান থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন। সেকেন্ডারি সোর্স কথার অর্থ-যে-উদ্ধৃতি গবেষক তাঁর গবেষণাপত্রে ব্যবহার করেছেন, সেটি তাঁর নিজের সংগ্রহ করা নয়। অন্যের বই থেকে সেটি পেয়েছেন। ইউনিভার্সিটি গ্রান্টসকমিশন (UGC) বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ এই চৌর্যবৃত্তি বা Plagiarism আটকানোর জন্য যথেষ্ট সক্রিয় হয়েছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত গবেষণাপত্র জমা দেবার আগে প্রতি গবেষককে অবশ্যই Plagiarism সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে এবং এটি বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষকের গবেষণাপত্র Plagiarism tool এ পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দেবেন এবং সেটি গবেষণাপত্রে যুক্ত করে যথাস্থানে পরীক্ষিত হবার জন্য জমা দিতে হবে।

২.৬. দেশীয় মুদ্রণ আইন

১৫৫০ সালে পর্তুগিজরা ভারতে প্রথম ছাপাখানা স্থাপন করেছিল। ১৫৫৭ সালে পর্তুগিজ মিশনারিরাই ভারতে প্রথম ছাপা বই প্রকাশ করেন। এরপর ১৬৮৪ সালে ইংরেজরা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি প্রথম ভারতে খবরের কাগজ প্রকাশ করেন। কাগজটির নাম 'বেঙ্গল গেজেট'। লোকমুখে তা পরিচিত ছিল হিকির গেজেট নামে।

সরকারি নীতি ও গভর্নর-জেনারেলের সমালোচনা করে হিকির গেজেট সরকারের বিষ নজরে পড়ে। ফলে দু-বছরের মধ্যেই কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে সংবাদপত্রের সম্পাদক উইলিয়াম ডুয়ানকে (সাংবাদিক) নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু শিগগিরিই এর দেখাদেখি আরও কয়েকটি কাগজ প্রকাশিত হয়ে যায়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি খবরের কাগজ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'বেঙ্গল গেজেট' কাগজটিও ছিল ইংরেজিতে। দেশীয় ভাষায় প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮১৬

HICKY's
BENGAL GAZETTE;
OR THE ORIGINAL
Calcutta General Advertiser.

হিকির বেঙ্গল গেজেটের প্রথম পৃষ্ঠা, ১০ই মার্চ, ১৭৮১। চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

সালে। ১৮২১ সালে মার্শম্যান প্রকাশ করেন 'দিগ্‌দর্শন' নামে এক বাংলা মাসিক পত্রিকা। ১৮১৮ সালে রাজা রামমোহন রায় তাঁর 'সম্বাদ কৌমুদী' কাগজটি প্রকাশ করেন। ১৮২১ সালে তিনি মিরাত-উল-আখবর নামে একটি ফারসি সাপ্তাহিক পত্রও সম্পাদন করেন।

১৭৯৯ সালে সেন্সরশিপ আইন প্রণয়ন করে প্রথম বার সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব করা হয়। এই আইনবলে কাগজের প্রতিটি সংখ্যায় মুদ্রক, সম্পাদক ও মালিকের নাম ছাপা এবং কাগজের বিষয়বস্তু ছাপার আগে সরকারি সচিবের কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়। লর্ড ওয়েলেসলি ভারতে ফরাসি আক্রমণের ভয়ের অজুহাত দেখিয়ে এই আইন জারি করেন। ১৮০৭ সালে আইনটি পত্রপত্রিকা ও পুস্তকপুস্তিকার উপরও জারি হয়। লর্ড হেস্টিংস এই আইন বিলোপ করেন। অস্থায়ী গভর্নর-জেনারেল জন অ্যাডাম লর্ড হেস্টিংসের নীতির বিরোধিতা করে, ১৮২৩ সালে পুনরায় নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ফিরিয়ে আনেন। তাঁর আনা লাইসেন্সিং রেগুলেশন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

(১) প্রত্যেক প্রকাশক ও মুদ্রকের সরকারি লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়।

(২) সরকারকে যে কোনো লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(৩) প্রতিটি লাইসেন্স-বিহীন প্রকাশনার জন্য দোষীকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করা হয়।

এই রেগুলেশন-বলে অনেক খবরের কাগজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে রাজা রামমোহনের পূর্বোল্লেখিত ফারসি সাপ্তাহিকটিও ছিল।

১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সময়, লর্ড ক্যানিং দ্বারা "গ্যাগিং অ্যাক্ট" পাশ করা হয়েছিল যা ছাপাখানাগুলির প্রতিষ্ঠাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সমস্ত মুদ্রিত বিষয়ের স্বরকে সংযত করার চেষ্টা করেছিল। ইংরেজি এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশনার মধ্যে পার্থক্য সহ সমস্ত প্রেসের সরকারের কাছ থেকে একটি লাইসেন্স রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে -কোনও মুদ্রিত সামগ্রী ব্রিটিশ রাজের উদ্দেশ্যগুলিকে অস্বীকার করবে না। পরবর্তীতে যখন ব্রিটিশ সরকার দেখতে পেল যে গ্যাগিং আইনটি সমস্ত জাতীয়তাবাদী অনুভূতিকে দমন করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, তখন তারা আরও জোরপূর্বক আইন তৈরি করে, যার আংশিক নকশা করেছিলেন স্যার আলেকজান্ডার জন আরবুথনট এবং স্যার অ্যাশলে এডেন, তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর।/

পরবর্তীতে ব্রিটিশ ভারতে, ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট (১৮৭৮) ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য এবং ব্রিটিশ নীতির প্রতি সমালোচনার প্রকাশ রোধ করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। আইনটি ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড লিটন দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল এবং ১৪ মার্চ ১৮৭৮ সালে ভাইসরয়ের কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে পাস করেছিল। এই আইনটি ইংরেজি ভাষার প্রকাশনাগুলিকে বাদ দিয়েছিল কারণ এটির উদ্দেশ্য ছিল 'প্রাচ্য ভাষায় প্রকাশনা'-এ রাষ্ট্রদ্রোহী লেখা নিয়ন্ত্রণ করা। আইনটি সরকারকে নিম্নলিখিত উপায়ে প্রেসের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা দিয়েছিল:

১.এই আইনটি সরকারকে ভার্নাকুলার প্রেসে রিপোর্ট এবং সম্পাদকীয় সেন্সর করার ব্যাপক অধিকার প্রদান করে।

২. এখন থেকে সরকার ভার্নাকুলার সংবাদপত্রের নিয়মিত খোঁজ রাখবে।

৩. সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচার করা হ'লে সংবাদপত্রকে সতর্ক হতে হবে।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট পাশ হওয়ার সময়, অমৃত বাজার পত্রিকা-সহ বাংলায় পঁয়ত্রিশটি আঞ্চলিক পত্রিকা ছিল, যার সম্পাদক ছিলেন শিশির কুমার ঘোষ। স্যার অ্যাশলে ইডেন তাকে ডেকে পাঠান এবং যদি তিনি তাকে চূড়ান্ত সম্পাদকীয় অনুমোদন দেন তবে নিয়মিত তার কাগজে অবদান রাখার প্রস্তাব দেন। শিশির কুমার ঘোষ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন যে "দেশে অন্তত একজন সৎ সাংবাদিক থাকা উচিত।" আইনটি পাশ হওয়ার সময়, স্যার অ্যাশলে একটি বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন যে আইনটি চূড়ান্ত হওয়ার আগে পনেরটি ভিন্ন আঞ্চলিক কাগজে প্রকাশিত পঁয়তাল্লিশটি রাষ্ট্রদ্রোহমূলক লেখা তাঁর কাছে উপস্থাপন করা হয়েছিল। যার ভিত্তিতেই এই আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টে বলা হয়েছে যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার কোনো সংবাদপত্রের

কোনো প্রিন্টার বা প্রকাশককে একটি বন্ডে প্রবেশ করার জন্য আহ্বান করার ক্ষমতা রাখে, এবং আপত্তিকর বলে মনে করা কোনো মুদ্রিত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারে। আইনে প্রকাশের আগে কাগজপত্রের বিষয়বস্তুর সমস্ত প্রমাণপত্র পুলিশের কাছে জমা দেওয়ার বিধান রয়েছে।

দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের লক্ষ্যে প্রণীত এটি একটি বহুল বিতর্কিত আইন। ভাইসরয় লর্ড লিটনের শাসনামল তাঁর সর্বাধিক বিতর্কিত সংবাদপত্র নীতির জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই নীতিরই ফলশ্রুতিতে ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ প্রণীত হয় ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট। পাশাপাশি রাজদ্রোহ ভাবাপন্ন ব'লে অভিযুক্ত হ'লে কোনো নাটক রচনা ও মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ করে প্রণীত হয় ড্রামাটিক পারফর্ম্যান্সেস অ্যাক্ট (১৮৭৬)। ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতারণা বন্ধ করা। বিলটি উত্থাপন করে কাউন্সিলের আইন বিষয়ক সদস্য দেশীয় সংবাদপত্র ও সাময়িকীগুলো কিভাবে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতারণা চালাচ্ছে তার বর্ণনা দেন। ভাইসরয় লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রকে কুচক্রী, দোষী লেখকদের প্রকাশ্য রাজদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, অধিকাংশ দেশীয় সংবাদপত্রের সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রিটিশ রাজের পতন ঘটানো। যেসব পত্রিকা সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তুলছিল তা হল— 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'হালিশহর পত্রিকা', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ভারত মিহির', 'ঢাকা প্রকাশ', 'সাধারণী' ও 'ভারত সংস্কারক' ইত্যাদি। এইসব পত্রিকাগুলোকে সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহমূলক আন্দোলন পরিচালনার দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এমনকি এই আইনে সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বে বিষয়বস্তুর সকল প্রুফ-শিট পুলিশের কাছে পেশ করার বিধান রাখা হয়। কোন ধরনের খবর রাজদ্রোহের আওতায় পড়ে তা পুলিশই নির্ধারণ করত, আদালত নয়। এ আইনের আওতায় অনেক সংবাদপত্রকে জরিমানা করা হয় এবং সম্পাদকদের কারাদন্ড দেওয়া হয়। ফলে এধরনের নিবর্তনমূলক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশের সকল সংগঠন একযোগে এই পদক্ষেপের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং তাদের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। বাংলা ও ভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ এ আইনের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং একে অবৈধ ও অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে অবিলম্বে তা প্রত্যাহারের দাবি জানান। সংবাদপত্রেও চলতে থাকে অবিরাম সমালোচনা। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপন উদ্ভূত পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শেষ পর্যন্ত আইনটি প্রত্যাহার করে নেন।

২.৭. আদর্শ প্রশ্নাবলী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) কোন সময়ে কোন দেশে প্রথম কপিরাইট আইন প্রবর্তিত হয়?

২) বার্ণ কনভেনশন কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়?

৩) বার্ণ কনভেনশন কতবার সংশোধিত হয়েছে? কোন কোন দেশে এই সংশোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে?

৪) UCC-এর পুরো নাম কি?

৫) UCC-এর খসড়া কবে কোথায় প্রথম প্রস্তুত হয়েছিল?

৬) ভারতবর্ষে কোনো লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর গ্রন্থরচনার স্বত্ব কত বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখার নিয়ম আছে?

৭) ভারতবর্ষে কপিরাইট আইন কতবার সংশোধিত হয়েছে? শেষ কত খ্রিস্টাব্দে এই আইনের সংশোধন হয়?

৮) গবেষণাকার্যে প্রাইমারি সোর্স, সেকেন্ডারি সোর্স বলতে কী বোঝায়?

৯) ভারতবর্ষে প্রথম খবরের কাগজ কে কত খ্রিস্টাব্দে চালু করেন?

১০) ভারতবর্ষে প্রথম প্রচারিত খবরের কাগজটির নাম কি ছিল? লোকমুখে এটি কি নামে পরিচিত ছিল?

১১) রামমোহন রায় সম্পাদিত ফারসি পত্রিকাটির নাম কি ছিল? এটি কত খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রকাশিত হতে থাকে?

১২) ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের অধিকার খর্বকারী সেন্সরশিপ আইন কবে চালু হয়? কে এই আইন রদ করেন?

১৩) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট কোন ভাইসরয়ের আমলে প্রস্তাবিত হয়েছিল? এই আইন কবে পাস হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) টীকা রচনা করুন- বার্ণ কনভেনশন, কুম্ভীলক বৃত্তি

২) গবেষণাপত্রে অন্য লেখকের উদ্ধৃতি ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

৩) কপিরাইট আইন আমাদের যে দুই প্রকার অধিকার প্রদান করে, সেগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৪) সেন্সরশিপ আইনের মূল বিশেষত্বগুলি কী ছিল?

বিস্তারিত প্রশ্ন:

১) কপিরাইট আইন দ্বারা একজন লেখক কীভাবে উপকৃত হতে পারেন সে সম্পর্কে আপনার ভাবনা ব্যক্ত করুন।

২) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট দ্বারা কীভাবে বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল সে বিষয়ে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন?

৩) কপিরাইট আইন বলতে কি বোঝায়? বর্তমান যুগে কপিরাইট আইনের প্রয়োজনীয়তা কতখানি সে বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করুন।

৪) ভারতীয় কপিরাইট আইনের মূল প্রবণতাগুলি চিহ্নিত করুন।

একক ৩ : প্রযুক্তি ও বাংলা মুদ্রণশিল্প

৩.১. উদ্দেশ্য

৩.২. প্রস্তাবনা

৩.৩. মুদ্রণ ও ছাপাখানার ইতিহাস

৩.৩.১. মুদ্রণের আবির্ভাব

৩.৩.২. ভারতবর্ষে মুদ্রণ ও বইপ্রকাশ

৩.৩.৩ বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশনা

৩.৪. প্রচলিত মুদ্রণ পদ্ধতি

৩.৫. বাংলা মুদ্রণের সেকাল ও একাল

৩.৬. আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩.৭. সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩.১ উদ্দেশ্য

আধুনিক সভ্য জগতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল মুদ্রণ। উন্নততর দেশগুলিতে শিল্প হিসেবে মুদ্রণের বহুল উন্নতি হয়েছে। তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে। বছর পঞ্চাশেক আগে মুদ্রণ ছিল মামুলি একটা ব্যবসা মাত্র। কিন্তু এখন আর তা নেই। মুদ্রণ এখন ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছে ফলিত বিজ্ঞানে। কেবল তা-ই নয়। কারিগরি কাজের খুব কম শাখাতেই বিজ্ঞান, বাণিজ্যসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এবং কলাবিদ্যার এমন সমন্বয় ঘটেছে। এ-কথাগুলি বিশ্বের উন্নততর দেশগুলি সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য আমাদের দেশ সম্পর্কে ততটা নয় এ-কথা বলাই বাহুল্য। তবে পুরোনো শিল্পপ্রথাকে পরিহার করে নতুন প্রথাকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা এখন অনুভব করছি। সুতরাং আমাদের দেশেও মুদ্রণশিল্প আর-একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। আর তাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্রণশাস্ত্রে শিক্ষা দান করা হচ্ছে। তাতে করে ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই এই বিষয়ে আগ্রহী হচ্ছেন, অনেকে একে পেশা হিসেবে গ্রহণ করছেন, আবার অনেকে গবেষণাও করছেন। এই সবকটি লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যেই এই এককটির নির্মাণ। তাই এই এককটি পাঠ করলে আপনারা—

১. মুদ্রণের একেবারে উদ্ভব থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে এই শিল্পের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে তা জানতে পারবেন।

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

২. ভারতবর্ষে এবং বাংলায় ছাপাখানার উদ্ভব ও প্রসার বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত লাভ করবেন।

৩. প্রচলিত মুদ্রণ পদ্ধতিগুলির ধারণা লাভ করবেন। বলাবাহুল্য, এই শিল্পের নানা পদ্ধতির সুফল ও কুফল সম্পর্কে আপনারা অবগত হতে পারবেন।

৪. বাংলার মুদ্রণ শিল্প আগেকার তুলনায় কতখানি অগ্রসর হয়েছে সেসম্পর্কে একটি তুলনামূলক ধারণা লাভ করবেন।

৩.২ প্রস্তাবনা

মুদ্রণযন্ত্র (Printing Press) আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে গণজ্ঞাপনের যুগ শুরু হয়। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের আগে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য, জ্ঞান ও বিনোদন পরিবেশনের অনেক সীমাবদ্ধ ছিল। যতদিন না মুদ্রণ শিল্পের আবিষ্কার হয়েছে ততদিন একই বক্তব্যকে ইচ্ছামতো সহস্রাধিকবার পুনরুৎপাদিত করে, তা বিচ্ছিন্ন বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে বণ্টন করা সম্ভব হয়নি। জোহানেস গুটেনবার্গ তাঁর ছাপাখানার কাজ শুরু করেন প্রায় ১৪৩৬ সালে। গুটেনবার্গের মুদ্রণ ব্যবস্থাকে বলা হয়ে থাকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। প্রথমদিকে কাঠের টুকরায় মুদ্রণ শুরু করেছিলেন তিনি, ছাপাখানা ব্যবহার শুরু হয় অনেক পরে। পরবর্তীকালে মুদ্রণের পৃষ্ঠার সেটিং এবং মুদ্রণ প্রক্রিয়া ছিল বেশ দ্রুত। দ্রুততার পাশাপাশি এই পদ্ধতির মুদ্রণ ছিল অনেক বেশি টেকসই। এছাড়াও, এখানে ব্যবহৃত ধাতু টাইপ পিসগুলো ছিল শক্ত এবং অক্ষরগুলো ছিল অধিক সমতাপূর্ণ, যা লেখনী এবং ফন্টের উপর প্রভাব ফেলত। এর ফলে এগুলি ছিল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং অপেক্ষাকৃত কম দামের। গুটেনবার্গের মুদ্রণকৃত বাইবেল (১৪৫৫) পশ্চিমা ভাষাভাষীদের কাছে যথেষ্ঠ জনপ্রিয় ছিল। ছাপাখানা এরপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে এবং রেনেসাঁ যুগের প্রবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

৩.৩ মুদ্রণ ও ছাপাখানার ইতিহাস

৩.৩.১. মুদ্রণের আবির্ভাব

চীন দেশে ছাপ তোলার ইতিহাস অনেকদিনের। কাঠ ও বাঁশের চটার উপর লেখার ছাপ তোলার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু কাঠ বাঁশের চটার উপর যে লেখা সামগ্রী তা রক্ষা করা ও স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। তাই কীসে এই মুশকিল আসান হয় তা খুঁজতে গিয়েই চীনের কাগজ আবিষ্কার। এমনটা জানা যায় ১০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৎসাই লান (Ts-aiLun) প্রথম কাগজ আবিষ্কার করেন। কাগজের জন্য তিনি যে সব উপাদান বেছে নেন তা আসে বাঁশ, গাছের বাকল, ঘাস কাপড়ের তন্তু থেকে। সেই শুরু চীনের কাগজের উপর লেখার ছাপ তোলা। চীন দেশের উত্তর-পূর্বের যে অংশ তুর্কিস্থানের মধ্যে প্রবেশ

করেছে; সেখানে তুং হুয়াং নামে একটি শহর আছে। এই শহরে রয়েছে 'হাজার বুদ্ধের গুহা'। ১৯০০ সালে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু গুহাগুলির সংস্কার করতে গিয়ে অংসখ্য পুথির মধ্যে পেলেন একটি মুদ্রিত পুথি। নাম 'হীরক-সূত্র'। মুদ্রণের তারিখ ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ। মুদ্রাকরের নাম ওয়াং চীহ্। দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট। ৬টি বড় কাঠের ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয়েছিল হীরক-সূত্র। কাঠ খোদাই করে লিপিও প্রস্তুত করা হয়েছিল। বইয়ের বিষয়বস্তু বুদ্ধের উপদেশাবলী। এটিই এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম মুদ্রিত পুথি। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যেই চিনে কাঠের ব্লকের ছাপার অনেক উন্নতি হয়। দশম শতাব্দী ও তার পরবর্তী সময়ে খুচরো টাইপের উন্নতিসাধনের পর্ব চলে। যখন ইউরোপে খবর পাওয়া যাচ্ছে একধরনের চাপ-যন্ত্রের। যা আঙুরের রস নিঙড়োনো কাজে লাগে। গুটেনবার্গের যাত্রা শুরু এখান থেকেই। ১৪৫৬ খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গ সর্বপ্রথম গতিশীল বা movable টাইপ আবিষ্কার করে পৃথিবীতে গণজ্ঞাপনের যুগ প্রবর্তন করেন।

পণ্ডিতেরা বলেন, ১২২১ খ্রিস্টাব্দে চীন দেশে সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন কাঠের টাইপ সাজিয়ে বই ছাপানোর কাজ শুরু হয়। অবশ্য চীনের এই মুদ্রাযন্ত্র অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়েনি। ইউরোপে খ্রিস্টীয় ১৪ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঠ খোদাই এর সাহায্যে তাস ও ছবির বই ছাপা হতে থাকে। কিন্তু আধুনিক গতিশীল টাইপের সাহায্যে মুদ্রণ পদ্ধতির আবিষ্কর্তা জার্মানির গুটেনবার্গ।

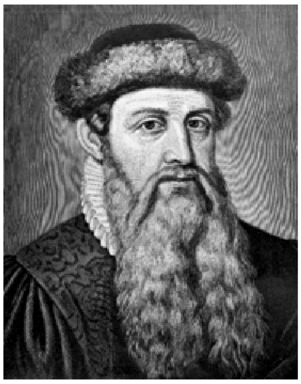

গুটেনবার্গ, চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

আদিযুগের এই মুদ্রণযন্ত্রে ছাপাখানা ছিল কাঠের। কাঠের আধারে কালি মাখানো টাইপ বসিয়ে স্ক্রু এঁটে ভিজে কাগজে ছাপ তোলা হত। পরে ছাপা যন্ত্রের মধ্যে হস্তচালিত লিভার (Lever) এর প্রচলন হয়। জেলাটিন রোলারের সাহায্য টাইপে কালি লাগানো হত। ১৮ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই ধরনের ছাপাখানা থেকেই পত্রপত্রিকা ও বই ছাপানো হত। ১৮১১ সালে ইংল্যান্ডে স্টিমচালিত রোটারি সিলিন্ডারযুক্ত ছাপাখানার প্রচলন হয়। এর ফলে ঘন্টায় ৩০০ শিটের বদলে ১১০০ শিট কাগজ ছাপা সম্ভব হয়। ১৮৪৮ সালে আবিষ্কৃত হয় রোটারি প্রেস। ঘন্টায় ৮ হাজার শিট কাগজ ছাপা সম্ভব হয় এই প্রেস থেকে।

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

একটি প্রাথমিক কাঠের ছাপাখানা, ১৫৬৮ সালে চিত্রিত। এই জাতীয় প্রেসগুলি প্রতি ঘন্টায় ২৪০টি ছাপ তৈরি করতে পারে। চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

৩.৩.২. ভারতবর্ষে মুদ্রণ ও বইপ্রকাশ

যে কোনো ইতিহাসের ইতিহাস হয়ে ওঠার আগে থাকে সলতে পাকানোর সময়। যে কোনো দেশে মুদ্রণশিল্প গড়ে ওঠবার জন্য প্রয়োজনীয় আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষের মুদ্রণের ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা দেখি, মোটামুটি সকলেই বলছেন এদেশের মাটিতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র আসে গোয়ায় ১৫৫৬ সালে। প্রবর্তক পর্তুগিজরা। ছাপাখানার ইতিহাসের দুটি স্তর ধরা যাক। প্রথম চীনদেশের বইয়ের ছাপ তোলবার জ্ঞান (উদা: হীরকসূত্র) আর দ্বিতীয় গুটেনবার্গের বিচল হরফের ছাপাখানার (উদাহরণ: গুটেনবার্গ বাইবেল) জ্ঞান। প্রযুক্তির গুণগত মানের দিক থেকে দুটি আলাদা বিষয় বোঝাই যাচ্ছে। বর্তমানে আমরা যে ছাপাখার ইতিহাস নিয়ে আসলে কথা বলতে চাইছি তা ঐ গুটেনবার্গের ছাপাখানার মুখাপেক্ষী। আধুনিক প্রযুক্তির ছাপাখানার ইতিহাস ভারতবর্ষে শুরু হয় ১৫৫৬ থেকেই। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তির আগের যে জ্ঞান অর্থাৎ যাকে আমরা বলেছি ‘বইপুথি’; কাঠের ব্লক করে ছাপা পুথি, তার জ্ঞান আমাদের ছিল না।

হীরক-সূত্র

অর্থাৎ মুদ্রণ যন্ত্রের জনক গুটেনবার্গ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম বাইবেল ছাপেন তারও একশো বছর পরে আমাদের দেশে গোয়ায় প্রথম ছাপাখানার সূচনা হয়। ইউরোপ থেকে এদেশে প্রথম ছাপাখানা পাঠানোর পিছনে যে কারণ ছিল তা মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। এদেশীয় ভাষায় খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্যই গোয়ায় প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। ‘The printing press in India’ বইতে অনন্ত কাকবা প্রিয়োলকার দেখিয়েছেন এই ছাপাখানাটি ১৫৫৬ থেকে ১৬৭৪ খ্রি. পর্যন্ত গোয়ায় মোট ৩৪টি বই ছাপিয়েছিল। অর্থাৎ আমাদের দেশে সর্বপ্রথম ছাপা বই-এর গৌরবজনক ভূমিকা যে বইটিকে ঘিরে তার প্রকাশস্থল গোয়া। বইটির নাম- ‘কনক্লুসোয়েস এ উতরাস কয়সাস’ ‘Concluso `es e outra scoisas’। যেটি সম্ভবত কোনো বই নয় পাতায় ছাপা বুকলেটের মতো কিছু। এটি এখন আর পাওয়া যায় না। এটি একটি পর্তুগিজ ধর্মগ্রন্থ। প্রথম বই যা গোয়ায় ছাপা এবং এখনও দেখতে পাওয়া যায়, সেটি হোল ‘Compendio Spiritual da Vida Christaa’, লেখক হলেন গ্যাসপার ডি লিয়াও। ১৮৬২ সালে লন্ডনে নিলামে বিক্রি হয়েছিল। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে রয়েছে। এরপ ছাপার কেন্দ্র কুইলন। ১৫৭৮ সালে সেখান থেকে ছেপে বের হয় প্রথম কোনো ভারতীয় হরফের বই। তামিল মালায়লম হরফে ১৬ পাতার বই ‘Doutrina Christa’, এটিই প্রথম ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত বই।

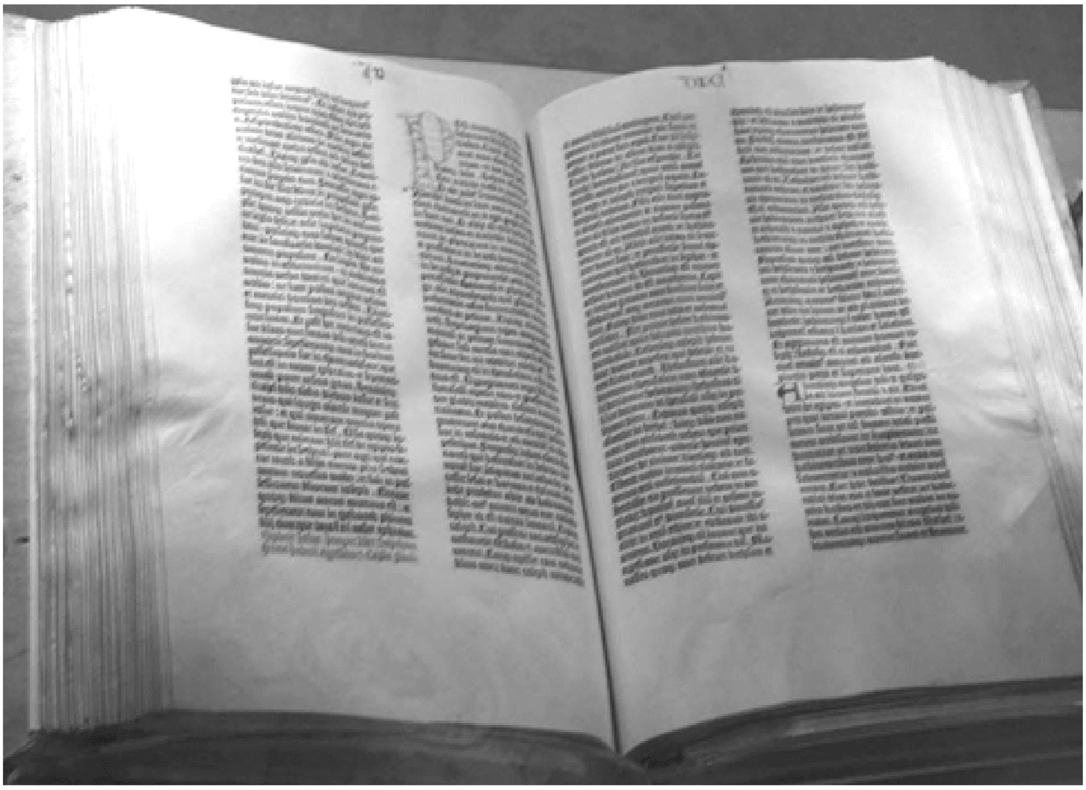

গুটেনবার্গ বাইবেল, এখন ওয়াশিংটন, ডিসির লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে রাখা হয়েছে। চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

ভারতীয় এই ভাষার হরফ তৈরি করেছিলেন গনসালভস নামের একজন স্প্যানিশ মুদ্রাকর। মূল বইটি অবশ্য পর্তুগিজ ভাষাতেই প্রথমে ছাপা হয়। প্রথম ভারতীয় ভাষা হিসাবে তামিলে বই ছাপার সূচনা ঘটলেও কিছুদিনের মধ্যেই তা বন্ধ হয়ে যায়।

৩.৩.৩ বাংলায় মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এবার বাংলায় মুদ্রণ ও ছাপাখানার প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে। ১৭৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানির প্রাক্তন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস্ একটি বিজ্ঞাপন দেন। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সেটি আটকে দেওয়া হয়। তাতে বলা হয়, কলকাতায় ছাপাখানার অভাবে ব্যবসা ও পারস্পরিক সংযোগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। তাই মুদ্রণকার্যে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কেউ যদি একটি প্রেস স্থাপন করতে চান, তাহলে তিনি তাঁকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য ও উৎসাহ দেবেন। এই বিজ্ঞাপন থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৭৬৮ সালের আগে কলকাতায় ছাপাখানা ছিল না। বাংলার মুদ্রণের প্রসারে বাংলায় ছাপাখানা কেন জরুরি? কারণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে কলকাতা তখন ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। কিছুদিন পর ১৭৭৪ সালে তা দেশের রাজধানীও হয়ে উঠবে। নগরের প্রয়োজন কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনা

এ দুয়ের মেলবন্ধনে ছাপাখানা তৈরির প্রস্তুতি পর্ব চলছিল তখন কলকাতায়। আর এই মেলবন্ধনের কাজে সাহায্য করছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বাংলায় দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে কোম্পানির প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা এই ছিল বাংলার গভর্নর হেস্টিংসের লক্ষ্য। ১৭৭৩ সালে হেস্টিংস বোর্ডকে জানান, এতদিন কর্মচারীরা ব্যবসায়ীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কাজ করত। তাঁদের মধ্যে ছিল অনুভূতির অভাব। নতুন এই সমাজকে তাঁরা বুঝতে পারেননি। এখন থেকে সেই সামাজিক অনুভূতিকে মাথায় রেখে রাজকার্য পরিচালনা করতে হবে। বাংলা দুর্ভিক্ষের মাসুল দিয়ে পেলো হেস্টিংসের মতো গভর্নর; যে অন্তত বোঝার চেষ্টা করতে চাইল বাংলার সামাজিক মনকে। উদ্দেশ্য রাজদণ্ড সুরক্ষিত করা হলেও অন্তত এই প্রথম বাংলার মানুষের কথা ভাবা তো হোল! মানুষের ধর্ম, ভাষা, ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাদের বিচারব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। তাই হিন্দুদের জন্য কলকাতায় এল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পুথি ঘেঁটে তাঁরা নির্বাচন করলেন বিচারের বিধি। মুসলমানদের ক্ষেত্রেও হল একই বিধান। তারপর সেসব ফারসিতে অনুবাদ হতে শুরু হল। ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড ফারসি ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন 'A Code of Gentoo Laws or Ordinations of the Pundits' (১৭৭৬)। ছাপা হয় লন্ডনে। এরপর ভাষাকে জানবার কারণেই লেখা হবে ব্যাকরণ। এই হ্যালহেড লিখবেন ব্যাকরণ; ছাপা হবে ১৭৭৮ সালে। যা বাংলায় প্রথম মুদ্রিত পুর্ণাঙ্গ একটি বই।

জেণ্টু লজের পরে হ্যালহেডেরেই 'A Grammar of the Bengal Language'। তাহলে ছাপাখানা ১৭৭৮ সাল বা তার এক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে বাংলায়। লন্ডন থেকে বাংলার জন্য বই ছেপে আনা হত। তাতে বাংলা হরফও ছাপা হত কিন্তু এখানে লন্ডনের পরেই ছাপাখানা তৈরি হয় হুগলিতে। যেখান থেকে ১৭৭৮ সালে হালহেডের 'এ গ্র্যামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ('A Grammar of the Bengal Language') ছাপা হয়। মুহাম্মদ সিদ্দিকি খানের মতে এটি অ্যানড্রুজের ছাপাখানা। শ্রীপান্থ তাতে আরও সংযোগ করেছেন। সম্ভবত শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে মার্শম্যানই অ্যানড্রুজ নামে এক বই বিক্রেতার কথা প্রথম উল্লেখ করেন। যেখান থেকে এই ছাপাখানার নাম সম্পর্কে একটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু গ্রাহাম শ-এর মতে, অ্যানড্রুজের ছাপাখানা থেকে বাংলায় মুদ্রিত প্রথম বই আমরা পেলেও তা বাংলার প্রথম ছাপাখানা নয়। বাংলায় প্রথম ছাপাখানার কৃতিত্ব যায় যে মানুষটির কাছে তিনি সাংবাদিক জেমস অগস্টাস হিকি। জাহাজে এক চিকিৎসকের সহকারী হিসেবে তিনি কলকাতায় আসেন ১৭৭২ সালে। কলকাতায় আসার আগে তিনি ছাপাখানার কাজ শিখেছিলেন; কিন্তু কলকাতায় তিনি ছাপাখানা করতে আসেননি, এসেছিলেন ব্যবসা করবেন বলে। ভারতে প্রথম ছাপাখানা আসবার মতোই হিকির ভারতে আসা ও ছাপাখানা খোলা, ছাপার উদ্দেশ্যে নয় - নেহাতই ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণে। হিকির ব্যবসা ডুবে যাওয়ায় দেনার দায়ে জেলে যেতে হয়। হাতে ছিল দু'হাজার টাকা। তাই দিয়ে কাঠের প্রেস কিনে ছাপার কাজ শুরু করেন। সেটি ১৭৭৭ সালের কথা। এরপর অন্তত তিন বছর হিকিই ছিলেন কলকাতা শহরের একচেটিয়া মুদ্রাকর। মিলিটারি বিল, সরকারি কাজের ফর্ম এসবই হিকির ছাপাখানা থেকে ছাপা হত। এরপর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হিকি ১৭৮০

সালে রাধাবাজার থেকে প্রকাশ করলেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভারটাইজার'।

১৭৭৭ সালে হিকির প্রেসের পরেই আসে আগে উল্লিখিত অ্যানড্রুজের ছাপাখানা। এই ছাপাখানা হিকির ছাপাখানার প্রায় সঙ্গেই স্থাপিত। হালহেডের ব্যাকরণ ছাপবার পর, এ কাজে সাহায্যকারী চার্লস উইলকিন্সের তত্ত্বাবধানে কোম্পানি নিজস্ব প্রেস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় ১৭৭৮ সালেই। ১৭৭৯ সালে উইলকিন্সের সঙ্গে এই প্রেস মালদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৮১ সালে উইলকিন্স ফারসি ও বাংলা অনুবাদকের চাকরি নিয়ে কলকাতায় আসেন। 'অনারেবেল কোম্পানিজ প্রেস'-ও ১৭৮১ সালে কলকাতায় নিয়ে এসে স্থাপন করা হয়। শ্রীপান্থের মতে, ১৮০০ সালের মধ্যে কলকাতায় মোট মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা ৬৫০ হলে তার মধ্যে ৩১৬ খানাই প্রায় ছাপা হয়েছে এই প্রেসে। হিকির প্রেস ও অ্যানড্রুজের প্রেসের সমসাময়িক আরেকটি প্রেসের কথা জানা যাচ্ছে যা স্থাপন করেন জন জাকারায়া কিয়েরনানডার নামে একজন সুইডিশ মিশনারি। ১৭৫৮ সালে তিনি কলকাতায় আসেন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে। ১৭৭৯ সালে 'Society for Promoting Christian Knowledge' এর তরফে মার্চ মাসে তাঁকে একটি প্রেস ও কিছু টাইপ পাঠানো হয়। এই প্রেসে ছাপা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে ১৭৮০ সালে; আশা করা যায় তাঁর প্রেসটি কাজ করতে শুরু করে ১৭৭৯ সালেই। ছাপার কাজ নিয়েই হিকির সঙ্গে কিয়েরনানডারের বিরোধ শুরু হয়। পরে মেসিঙ্ক (হিকির প্রতিদ্বন্দ্বী) কিয়েরনানডারের কাছে টাইপের সাহায্য নিয়ে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রকাশ করলে বিরোধ আরও প্রকাশ্য হয়। মানহানির মামলায় হিকি জেলে যান। জেলেই ন' মাস কাগজ চালানোর পরে সরকার তাঁর ছাপাখানা ও টাইপ বাজেয়াপ্ত করেন। সমসাময়িক এই ছাপাখানাগুলির মধ্যে কোনটা আগে বা পরে স্থাপিত এই নিয়ে নানা তর্ক চলেছে। এই তর্কের অবসান ঘটান গ্রাহাম শ। তিনি 'Printing in Calcutta to 1800' বইতে দেখিয়েছেন, হিকির ছাপাখানাই বাংলায় প্রথম। কারণ তিনি হিকির ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত ১৭৭৮ সালের একখানি ক্যালেন্ডার খুঁজে পেয়েছেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড অ্যাফ্রিকান স্টাডিজ-এর গ্রন্থাগারে। যার নামপত্রে লেখা ছিল 'Calendar for The Year of Our Lord MDCCLXXVIII'। ১৭৭৮ সালের ক্যালেন্ডার প্রকাশের জন্য স্বাভাবিকভাবেই কাজ শুরু করতে হয়েছে ১৭৭৭ সালেই। ক্যালেন্ডারে মুদ্রাকরের নাম না থাকলেও, কলকাতায় ছাপা এই ক্যালেন্ডার ধরে নিতে হবে হিকির ছাপাখানাতেই ছাপা।

আশিস খাস্তগীর তাঁর 'উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা' বইতে বলছেন, ১৮০০ সালের মধ্যে কলকাতায় জীবিত ছিল ১৭টি প্রেস। তার মধ্যে কোম্পানির প্রেসটি সরকারি আর বাকি সবগুলি বেসরকারি। কিন্তু গ্রাহাম শ তাঁর বইতে দেখাচ্ছেন ১৭৯৯ সাল অবধি কলকাতায় প্রায় ২৫টি প্রেস ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই মালিকানা বদল করেছেন ও অনেকেই এক প্রেস থেকে ছেড়ে নিজস্ব উদ্যোগে প্রেস তৈরি করেছেন।

কিন্তু ১৮০০ সালের একটু আগে থেকেই প্রেসের ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। ১৭৮৪ সালে গ্ল্যাডউইন সাহেব সরকারের কাছে কোম্পানির প্রেস থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের অনুমোদন চান। দুটি সুবিধে তিনি সরকারের কাছে আদায় করেন। একটি কোম্পানির সব হুকুমনামা, বিজ্ঞাপন শুধু তাঁর কাগজেই ছাপা হবে আর প্রচলিত হারের অর্ধেক দামে ডাকবিভাগ তাঁর পত্রিকা গ্রহণ করবে। সরকার বাহাদুর তাঁর সব দাবী মেনে নেন। প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা গেজেট'। বোঝা যায় ছাপাখানা স্থাপনে সরকারেরও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল।

১৮০০ সালের শুরু থেকে মুদ্রণ ও ছাপাখানা এ দু'য়েরই চেহারা বদলাচ্ছে। কারণ এই শতকের শুরুতেই শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ছাপার কাজ শুরু করছে। এতদিন ছাপাখানাগুলি কিছুটা পত্রিকার মুখাপেক্ষী ছিল, এখন শুধু বই ছাপবার জন্যে ছাপাখানা তৈরি হতে থাকল। কারণ শিক্ষা ও ধর্মের প্রসার। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যাকরণ আর ধর্মপ্রচারের জন্য বাইবেল। উইলিয়াম কেরি ১৭৯৭ সাল থেকেই ঘুরছিলেন তাঁর করা বাইবেলের বঙ্গানুবাদ নিয়ে। কলকাতার মুদ্রাকরদের কাছে ছাপবার দামও জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁকে বলা হয় ১০ হাজার কপি বাইবেল ছাপতে খরচ পড়বে ৪৩,৭৫০ টাকা। কিন্তু এবছরেই মাত্র ৪০ পাউণ্ডে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে বাংলা টাইপ তৈরি করিয়ে মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনি বাইবেল ছেপে ফেললেন আরও কম টাকায়। শুরু হল মিশনের ছাপার কাজ। অনতিবিলম্বে ছাপার কাজে কেরির হাত ধরবেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বন্ধুরা। জোনস্, উইলকিনসদের সঙ্গেই বাংলা পড়াতে যোগ দেন কেরি এই কলেজে। কলেজের ছাপার কাজও শুরু হয়। এই কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় আরও তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রেসের সূচনা হয়। ১৮০২ সালে গিলক্রিস্টের 'হিন্দুস্থানি প্রেস', ১৮০৫ সালে ম্যাথু লামস্ডেনের 'পারসিয়ান প্রেস', ১৮০৮ সালে 'সংস্কৃত প্রেস' যা বাবুরামের প্রেস নামে পরিচিত। কলেজের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক ছাপবার ও যথেচ্ছ বিক্রির শর্তে গিলক্রিস্ট হিন্দুস্থানী প্রেস স্থাপন করেন। জানা যায় এই প্রেস থেকে গিলক্রিস্ট যথেষ্ট পয়সা উপার্জন করেন।

বাবুরামের পরেই গুরুত্বপূর্ণ লোকটি অবশ্যই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮১৮ সালে 'Bengal Gazette Press' প্রেসটি প্রথম কোনো বাঙালির হাতে গড়ে ওঠা ছাপাখানা। বাবুরামের প্রেসটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আনুকূল্য পেলেও এই প্রেসটি গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে। বাংলার মুদ্রণের ইতিহাসে এই বছরটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৮ সালেই প্রথম দেশীয় লোকের দ্বারা প্রেস স্থাপন এবং এই প্রেস এই বছরই বাঙালিকে দিল তার প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগ্‌দর্শন' আর প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ'। উনিশ শতকের এই দ্বিতীয় দশক বাংলা মুদ্রাযন্ত্র ও বাংলা বইয়ের প্রকাশের ক্ষেত্রে স্মরণীয় দশক। এই দশ বছরের মধ্যে শ্রীরামপুরে গড়ে উঠছে আরও কয়েকটি ছাপাখানা। আর কলকাতায় স্থাপিত হচ্ছে স্কুল বুক সোসাইটি, রামমোহনের প্রেস, সমাচার চন্দ্রিকার প্রেস, সম্বাদ তিমির নাশকের প্রেস এরকম আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রেস। যারা পরবর্তী দশকগুলিতে ছাপাখানার প্রতি অনেক বেশি মানুষকে উৎসাহিত করছে। বাংলা ছাপাখানার জোয়ার আসছে তৃতীয় দশক থেকে। সংবাদপত্র

ও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ভিড় লেগে যাচ্ছে এসময়। ছাপাখানার অঞ্চলের ব্যাপ্তি ঘটছে। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ, হুগলি, মালদা, ওপার বাংলার রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাংলার বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসামেও ছড়িয়ে পড়ছে ছাপাখানা। সম্প্রতি আশিস খাস্তগীর তাঁর গবেষণায় বাংলায় তৎকালীন ছাপাখানার পরিসংখ্যান দিয়েছেন। আশিসবাবু ১৮০০ সাল থেকে পুরো শতক জুড়ে প্রায় ১২৭০টি প্রেসের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি গোটা উনিশ শতকের ছাপাখানাকে চারভাবে ভাগ করে দেখতে চেয়েছেন। মিশনারিদের ছাপাখানা, সরকারি ছাপাখানা, সভা-সমিতির ছাপাখানা, পত্র-পত্রিকার ছাপাখানা। তাঁর মতে যথার্থ অর্থে গ্রন্থ মুদ্রণের শুরু উনিশ শতকেই। আর তার পথিকৃৎ মিশনারিরা। মিশনারিদের ছাপাখানার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছাপাখানা শ্রীরামপুরের ছাপাখানা। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ছাপাখানার মধ্যে পড়ত ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। ১৮১৮ সালে ক্যালকাটা মর্নিং পত্রিকার প্রেস থেকে পুরোনো প্রেস কিনে ছাপার কাজ শুরু হয়। পাঠ্যপুস্তক, ধর্মীয় পুস্তক, প্রচারপত্র ছাপা হত। ১৮১৯ এ স্কুল প্রেস, লন্ডন মিশনারির প্রেস। সেখান থেকেই ছেপে বেরিয়েছিল পিয়ার্সনের ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ, স্টুয়ার্টের উপদেশকথা, মে-র অঙ্ক পুস্তক। ১৮২০তে আমহার্স স্ট্রিটের চার্চ মিশন প্রেসও উল্লেখযোগ্য ছাপার কাজ করে এ সময়। মিশনারি পরিচালিত আরও কিছু প্রেস হল বিশপস্ কলেজ প্রেস (১৮২৪), আমেরিকান ব্যাপটিস্ট প্রেস (১৮৪০), খ্রিস্টিয়ান ভার্নাকুলার এডুকেশন প্রেস (১৮৮২) ইত্যাদি।

সরকারি ছাপাখানার মধ্যে ছিল অনারেবল কোম্পানির প্রেস। মিলিটারি অরফ্যান সোসাইটির প্রেস ১৮০৬ সালে খিদিরপুরে স্থাপিত হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ছাড়াও এই প্রেস রামমোহনের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' ছেপেছিল। ১৮৫৫ সালে স্থাপিত আলিপুর জেল প্রেস আরেকটি সরকারি ছাপাখানা। জেল সংক্রান্ত কাগজপত্র ছাড়াও এখান থেকে ছাপা হয়েছিল জেমস্ লঙের 'দৃষ্টান্তরত্ন', রামচন্দ্র মিত্রের 'মনোরম্য পাঠ'।

উনিশ শতকে সভা-সমিতির দ্বারা পরিচালিত প্রেসের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রেস হল স্কুল বুক সোসাইটির প্রেস। ১৮২৪ সালে ১২ নং সার্কুলার রোডে সোসাইটির নিজস্ব প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী', তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' ছাড়াও স্কুল বুক সসাইটি পাঠ্যপুস্তক ছাপার কারণে বিখ্যাত ছিল। বাংলা মুদ্রণে গুণগত উৎকর্ষ ও আঙ্গিকগত পারিপাট্য স্কুল বুক সোসাইটিরই দান। আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রেস অবশ্যই ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা। রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। যার দায়িত্বে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার তাগিদে পাঠ্যপুস্তক লিখতে থাকেন তিনি। ছাপার জন্য স্থাপিত হল প্রেস। অক্ষয় দত্তের সবকটি বইই এই প্রেস থেকে ছাপা হয়। ছাপা হতে শুরু করল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও। রামমোহন রায়ের বই আবার করে মুদ্রিত হতে শুরু করল এই প্রেসে। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাকের বইও ছাপা হয় এখান থেকেই। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'বিক্রমোর্বশী', 'হিন্দুদিগের রাজভক্তি'র মতো বই ছাপা হয়েছিল এই তত্ত্ববোধিনী প্রেস থেকেই। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের কথায় মনে পড়বে ভার্নাকুলার

লিটারেচার সোসাইটির কথা। ১৮১৫ সালে জন্ম নেয় এই সোসাইটি। যার সভ্যদের মধ্যে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব এমনকি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এই সোসাইটি ছাপার জন্য বেছে নেয় অনুবাদ বইকে। যেসব বইয়ের অনুবাদ সে সময় কলকাতার অন্য কোনো প্রেস করছিল না, সেগুলোই তারা বাছতে চাইলেন। পাঠ্যপুস্তক, ধর্মীয় পুস্তক বা পুরাণের গল্পের বাইরের বই ছাপা হল এই প্রেস থেকে। 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' নামে যা বাঙালির ঘরোয়া সাহিত্য সৃজনে একটি মাত্রা যোগ করল।

পত্র-পত্রিকার ছাপাখানা নিয়ে কিছুটা ধারনা আগেই দেওয়া গেছে। সব মিলিয়ে উনিশ শতক জুড়েই রয়েছে ছাপাখানার গল্প। উনিশ শতকের বাঙালি কী ভাবছিল, কীভাবে ভাবছিল তার যোগসূত্র এই ছাপাখানাগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরে।

ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলায় ছাপাখানার কদর বাড়বার আরেকটি কারণ শিক্ষার প্রসার। নতুন দেশ জয় করে কোম্পানির কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হল এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতি। এই দুটিকে না বুঝলে শাসনকাজ চালানো মুশকিল। যে কারণে লন্ডন থেকে ছেপে আনতে হল 'জেন্টু ল'জ'। ভাষাকে বোঝবার জন্য ব্যাকরণ ও অভিধান। তারপর প্রয়োজন হল কেরানির। যারা দেশীয় ও ইংরেজি দুটি ভাষাই জানবে এবং ইংরেজের দেশ শাসনের নীতি নিয়ম বুঝবে। মোটামুটি তিনটি কারণ ছিল তৎকালীন শাসকের কাছে শিক্ষার প্রসারের জন্য, এক এদেশে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিচারের নিষ্পত্তি হত প্রচলিত আইনের দ্বারা। সেই আইনগুলি ছিল ধর্মনির্ভর। দুই, মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রকে উর্বর করবার কারণে শিক্ষাবিস্তার। তিন, কিছু শাসক দেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হলেন। এদেশের মানুষের শিক্ষা নিয়েও তাঁরা ভাবলেন। এই কারণগুলি নতুন সরকারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল ছাপাখানা প্রবর্তনের জন্য। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ, ১৮১৮তে শ্রীরামপুরের ইংরেজি কলেজ, হেয়ার স্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হল পাঠ্য বইয়ের। আর সংবাদ-সাময়িকপত্র কীভাবে ছাপাখানার প্রসারে এগিয়ে এল সে নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

ভারত এবং বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসের একটি সুবিধে আছে। যা আবার এই ইতিহাসকে জটিলও করেছে। ইউরোপে মুদ্রাযন্ত্রের কৌশল বদলেছে ধীরে ধীরে। কাঠের প্রেস থেকে লোহা বা স্টিমচালিত প্রেস। এই সবকিছুর বদল ঘটেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ফলে রয়েছে তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস। যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছাপার পদ্ধতি, ছাপার সুবিধার্থে লেখার বদলএগুলো লক্ষ করা সম্ভব। কিন্তু ভারতবর্ষ বা বাংলার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। এমনিতেই ইউরোপের একশ বছর পর ভারতে মুদ্রাযন্ত্র আনে পর্তুগিজরা। আর গোয়া থেকে বাংলায় তা আসতে লেগে গেল আরও ২০০ বছর। অবশ্যই ১৫৫৬ সালে যে মুদ্রাযন্ত্র গোয়ায় নেমেছিল আর কেরি ৪০ পাউন্ড দিয়ে সস্তায় যে মুদ্রণযন্ত্র কিনেছিলেন এ দুটিই কাঠের। কিন্তু বাংলায় যখন শুরু হল ছাপার কাজ তা কি দ্রুততায় প্রসার লাভ করল তা আমরা দেখেছি। ১৮৪০ সালের মধ্যে প্রেসের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে গিয়েছিল শুধু কলকাতাতেই। এই লাভজনক ব্যবসায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাপাখানা খুলছিলেন অনেকেই।

কাঠের প্রেস থেকে লোহার বা সিলিন্ডার প্রেসে আসতে বেশি সময় ইউরোপের মতো সময় লাগেনি বাংলার।

১৭৯৮ সালে কেরির তত্ত্বাবধানে কেনা হয় কাঠের প্রেস। ১৮০০ সাল অবধি শ্রীরামপুর প্রেসকে পাঁচটি কাঠের প্রেসেই কাজ চালাতে হয়েছিল। ১৮১৮ সালের অগাস্ট মাসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস কেনেন একটি সেকেন্ড হ্যান্ড হস্তচালিত কাঠের প্রেস। আর দু'মাসের মধ্যেই তাঁরা কেনেন লোহার প্রেস। কাঠের প্রেস থেকে লোহার প্রেসে আসতে ইউরোপের যাখানে ১৫৫০ সাল থেকে ১৮০০ সাল অবধি অপেক্ষা করতে হল বাংলায় তার জন্য অপেক্ষা করতে হল মাত্র ২০ বছর। ১৮৫৯ সালে জেমস্ লঙের পর্যবেক্ষণ, কাঠের ছাপাখানা বাংলায় প্রায় দেখাই যায় না কলকাতায়। শ্রীপান্থ জানাচ্ছেন:

কলকাতায় যেসব পুরোনো প্রেস চলছিল তার মধ্যে সবচেয়ে মুদ্রাকর-প্রিয় ছিল নাকি চিলে প্রেস বা কলম্বিয়ান প্রেস, ইম্পিরিয়াল প্রেস, আর অ্যালবিয়ান প্রেস। বলা নিষ্প্রয়োজন, সবই লোহায় গড়াছাপার কল। (শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল', পৃ ১২৬)

লোহার এই মুদ্রণযন্ত্র সবই আসত ইউরোপ থেকে। তবে দেশীয় কাঠের ছাপাকলের কথাও জানা যায়। ফলে এখানে মুদ্রণযন্ত্রের ধরন বদলের ইতিহাস নেই। উডকাট, ধাতুখোদাই আর লিথোগ্রাফি একই সঙ্গে চলেছে এখানে। এখানে বরং অনেক ক্ষেত্রে যন্ত্রকে নির্ভর করতে হয়েছে যিনি ছবি ছাপবেন তাঁর রুচির উপর। ১৮৪৭ সালে যখন 'শাহনামা'-তে লিথো প্রতিকৃতি চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তখন ১৮৭৬ সালে ৭৫টি ছবি সম্বলিত বই 'দেবীযুদ্ধ' গ্রন্থে পঞ্চানন কর্মকারের আঁকা উজ্জ্বল কাঠখোদাই

ওয়ারেন হেস্টিংস
চিত্র ঋণ : উইকিপিডিয়া

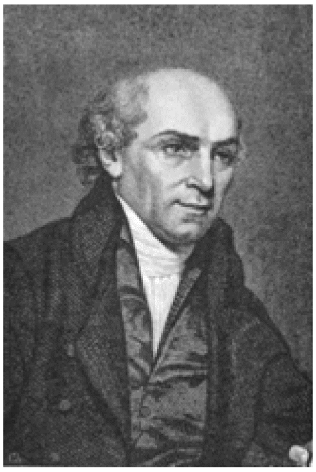

উইলিয়াম কেরী
চিত্র ঋণ : উইকিপিডিয়া

চিত্রও ছাপা হচ্ছে। বিদেশী শাসন ভারতবর্ষের ছাপাখানার ইতিহাসে কিছু সুবিধে করে দিয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বই ছাপবার সম্ভাবনাকে যতটাই এড়িয়ে গিয়েছিল ভারত ও বাংলার মানুষ, উনিশ শতকে এসে 'সাহেবদের ঠাকুর' আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের সবরকম সুবিধেই সে গ্রহণ করেছে।

৩.৪. প্রচলিত মুদ্রণ পদ্ধতি

বিভিন্ন মুদ্রণব্যবস্থা (Different modes of Printing): মুদ্রণব্যবস্থার প্রধানত দুটি অংশ। একটি হল কম্পোজিং আর একটি হল প্রিন্টিং। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে এই দুই ব্যবস্থারই যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। উন্নতি অর্থে মুদ্রণ শিল্পে দুটি বস্তু বোঝানো হয়ে থাকে। একটি হল মুদ্রণ পারিপাট্য বা ঝকঝকে ছাপা আর একটি হল দ্রুত ছাপা। উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মুদ্রণযন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় মাত্র ৩০০ শিট খবরের কাগজ ছাপানো সম্ভব হত। বর্তমানে একটি সাধারণ রাশিয়ান ভলগা রোটারি মুদ্রণযন্ত্রের আট পৃষ্ঠার একটি স্ট্যান্ডার্ড সাইজের সংবাদপত্রে (৫৭৭.৮৫ × ৮৩৬.২ মি.মি.) ঘণ্টায় ৫০ হাজার কপি ছাপা যায়। অতি আধুনিক রোটারি অফসেট প্রেস থেকে ঘণ্টায় এক লক্ষ বিশ হাজার কপি খবরের কাগজ ছাপা সম্ভব হচ্ছে।

আধুনিক অফসেট প্রেস। চিত্রঋণ- উইকিপিডিয়া

কম্পোজিং বা অক্ষর সাজাবার যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল সেটি হল ডালার সামনে বসে হাতে অক্ষর সাজানো। এই পদ্ধতিতে ঘণ্টায় মাত্র ২০০ শব্দ সাজানো যায় কিন্তু আধুনিক DTP (Desk Top Publishing) পদ্ধতিতে মিনিটে ৩০০ লাইন ও ঘণ্টায় ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার শব্দ কম্পোজ করা সম্ভব হচ্ছে।

সর্বপ্রথম বিভিন্ন মুদ্রণ পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

দীপঙ্কর সেন মুদ্রণের মূল পদ্ধতিগুলিকে চার ভাগে ভাগ করেছেন- (১) লেটার প্রেস মুদ্রণ পদ্ধতি (২) লিথো অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি (৩) ফটোগ্রাভিয়র এবং (৪) সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং অন্যান্য রকমারি পদ্ধতি; যেমন, Xerography, চিত্রমুদ্রণ ইত্যাদি।।

(১) লেটার প্রেস মুদ্রণ পদ্ধতি : এই পদ্ধতি খুব প্রাচীন পদ্ধতি। লেটার প্রেস হল সেই ধরনের মুদ্রণ পদ্ধতি যেখানে মুদ্রণযোগ্য ম্যাটার উঁচু হয়ে থাকে। ছাপার সময় কালি শুধু ওই ম্যাটারের উপর পড়ে। যে অংশগুলি ছাপা হবে না সেগুলি সমতলে থাকায়, কালি তার উপর পড়ে না। এই পদ্ধতিতে সরাসরি টাইপ থেকে ছাপা যায়। অথবা টাইপ থেকে তোলা ছাঁচ স্টেরিও বা টাইপ-প্লেট থেকেও ছাপা যায়। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণীয় ছবি অথবা হরফকে উঁচু করে গরে নেওয়া হয় বলে ইংরেজিতে একে 'রিলিফ প্রেসেস' বলে। টাইপ দিয়ে হরফ ছাপা এবং ব্লক দিয়ে ছবি ছাপা হল এই পদ্ধতির বড় কথা। লেটার প্রেসে প্রতিলিপি খুব সূক্ষ্মভাবে ওঠে। এজন্য লেটার প্রেসে ছাপাকে বিশ্বস্ত বলা হয়। ছবির ডট ও ক্যারেকটারের আউটলাইন হুবহু উঠে যায়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে ছাপার সময় একেবারে শেষ মুহূর্তেও সংশোধন করা যায়। কারণ লেটার প্রেস মুখ্যত সরাসরি টাইপ থেকে ছাপা হয়। কোনও টাইপ ভুল হলে সেটি শেষ মুহূর্তেও পালটে দেওয়া যায়। রঙিন হাফটোন বি, হাফটোন ও লাইন ব্লকের সমন্বয়ে কোনও বিজ্ঞাপনের মেটিরিয়াল লেটার প্রেসে খুব ভালোভাবে ছাপানো যায়। শুধু অসুবিধা হল এই পদ্ধতিতে ছাপা ব্যয়বহুল। কারণ প্রতিটি ছবির জন্য আলাদা আলাদা ব্লক করতে হয়। তাছাড়া হাফটোন ব্লকের ভাল ইম্প্রেসন পেতে গেলে আর্ট পেপার ব্যবহার করতে হয়।

লেটার প্রেস আবার দু'ধরনের ফ্ল্যাট বেড ও রোটারি। ফ্ল্যাট বেড ছাপায় একটি টেবিলের মতো সমতল এই প্রেসে কালি মাখানো রোলার ম্যাটারের উপর এসে পড়ে এবং একটি করে কাগজের উপর ওই ম্যাটারের ছাপ উঠে যায়। প্রথমদিকে বোলারে কালি লাগাতে হত হাত দিয়ে। তারপর ১৮১৪ সালে জার্মানির একজন মুদ্রক ফ্রেডরিখ কোনিগ (Freidrich Konig) ইংলন্ডে মুদ্রণযন্ত্রটিকে আরও একটু স্বয়ংক্রিয় করে তোলেন। যার ফলে ইঙ্কিং সিলিন্ডার ও আর একটি সিলিন্ডার ক্রমান্বয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছাপার কাজ সম্পন্ন করে ফেলে। শুধু প্রত্যেকবার একটি করে শিট দুই সিলিন্ডারের মাঝে দিতে হয়। এর ফলে ঘণ্টায় এক হাজার থেকে দু'হাজার করে শিট ছাপা সম্ভব হয়ে ওঠে।

এর পঞ্চাশ বছর পরে আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয় রোটারি প্রেস। ১৮৬৩ সালে উইলিয়ম বুলক (William Bullock) এই উন্নত ছাপা যন্ত্র আবিষ্কার করেন। রোটারি প্রেস টেবিলের মতো সমান নয়, এটি একটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের মতো। কাগজ, কালি, টাইপ সমস্তই এই ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডারের উপর থাকে। এর ফলে লাটাইয়ের মতো রোল করা কাগজ থেকে অবিরামভাবে অধিকতর গতিতে সংবাদপত্র ছাপা সম্ভব হয়। বর্তমানে একটি সর্বাধুনিক রোটারি মেশিন ঘণ্টায় এক লক্ষ বিশ হাজার কপি কাগজ ছাপতে পারে। শুধু তাই নয়, এই মেশিনের সাহায্যে কাগজ কাটা ও ভাঁজ করা আপনা আপনি সম্ভব হয়। রোটারি প্রেস প্রধানত সংবাদ প্রকাশের জন্যই ব্যবহৃত হয়। রোটারি প্রেসের মুদ্রণের সাধারণ গতি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ হাজার কপি। কিন্তু অফসেট আসায় লেটার প্রেস রোটারি এখন বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

(২) **লিথো অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি :** লিথো অফসেটের আর একটি নাম প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতি। প্লেনোগ্রাফ পদ্ধতির অর্থ সমতল (Plain Surface) থেকে ছাপা পদ্ধতি। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে মুদ্রণযোগ্য এলাকা ও মুদ্রণ বহির্ভূত এলাকার মধ্যে কোনও ফারাক নেই যা লেটার প্রেসে আছে। ১৭৯৬ সালে একজন জার্মান ভদ্রলোক Alois Senefelder এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি লিথোগ্রাফি নামে পরিচিত ছিল। লিথোগ্রাফির মূল নীতি হচ্ছে তেল আর জলের মধ্যে বিরোধ। প্রিন্টিং ইমেজ বা ডিজাইন (কালি গ্রহণ করে জল বর্জন করে) এই নীতির উপর লিথোগ্রাফি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠিত। এই নীতি অনুসারে যে অংশ ছাপা হবে না সেই অংশে কালির বদলে জল থাকে। আর যে অংশ ছাপা হবে সেই অংশ লিথোগ্রাফিক কালি বা লিথোগ্রাফিক তৈলাক্ত করা থাকে। এর ফলে ওই তৈলাক্ত অংশে জল দাঁড়াতে পারে না। দীপঙ্কর সেন এই পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> "লিথোগ্রাফি কথাটির অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, পাথরের সাহায্যে মুদ্রণ। এই মুদ্রণের বৈশিষ্ট্য কয়েকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সীমায়িত। যে-পাথরের উপর মুদ্রণীয় নকশা তৈরি করা হয় তার রাসায়নিক নাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট। এই পাথরের উপর এক ধরনের তৈলাক্ত কালি দিয়ে কোনো-কিছু এঁকে নিলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে একটি নতুন যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই তৈলাক্ত কালির ভিতর যে-স্টিয়ারিক অথবা ওলিয়িক অ্যাসিড বর্তমান, তার সংস্পর্শে এসে লিথোমুদ্রণের পাথরটির উপর ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট অথবা ক্যালসিয়াম ওলিয়েট-এর একটি অংশ সৃষ্ট হয়। এই অংশটির ধর্ম হল চটচটে কালিকে আকর্ষণ করা এবং জলকে প্রতিহত করা। লিথো প্রস্তরের এটিই হল মুদ্রণীয় অংশ। অমুদ্রণীয় অংশ সৃষ্টির জন্য আরেকটি রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন। কারণ সেই অংশে যাতে কালি না ধরে তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে চলে না। গাম অ্যারাবিক অর্থাৎ আরবি আঠা দিয়ে এই অমুদ্রণীয় অংশটি অনায়াসে তৈরি করে নেওয়া যায়। ব্যাপারটি এইরকম: ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সঙ্গে আরবি আঠার অ্যারাবিনিক অ্যাসিড মিশে যে যৌগিক পদার্থ তৈরি হয় তার নাম ক্যালসিয়াম অ্যারাবিনেট। ক্যালসিয়াম অ্যারাবিনেট জলকে আকর্ষণ করে আর তৈলাক্ত কালিকে প্রতিহত করে। এমনি করে একই পাথরের সমতলের উপর দুটি বিশিষ্ট যৌগিক পদার্থ তৈরি করে নিয়ে তার উপর একই সঙ্গে জল ও কালির প্রলেপ লাগালে মুদ্রণীয় সমতলে কালি লাগে এবং অমুদ্রণীয় অংশে জল লেগে যায়। তারপর সেই কালি চাপের সাহায্যে পাথরের গায়ের থেকে কাগজের উপর ছেপে নিতে হয়। একটা বড়ো পাথরকে খোদাই করে মুদ্রণ করার চেয়ে এইভাবে মুদ্রণ করা অনেক সহজ এবং খরচের দিক থেকেও সস্তা।" ('মুদ্রণচর্চা', দীপঙ্কর সেন, প. বা. আ., পৃ.- ৫৫-৫৬)

গুটেনবার্গ আবিষ্কৃত লেটার প্রেস মুদ্রণ পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ার তিনশো বছর পরে আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি বর বড় শিল্পীদের যেভাবে আকৃষ্ট করেছিল অন্য কোনো মুদ্রণ পদ্ধতি তা পারেনি। ইউরোপের যে-সব বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিথোগ্রাফির কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে জার্মানির আডলফ ফন্‌ মেনটসেল, ফ্রান্সের

অনর দমিয়ের, ইনিয়াস ফাঁতালাতুর, স্পেনের গইয়া এবং ব্রিটেনের স্যামুয়েল প্রাউটের উল্লেখযোগ্য। তুলুজ লত্রেকের অসংখ্য নতুন ধরনের পোস্টার লিথোগ্রাফির দিগন্তকে প্রসারিত করেছিল অদ্ভুতভাবে। তাঁর নকশা করা খাদ্য-তালিকা, নানা ধরনের মুদ্রিত প্রোগ্রাম, বইয়ের মলাট ইত্যাদি লিথোগ্রাফিকে উন্নীত করেছিল শিল্পের স্তরে। লুই রেমেকার, জোসেফ পেনেল, হেনরি বোন প্রমুখ শিল্পীরা নিজেদের মৌলিক কাজের ভিতর দিয়ে লিথোগ্রাফির শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন বহু অসামান্য রঙিন চিত্র মুদ্রণ করে।

বাংলা মুদ্রণেও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিথোগ্রাফির প্রবর্তন। নানারকম ছবি, নকশা, মানচিত্র ছাপা শুরু হয় এই নতুন পদ্ধতিতে। ১৮২৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম লিথোমুদ্রণের মাধ্যমে ছাপা হয়েছিল ভারতের এবং বাংলার মানচিত্র, সে-বছরেই গঙ্গা নদীর নকশাও ছাপা হয়েছিল একই পদ্ধতিতে। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ১২১টি ছবিতে ভারতবর্ষের অসংখ্য রাস্তার বিবরণ ছাপা হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন রকমের বই, প্রতিমূর্তি, ক্যালেন্ডার এবং নানা ধরনের ছাপার মধ্য দিয়ে হয়েছিল লিথোমুদ্রণের অগ্রগতির সূচনা। লিথোগ্রাফি প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী রাজা রবি বর্মার নাম আজ অনেকেই জানেন না। তিনি নিজের আঁকা ছবি লিথোমুদ্রণ-পদ্ধতিতে ছাপাবার জন্য বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। লিথোগ্রাফিক মুদ্রণ গগনেন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল একসময়।

লিথোগ্রাফি পদ্ধতিতে কিছু ইমেজ বা ডিজাইন বা কিছু লেখা ওই স্টোনের উপরেই লিখতে হয়। পরে স্টোন বা পাথরের বদলে অ্যালুমিনিয়াম শিট ব্যবহার করা হতে থাকে। এইলেখা সরাসরি হয় না, বিশেষ কালি দিয়ে লেখা হয় একটি কাগজে। তারপর লেখাটিকে ওই পাথরের উপর চাপা দেওয়া হয়। লেখাটি তখন পাথরের উপর উঠে যায়। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটানো হয় অফসেট লিথো আবিষ্কারের দ্বারা। যে-রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাথরের খণ্ডকে লিথোগ্রাফির কাজের উপযোগী করে তোলা হত তারই প্রয়োগে দস্তা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে মুদ্রণ সম্ভব হওয়ায় লিথোমুদ্রণের কাজ খুবই তাড়াতাড়ি করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই ধাতব পাত বা চাদরগুলোকে মুদ্রণযন্ত্রের বেলনাকার অংশের (cylinder) গায়ে এঁটে নিলে খুবই দ্রুতগতিতে কাজ করা সম্ভব। পাথর বা ধাতব চাদর থেকে সরাসরি কাগজ বা অন্য কিছুর উপর ছাপার প্রণালির নাম "ডাইরেক্ট প্রিন্টিং"। আর তা না করে মুদ্রণীয় ছবি অথবা হরফ একটি রবারের চাদরের উপর ছেপে সেখান থেকে কাগজ, কাপড় বা অন্য-কিছুতে ছেপে নেওয়ার পদ্ধতিকে আমরা বলি "অফসেট"। অফসেট প্রেস দু'ভাগে বিভক্ত। শিট অফসেট ও ওয়েব অফসেট (Sheet Offset and Web Offset)। শিট অফসেটে শিট কাগজে ছাপা হয়। ওয়েব অফসেট প্রেসে কাগজ রিলের মধ্যে থাকে। ওয়েব অফসেটে গতি অপেক্ষাকৃত বেশি ওঠে। পাতলা কাগজ ব্যবহার করা যায়। বই, ব্রোশিওর, ডাইরেক্টরি, ম্যাগাজিন, বাচ্চাদের রঙিন বই, ওয়েব অফসেটে ছাপার উপযোগী। ওয়েব অফসেট প্রেসে ঘণ্টায় ২৫ হাজার কপি সংবাদপত্র ছাপা যায়।

(৩) ফটোগ্রাভিয়র- লেটারপ্রেস-পদ্ধতিতে টাইপ অথবা ব্লকের মুদ্রণীয় অংশ থাকে সবচেয়ে উঁচুতে। লিথোগ্রাফিতে প্লেট অথবা পাথরের খণ্ডের উপর মুদ্রণীয় এবং অমুদ্রণীয় অংশ একই সমতলে থাকে। আর গ্রাভিয়র-এ মুদ্রণীয় এলাকা অমুদ্রণীয় এলাকার চেয়ে নীচে থাকে। গ্রাভিয়র-এর মুদ্রণীয় সিলিন্ডারে কালি মাখালে নিচু অংশগুলি কালিতে ভরে যায়। তারপর যান্ত্রিক উপায়ে অমুদ্রণীয় অংশের কালি মুছে নিয়ে

ছাপার কাজ চলে। খুব বেশি টানের কাজ না হলে ফোটোগ্রাভিয়র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে গ্রাভিয়র-মুদ্রণ তেমন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। এর মূল কারণ আর্থনীতিক। রাশিয়া এবং চীনে ফোটোগ্রাভিয়র বিশেষ লোকপ্রিয় মুদ্রণ-পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

(৪) সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্টিং এবং অন্যান্য রকমারি পদ্ধতি- বিভিন্ন রকমের মুদ্রণ-পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে সবার শেষে আলোচনা করব জেরোগ্রাফিক এবং সিল্ক প্রিন্টিং সম্বন্ধে। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ অফিস-কাছারিতে কপি করার কাজে জেরোগ্রাফিক প্রিন্টিং অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। জেরোগ্রাফির সাহায্যে কপির মূল নকশাকে অবিকলভাবে নকল করে নিতে সামান্য মাত্রও অসুবিধা হয় না। কপি করার ব্যাপারটি এত দ্রুতগতিতে হয়ে থাকে যে তাতে অফিসের কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। জেরোগ্রাফির আয়োজন থাকলে কপির মূল নকশাকে অর্থাৎ মুদ্রিত হরফ এবং ছবি প্রায় অবিকলভাবে নকল করা খুবই সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে অল্প খরচে।

স্ক্রিন প্রিন্টিং বলতে যে-জিনিসটির কথা সবচেয়ে বেশি মনে আসে তা হল একটি কাগজের পর্দা অথবা কাপড়ের টুকরো যা দিয়ে একটি স্টেনসিল তৈরি করা হয়। স্টেনসিলটির উপরে কালি ঢালতে হয়। স্টেনসিলের নিরেট অংশগুলি কালির প্রবাহকে প্রতিহত করে এবং তার খোলা জায়গাগুলি দিয়ে বিনা বাধায় তা বেরিয়ে আসে। সিল্ক স্ক্রিনের একটি মস্ত বড়ো সুবিধা হল তা কুটিরশিল্পের মতো গড়ে তোলা যায়। স্ক্রিন প্রিন্টিং-এর স্টেনসিলটি তৈরি করার জন্য তার উপরে photo sensitive emulsion লাগিয়ে কাজ করতে হয়।

মুদ্রণ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চিত্রমুদ্রণ বিষয়ে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজন। মুদ্রণের এই শাখায় একজন ভারতীয় অত্যন্ত মূল্যবান এবং মৌলিক কাজ করে গেছেন। প্রায় পঁচাশি বছর আগে উপেন্দ্রকিশোরের বৈজ্ঞানিক চিন্তা হাফটোন ব্লক তৈরির কাজে গাণিতিক নির্ভুলতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ফোটোগ্রাফ বা শিল্পীর আঁকা ছবি কিংবা ট্রান্সপারেন্সি প্রভৃতি ছাপার কাগজের বা অন্য-কিছুর উপর ছেপে নিতে না পারলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একটা মস্ত বড়ো ফাঁক থেকে যেত। আমাদের সমসাময়িক পাঠকবৃন্দ একদিকে যেমন নতুন নতুন সংবাদ পাঠ করতে চান অপরদিকে তাঁরা চান সে-সব সংবাদের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলিও ছাপা হোক নিয়মিতভাবে। আমরা লেটারপ্রেসে যে-সব ছাপা ছবি দেখি সেগুলো মূলত লাইন অথবা হাফটোন ছবি। লাইন ছবির অর্থ হল যাতে সাদা আর কালো ছাড়া আর কিছুই নেই। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রিত অংশটুকু কালোর পরিবর্তে অন্য রঙের কালি দিয়েও ছাপা যেতে পারে। হাফটোন ছবিতে সাদা আর কালো ছাড়া তাদের মাঝামাঝি জায়গাগুলিতে অবস্থিত কালিমার নানাপ্রকার আঁচ অথবা আমেজকে ফুটিয়ে তোলার জন্য হাফটোন স্ক্রিন দিয়ে তৈরি নানা আকারের ফুটকিগুলো বিশেষ কাজে লাগে। হাফটোন ব্লকের নেগেটিভ তৈরি করার জন্য ক্যামেরার ভিতর যেখানে ফোটোগ্রাফিক প্লেট অথবা ফিল্ম থাকে তার সামনে একটু ফাঁক রেখে আড়াআড়িভাবে বুলটানা যে-কাচের পর্দা লাগানো হয় তাকে বলে "হাফটোন স্ক্রিন"। হাফটোন স্ক্রিন জিনিসটি এখন পুরোনো হয়ে গেছে। তার পরিবর্তে সমস্ত আধুনিক ছাপাখানায় এখন Contact Screen ব্যবহার করা হচ্ছে।

কম্পোজিং:

কোনও বিষয়কে মুদ্রণের আগে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কম্পোজ করা যায়। কম্পিউটর চালিত DTP আসার আগে এই পদ্ধতিগুলি প্রচলিত ছিল।

(১) ক্যালিগ্রাফি

(২) টাইপ রাইটিং

(৩) হ্যান্ড কম্পোজিং

(৪) লাইনো টাইপ, মোনো টাইপ ল্যাডলো বা হেডলাইন স্লাগ কাস্টিং মেশিন

(৫) ফোটোটাইপ সেটিং, কম্পিউটার টাইপ সেটিং, লেজার টাইপ সেটিং। আধুনিক বিশ্বে একমাত্র ফোটোটাইপ সেটিং, কম্পিউটার টাইপ সেটিং কিংবা লেজার টাইপ সেটিং পদ্ধতিই ব্যবহৃত হচ্ছে।

১। **ক্যালিগ্রাফ** (Calligraphy): মুদ্রণব্যবস্থা আবিষ্কারের আগে ক্যালিগ্রাফিই ছিল একমাত্র লিখন পদ্ধতি। শিল্পসম্মতভাবে লিখন পদ্ধতিই হল ক্যালিগ্রাফি। মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে ক্যালিগ্রাফাররা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতেন। মুদ্রণব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ক্যালিগ্রাফি পদ্ধতিতে কিছু লিখে তা লিথোগ্রাফি অফসেট পদ্ধতিতে কোনও প্লেটে প্রতিফলিত করা হয়।

২। **টাইপ রাইটিং** (Type Writing): বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক টাইপ রাইটার আবিষ্কৃত হওয়ার ছোট ছোট ছাপার ক্ষেত্রে টাইপ রাইটিং ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে কম্পোজিং চার্জ কম পড়ে। মোনোগ্রাফ, রিপোর্ট ইত্যাদি খুব সহজেই ছাপা যায়। টাইপ করা পাতাটি অফসেট পদ্ধতির সাহায্যে প্লেট করে ছাপা হয়।

ভ্যারি টাইপার, জাসটো রাইটার, আই বি এম সেলফ জাসটিফাইং অটোমেটিক টাইপ রাইটার প্রভৃতি নানান ধরনের টাইপ রাইটার আছে। বর্তমানে একটি উচ্চ গতিসম্পন্ন টাইপ রাইটারে মিনিটে ১৫০০ শব্দ ছাপা সম্ভব এবং বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ টাইপের সমন্বয়ে গঠিত টাইপ রাইটারও বাজারে বেরিয়েছে তবে কম্পিউটর আসায় টাইপ রাইটার বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

৩। **হ্যান্ড কম্পোজিং** (Hand Composing): হ্যান্ড কম্পোজিং অর্থাৎ হাতে একটি একটি করে টাইপ সাজানো প্রাচীনতম কম্পোজিং পদ্ধতি। কম্পোজিটরের সামনে কতকগুলি ডালা থাকে। প্রত্যেকটি ডালায় থাকে কতকগুলি করে খোপ। এই খোপের ভেতর অক্ষর। এক এক পয়েন্টের অক্ষরের জন্য গোটা ডালার বিন্যাসকে বলে ফন্ট। এক ফন্ট টাইপ মানে ওই টাইপের পুরো সেট। ইংরেজিতে ২৬টি অক্ষরের জন্য ক্যাপিটাল ও স্মল সমেত ১২১ থেকে ১৫৩টি অক্ষর নিয়ে একটি ফন্ট তৈরি হয়। উপরে ও নিচে দুটি মাত্র ডালা থাকে। তাদের বলে আপার কেস (Upper case), নিচের ডালাটি লোয়ার কেস (Lower case)। মোট খোপের সংখ্যা ১৫২। এখনও ভারতে অসংখ্য হ্যান্ড কম্পোজিং প্রেস এখনও চালু আছে। তবে এর দিন শেষ হয়ে আসছে।

৪। **লাইনো কম্পোজিং** (Lino Composing): লাইনো হল যান্ত্রিক কম্পোজিং পদ্ধতি। ১৮৮৬ সালে ওটমার মরগানথেলার (Otmar Mergentheler) এই পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি এখন বাতিল

হয়ে গেছে। ওটমার, বালিটমোরের এক কারখানায় মেকানিকের কাজ করতেন। ১৮৭৬ সালে একদল মুদ্রণ প্রযুক্তিবিদ তাঁকে অনুরোধ করেন কম্পোজিং-এর জন্য কোনও উন্নত যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় কি না সে ব্যাপারে তাঁদের সাহায্য করতে। তার আগে ১৮৬৭ সালে টাইপ রাইটার আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতিতে কম্পোজিং করা যায় কি না সে সম্পর্কেও তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে বলা হয়। অনেক পরীক্ষার পর ১৮৮৬ সালে ওটমারের ব্লোয়ার মেশিন প্রবর্তিত হয়। পরে এই মেশিনের নাম দেওয়া হয় লাইনো মেশিন।

লাইনো মেশিনে ও মোনো মেশিনে থাকে এক ধরনের গরম তরল ধাতু। সিসে, অ্যানটিমনি ও টিনের রাসায়নিক মিশ্রণ। বৈদ্যুতিক শক্তিতে ওই ধাতু গরম হয়। এই ধাতুকে বলে মেটাল শ্লাগ। সেই সঙ্গে যন্ত্রের ম্যাগাজিনের মধ্যে থাকে বিভিন্ন বর্ণমালার ছাঁচ বা ম্যাট্রিক্স। চাবি টেপামাত্র ওই বর্ণমালার ম্যাট্রিক্সটি ম্যাগাজিন থেকে বেরিয়ে আসে এবং লাইনারের উপর জমা হয়। এক একটি লাইন যেই শেষ হয় অমনি অপারেটর একটি হ্যান্ডেল টানেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই ম্যাট্রিক্সগুলি ঢালাই কলের দিকে সরে যায় আর উত্তপ্ত শিসে এসে পড়ে পুরো লাইনটি কম্পোজ হয়ে যায়। এই লাইনকে বলে 'শ্লাগ'। শ্লাগটিকে তখন সামনের মেশিনে ঢেলে দেওয়া হয়। ম্যাট্রিক্সের কাজ হয়ে গেলে তাকে আবার যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

লাইনো মেশিন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলি তা লুফে নেয়। সংবাদপত্রের ছাপাও ঝকঝকে হয়। দ্রুত কম্পোজ করা সম্ভব হয়। ইংলন্ডে 'দি টাইমস' সর্বপ্রথম লাইনো মেশিন বসান। নিউইয়র্ক ট্রিবিউন চিকাগো জার্নাল, ওয়াশিংটন পোস্ট, লাইনো টাইপ মেশিন ব্যবহার শুরু করে। ১৯৩৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা সর্বপ্রথম বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তন করে। লাইনো টাইপের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সময় আবিষ্কৃত হয় মোনোটাইপ (১৮৮০)। আমেরিকায় টলবারট ল্যারিস্টন (Tolbert Lariston) মোনোটাইপের আবিষ্কর্তা। মোনোটাইপে বর্ণমালার চাবি টেপামাত্র এক ধরনের কাগজের উপর ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি ছিদ্রই এক একটি বর্ণমালার প্রতীক। এরপর আর একটি যন্ত্র আছে সেখানে অক্ষর ঢালাই হয়। ফুটো করা কাগজ ওই ঢালাই যন্ত্রে দিলে অক্ষর ঢালাই হতে থাকে। লাইনো যেমন এক লাইন ধরে শ্লাগ হয়, মনো লাইন ধরে হয় না, হয় এক একটি করে।

লাইনো বা মোনো কম্পোজিং-এর সুবিধা ছিল—এতে হ্যান্ড কমপোজের চেয়ে দ্রুতগতিতে কম্পোজ করা যেত। লাইনো মেশিনে ঘণ্টায় এক হাজার শব্দ কম্পোজ হতো। ছাপা ঝকঝকে হয়। কারণ প্রতিবারই নতুন টাইপ বেরিয়ে আসত। তাছাড়া এই টাইপের শ্লাগগুলি খুব মজবুত হওয়ায় কয়েক লক্ষ কপি ছাপলেও টাইপ ভাঙত না। তবে লাইনো টাইপের সংশোধন সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া ছিল।

৫। ফোটো টাইপ সেটিং (PTS) থেকে ডিটিপি মুদ্রণশিল্পে আধুনিক কম্পোজিং পদ্ধতি হল ফোটো টাইপ সেটিং। এই পদ্ধতিতে গরম শিসা বা ধাতুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না। কতকগুলি ফোটো নেগেটিভ মেট্রিক্সের কাজ করে। ধাতু ঢালাই-এর বদলে ইলেকট্রনিক আলোকচিত্রের সাহায্যে ওই নেগেটিভের ফোটো উঠে যায় বিশেষ ধরনের কাগজের উপর। এই পদ্ধতিতে যেহেতু শিসা বা ধাতুর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকে না তাই একে বলে 'ঠান্ডা টাইপ'। ফোটো টাইপ সেটিং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৯১৫-১৯২০ সাল থেকে শুরু হয়। তবে ১৯৪৯ সালের আগে ফোটো কম্পোজিং যন্ত্র বার হয়নি। এখন এসেছে DTP বা ডেস্ক টপ

পাবলিশিং। এই প্রোগ্রাম থেকে পেজ মেক আপ হয়ে যাচ্ছে কমপিউটারে।

প্রথমদিকে ফোটো টাইপ সেটিং পদ্ধতিতে ছাপার অক্ষরগুলো ধাতুর হরফের বদলে ওইসব অক্ষরের নেগেটিভ ফোটো কম্পোজিং-এর ম্যাট্রিক্সের মতো কাজ করত। একটি ধাতু বা প্লাস্টিকের চাকতির মধ্যে নেগেটিভগুলি পর পর সাজানো থাকে। কী-বোর্ড টিপলেই চাকতিটি ঘুরে নির্দিষ্ট বর্ণমালাটির নেগেটিভ একটি আলোর সামনে আসে। আলোর পিছনে আছে একটি বিশেষ কাগজ। আলো ওই নেগেটিভের মধ্য দিয়ে কাগজে পড়লে অক্ষরটির একটি ফোটো ওই কাগজে উঠে যায়। আবার চাবি টিপলে অক্ষরটি সরে গিয়ে অন্য অক্ষর আলোর সামনে আসে। এখন সমস্ত পাতা কম্পোজ হয়ে গেলে কাগজটি বার করে এনে ডেভালপ করালেই একটি গোটা পৃষ্ঠার গ্যালি তৈরি হয়ে যায়। এবার লে আউট অনুসারে পৃষ্ঠাটি মেক-আপ করা হয়।

১৯৪৯ সালে দু'জন ফরাসি রেনে হিগোনেট ও লুই ময়রুড এই ফোটো কম্পোজিং যন্ত্রের জন্যে আমেরিকায় পেটেন্ট নেন। ১৯৫৩ সালে 'দি মারভেলাস ওয়ার্সড অফ ইনসেক্টস' নামে একটি বই সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিতে কম্পোজ করে। পরবর্তীকালে এই পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। যেমন আধুনিকতম কম্পিউটরে নেগেটিভ আর থাকে না। অক্ষরের ছবিকে ইলেকট্রন বীম দিয়ে স্ক্যান করা হয় এবং একটি ক্যাথডএর টিউবের পর্দায় সেগুলি আলোর অক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তা থেকে লেজার প্রিন্টারে প্রিন্ট আউট উঠে আসে। পুস্তক ম্যাগাজিন বা সংবাদপত্র মুদ্রণের কথা চিন্তা করে আধুনিক Software এসেছে PageMaker। এতে করে একটি খাতা কম্পোজ হয়ে যায় ও Printer এর সাহায্যে তার Print নেওয়া হয়।

নতুন কম্পিউটার মুদ্রণ পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা

সুবিধা: নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য নতুন ইলেকট্রনিক পদ্ধতি সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে।

১। মুদ্রণ পারিপাট্য: কম্পিউটর কম্পোজিং পদ্ধতির ফলে মুদ্রণশিল্পে যথেষ্ট পারিপাট্য এসেছে। এই পদ্ধতিতে টাইপ ফেসের যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। তাছাড়া সরাসরি টাইপের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলে এতে ছাপা ঝকঝকে হয়।

২। গতি: কম্পিউটর কম্পোজিং কম্পোজিং পদ্ধতিতে অবিশ্বাস্য গতিতে কম্পোজিং করা সম্ভব হচ্ছে। লাইনো কম্পোজিং-এ প্রতি ঘণ্টায় যেখানে সর্বোচ্চ ২০০ কলাম লাইন কম্পোজ করা যায়; সেখানে এই পদ্ধতিতে ঘণ্টায় অনেক বেশি শব্দ কম্পোজ করা সম্ভব। মাত্র ২০ মিনিটে একটি মোটামুটি দৈর্ঘ্যের পেপার ব্যাক কম্পোজ করা সম্ভব হয়েছে।

৩। স্থান সঙ্কুলান: আধুনিক যুগে যে কোনও বাণিজ্যিক এলাকায় প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বড় জায়গা পাওয়া মুশকিল। পাওয়া গেলেও তা ব্যয়বহুল। কম্পিউটার পদ্ধতিতে একটি ছাপাখানার জন্য অত্যন্ত কম জায়গা লাগে। এমনকি একটি ছোট সংবাদপত্রের জন্য একটি বড় ঘরের এক প্রান্তে একটি অফসেট প্রেস, একটি পিসি কম্পিউটর ইউনিট ও একটি সম্পাদকীয় দফতরের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব।

৪। স্বাস্থ্যসম্মত- কম্পিউটর কম্পোজিং পদ্ধতি লাইনো কম্পোজিং বা হ্যান্ড কম্পোজিং এর মতো স্বাস্থ্যহানির ভয় নেই। লাইনো কম্পোজিং-এ উত্তপ্ত শিসা নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহে ঢুকে গিয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। কিন্তু ফোটো কম্পোজিং-এ এমন কোনও আশঙ্কা নেই। কারণ এই পদ্ধতিতে কোনও ধাতুর সঙ্গে সম্পর্ক নেই।

৫। সস্তা: নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যয় কম পড়ে। কারণ এটি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি এবং কম লোক লাগে। তাছাড়া একই যন্ত্রে ফোটো ম্যাট্রিক্সের ডিস্ক বদলে বহু ভাষায় কম্পোজ হতে পারে। বর্তমানে সব দেশেই যে হারে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে তাতে উৎপাদন ব্যয় না কমালে মালিকের মুনাফা থাকে না। এই পদ্ধতিতে কম খরচে বেশি লাভের সম্ভাবনা থাকে।

৬। যন্ত্রাংশ সহজলভ্য- লাইনোটাইপ বা মোনোটাইপ ক্রমশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় উৎপাদকেরা আর ওইসব যন্ত্র তৈরি করছেন না। ফলে লাইনো বা মোনোর যন্ত্রাংশ পাওয়া কঠিন। কিন্তু কম্পিউটর এর যন্ত্রাংশ সহজ লভ্য।

৭। সংরক্ষণের সুবিধা- নতুন মুদ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে কম্পোজ করা ম্যাটার ফ্লপিতে বা কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এ করে দীর্ঘকাল রেখে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে নতুন সংস্করণের জন্য মুদ্রণ-ব্যয় সামান্যই পড়ছে। তাছাড়া নিত্য নতুন সংস্করণের জন্য বেশিদিন অপেক্ষাও করতে হচ্ছে না। সমস্ত কম্পোজ-করা ম্যাটার পেপারটেপ, ম্যাগনেটিক টেপ অথবা 'ফ্লপি ডিস্ক'বা কমপ্যাক্ট ডিস্ক-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে। এই পদ্ধতিতে একটি গ্রামোফোন রেকর্ডের সাইজের চেয়েও ছোট (disc)-এর মধ্যে কয়েক লক্ষ কম্পোজ-করা শব্দ দীর্ঘকাল ধরে রেখে দেওয়া সম্ভব।

৮। রঙিন ছবি ছাপার সুবিধা- নতুন কম্পিউটার টেকনোলজির সাহায্যে কালার ট্রান্সপারেন্সি কালার ফোটোগ্রাফ ও কালার ডিজাইন সহজেই ছাপা সম্ভব হচ্ছে। আলাদা ব্লক করার দরকার হচ্ছে না। পুরাতন পদ্ধতিতে বিভিন্ন Colour matching করা হত হাতে। একে বলা হয় retouching, এই retouching খুব ধরে ধরে করতে হত এবং এটি একটি সূক্ষ্ম কাজ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু এখন Electronic Colour Scanner-এর সাহায্যে অতিদ্রুত Colour transparencies ও Colour design-এর প্রতিচ্ছবি ছাপা সম্ভব হচ্ছে এবং তার গুণগত উৎকর্ষও অক্ষুণ্ণ রাখা হচ্ছে।

৯। কাজের আনন্দ ও সুন্দরতর পরিবেশ: কম্পিউটর যন্ত্র দেখতে সুন্দর ও ছিমছাম। যন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষেই যন্ত্রগুলি বসানো হয়। এর ফলে যে ঘরে এইসব যন্ত্র বসে, সেই ঘরের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর থাকে। লাইনো মেশিনের পরিবেশ ছিল কারখানার পরিবেশ। পরিবেশের এই পার্থক্যের ফলে ইলেকট্রনিক কম্পোজিং-এর কর্মীরা কাজে উৎসাহ পান। তুলনামূলকভাবে তাঁদের বেতনও বেশি হয়। শ্রমের এই মর্যাদা বৃদ্ধির ফলে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও এখন কম্পোজিটর হওয়াকে আর মর্যাদাহানিকর বলে মনে করেন না।

১০। প্রশিক্ষণে সুবিধা: হ্যান্ড কম্পোজিং ও লাইনোমোনো কম্পোজিং শেখা বেশ সময় সাধ্য ব্যাপার।

কিন্তু DTP composing অনেক কম সময় লাগে। এক মাসের মধ্যে DTP শেখা যায়।

১১। স্থান সঙ্কুলানে সুবিধা: ফোটোকম্পোজিং এর ফলে স্পেস বা জায়গা অনুসারে কপিকে ছোট বড় করে ধরানো যায় কিন্তু মেটাল কম্পোজিং-এ স্পেস অনুসারেই কপি কম্পোজ করতে হয়। নির্দিষ্ট স্পেসে কপি না ধরলে এখানে কপির অংশ কেটে উড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু ফোটো কম্পোজিং-এ শুধুমাত্র স্পেস-এর মাপ নিয়ে কপিকে ওই স্পেস অনুসারে ছোট করে ওই স্পেসে ধরানো যায়। তাছাড়া হ্যান্ড কম্পোজ বা লাইনো কম্পোজের তুলনায় এক পাতায় অনেক শব্দ ধরে।

১৩। ভার্নাকুলার মুদ্রণে সুবিধা: ভার্নাকুলার কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে ফোটো কম্পোজিং অত্যন্ত সুবিধাজনক। ভারতীয় ভাষাগুলিতে যেসব যুক্তাক্ষর থাকে সেগুলি লাইনোতে ঠিক গায়ে গায়ে লাগত না। কাজেই লাইনো বা মোনোতে যুক্তাক্ষর দেখতে ভাল হয় না। কিন্তু ফোটো-কম্পোজিং-এ কম্পিউটারকে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দেওয়া যায়। এর ফলে যত বর্ণমালা তত কী-বোর্ডের প্রয়োজনমতো লাগে না।

১৪। প্রতিলিপি দূরক্ষেপণ: ইলেকট্রনিক মুদ্রণ পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের ক্ষেত্রে আর একটি বিস্ময়ের সূচনা প্রতিলিপি দূরক্ষেপণ। যা FAX নামে পরিচিত। ১৯৬০ সালে ব্রিটিশ আবিষ্কৃত এই দূরক্ষেপণ ব্যবস্থাটি সংবাদপত্র প্রচারের ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনে। এর ফলে একই সংবাদপত্র দুই শহরে একই সময় প্রকাশিত হতে পারে এবং এজন্য খরচও কম পড়ে। কারণ শাখা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে বহু লোক নিয়োগের ব্যয়ভার বহন করতে হয় না। মূলকেন্দ্র থেকে প্রকাশিতব্য পত্রিকার তৈরি ম্যাটারই তাঁরা পেয়ে যান। শুধু স্থানীয় সংবাদের জন্য একটি দুটি পাতা আলাদা করে ছাপতে হয়।

নতুন মুদ্রণ পদ্ধতির অসুবিধা

১। বেকার বৃদ্ধিকারী: নতুন কম্পোজিং পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যেখানে বেকারের হার অত্যন্ত বেশি সেখানে এই পদ্ধতির প্রয়োগে বহু ব্যক্তির কর্মসম্ভাবনা নষ্ট হয়েছে।

২। উন্নত দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতা: এই পদ্ধতি গ্রহণ করলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এইসব কম্পিউটর যন্ত্র প্রস্তুতকারক দেশগুলির উপর যন্ত্রাংশের জন্য সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হবে। এমনকি যন্ত্রাংশ ছাড়াও বিশেষ ধরনের কাগজ ও ফিল্মের জন্যও অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তবে বহু দেশই এখন নিজস্ব প্রযুক্তিতে Computer তৈরি করছে।

৩। যন্ত্রনির্ভরতা সৃজনবিরোধী: নতুন পদ্ধতি গৃহীত হবার ফলে ক্রমশ সাংবাদিকেরাও কম্পিউটরমুখী হয়ে পরেছেন। এখনকার দিনে কম্পিউটরে কোনও ঘটনার বিবরণ মুখে মুখে বলে গেলেই চলবে। আর লেখার দরকার হবে না। ওই ইলেকট্রনিক রেকর্ডার কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়ে দিলে মুখের কথায় কম্পোজ হয়ে যাবে। এর ফলে সাংবাদিকেরা ক্রমশ যন্ত্রদাসে পরিণত হবেন। তাঁদের নিজের হাতের লেখার অভ্যাস নষ্ট হয়ে যাবে।

৩.৫. বাংলা মুদ্রণের সেকাল ও একাল

মুদ্রণ প্রক্রিয়ার স্পষ্টতই দুটি প্রধান ভাগ। একটি হল মুদ্রণ যন্ত্রের প্রযুক্তিগত কাঠামোর বিন্যাস অন্যটি হল যন্ত্রে ছাপা হওয়ার আগে কম্পোজিং বা হরফের সেটিং। প্রথমটি অর্থাৎ মুদ্রণ যন্ত্রে কিভাবে কাগজ আর কালির সন্নিবেশে ছাপা সম্পন্ন হয়, সেই বিষয়টির আগে আমরা চলে যাব একটু দ্বিতীয় বিষয়টিতে। অর্থাৎ হরফ সেটিং বা কম্পোজিং-এর বিন্যাসে। লেটার প্রেসের যুগে এই হরফ সেটিং বা কম্পোজিং বিষয়টি ছিল একটি বিরাট কর্মকাণ্ডের ব্যাপার।

কম্পোজিং সম্পন্ন হয় বিভিন্ন ধরনের হরফ বা টাইপের সেটিং-এর মধ্য দিয়ে। প্রত্যেকটি হরফ বা টাইপ থাকে খোপ কাটা কাটা কাঠের বাক্সে। এই কাঠের বাক্সটিকে মুদ্রণ শিল্পের পরিভাষায় 'কেস' বলে। এই কেসের সামনে বসে কম্পোজিটর টাইপ গেঁথে গেঁথে বই-এর এক একটি পাতার বর্ণবিন্যাস, বাক্যবিন্যাস সম্পন্ন করেন। এই প্রক্রিয়ায় আপার ও লোয়ার দু-ধরনের কেস রয়েছে। লোয়ার কেসে ৫৩টি ছোট বড় নানা মাপের খাপে ইংরেজির স্মল লেটার এর টাইপগুলি থাকে বলে এটি কম্পোজিটরের হাতের কাছে অর্থাৎ আপার কেসের নীচে থাকে। ৯৮টি খোপযুক্ত আপার কেস থাকে লোয়ার কেসের উপরের দিকে একটু হেলানো ভাবে। আপার কেসের প্রকোষ্ঠ বা খোপগুলি কিন্তু প্রত্যেকেই আকৃতিতে সমান। তাহলে আপার ও লোয়ার কেসে একই ফন্ট-এর টাইপ সাজানো থাকত। এই দুটি কেস ছাড়াও ছিল অন্যধরনের কিছু কেস। যেগুলিতে আলাদারকমের কিছু টাইপ থাকত। অন্যধরনের এই টাইপগুলির ছিল আলাদা আলাদা নাম। যেমন- ডিপথং, লিগেচার, ফিগার ফ্রাকসন ও পয়েন্ট। আপার কেস ও লোয়ার কেসের সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্য দুটি টাইপকে একসাথে একটি টাইপ করে তৈরি করা হত কিছু হরফ। এগুলির মুদ্রণ শিল্পের পারিভাষিক নাম ছিল ডিপথং। লিগেচার হল পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ দুটি 'করণ'যুক্ত টাইপ। অর্থাৎ দুটি ইটালিক টাইপ একসাথে তৈরি করলে যেমন দেখায় তেমন। নিউমেরিক্যাল, আরবিক বা রোমান সংখ্যার টাইপ হল 'ফিগার' আর 'ফ্রাকসন' হল ভগ্নাংশ। এই ভগ্নাংশের আবার দুধরনের টাইপের মাপ ছিল। কোনো একটি ভগ্নাংশের দ্বিগুণ মাপের ভগ্নাংশের জন্য আলাদা টাইপ ব্যবহার করা হত। অর্থাৎ ভগ্নাংশের হরফের ক্ষেত্রে মাপ ছিল দুরকমের— এক সংখ্যার ভগ্নাংশ আর দুই সংখ্যার ভগ্নাংশ। এছাড়াও ছিল যতি চিহ্নের জন্য আলাদা হরফ যাকে বলা হত পয়েন্ট।

বাংলা কম্পোজিং-এর ক্ষেত্রে লেটার প্রেসের যুগে কম্পোজিটারকে এই চাররকম কেস নিয়ে কাজ করতে হত। চারটি কেসের তিনটি হল আপার কেস আর একটি লোয়ার কেস। তিনটি আপার কেস কম্পোজিটরের সামনে বাঁদিক ও ডানদিকে থাকত আর লোয়ার কেসে অর্থাৎ হাতের কাছে থাকত বেশি ব্যবহৃত হরফ। যুক্তাক্ষর কিংবা অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত হরফগুলি থাকত আপার কেসে। কম্পোজিটরকে হরফ সেটিং-এর আগে কি মাপের বই হবে সেই মাপের কাগজের ধরন ও কত পৃষ্ঠার বই হবে তার একটা আন্দাজ করে নিতে হত। তারপর পিতলের তৈরি কম্পোজিং স্টিক-এ আপার কেস, লোয়ার কেস থেকে টাইপ বেছে রাখা হত। টাইপগুলি এমনভাবে কেসে সাজানো থাকত যে কম্পোজিটারের তা বেছে নিতে সময় লাগত না। ডান

হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে টাইপ তুলে নিয়ে স্টিকের উপর তারা সাজিয়ে রাখত। একটি কম্পোজিং স্টিকে বেশ কয়েক সারি হরফ সেটিং করা যেত। মাপ অনুযায়ী স্টিকের হরফ সেট করার সময় হরফের খাজগুলি উপরের দিকে থাকায় ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকত। দুটি অক্ষর বা শব্দের মাঝে স্পেসটি নির্দিষ্ট করা হত ছোট ছোট সীসার টুকরো দিয়ে। যার উচ্চতা কখনই হরফের সমান উচ্চতা হত না। সেটিং-এর সময় স্পেসের জায়গায় হরফের চেয়ে দৈর্ঘে ছোটো ওই সীসার টুকরোগুলো সেট করা হত তাতে কালির ছাপ পড়ত না অথচ ফাঁক তৈরি হয়ে যেত। স্পেসের মাপ এক রেখে দু'পাশের মার্জিন সমান অর্থাৎ জাস্টিফাই করে নেওয়া হত। দুই লাইনের মাঝে ফাঁক বজায় রাখতে ব্যবহার করা হত 'লেড' বা সিসার পাত। আর প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদের আগেও শেষে ফাঁক রাখার জন্য দেওয়া হত 'কোয়াড'। যা স্পেসের চেয়ে অনেকটাই চওড়া হত। কোনো অধ্যায় শুরু বা শেষ হলে পৃষ্ঠার উপরে অথবা নীচে যে ফাঁকা জায়গা রাখা হয় সেটিকে মেনটেন করা হত ধাতুর তৈরি একধরনের ফাঁপা জিনিস দিয়ে যার নাম 'কোটেশন'। কম্পোজিং এর সময় ভুল টাইপ এসে পড়লে তাকে তুলে ফেলার জন্য কম্পোজিটার একটি লম্বা সূঁচ-এর মতো জিনিস ব্যবহার করতেন যার নাম 'বডকিন'।

কম্পোজিং স্টিকে টাইপ, স্পেস দিয়ে একের পর এক লাইন গেঁথে তোলেন কম্পোজিটর। এই স্টিক যখন সম্পূর্ণ গাথা হয়ে যায় তখন একটা বড় পাত্রে টাইপগুলি একত্র করা হয়। এই বড় পাত্র অর্থাৎ 'গ্যালি'তে একসাথে তিন পৃষ্ঠা মত টাইপ, রেডি করা যায়। প্রুফ সংশোধনের জন্য ছাপার কাজটি এই গ্যালি প্রুফ থেকেই সম্পন্ন হয়। যেখানে অনায়াসে প্রুফ সংশোধনের কাজটি করা যায়। ম্যাটার এডিটিং-এর কাজটিও এই গ্যালি প্রুফ থেকে করা যায়। গ্যালি থেকে তৈরি হওয়া টাইপের সেটিং-এর পর নিয়ে যাওয়া হত 'ইম্পোজিং স্টোনে'। একটা মসৃণ ইস্পাতের তৈরি টেবিল হল মুদ্রণ শিল্পের পরিভাষায় ইম্পোজিং স্টোন। এখানে এমনভাবে একফর্মা অর্থাৎ ষোলো পাতা মাপের কম্পোজিশন সাজানো হত যে কাগজ ও কালির সন্নিবেশে ছাপা সম্পন্ন হওয়ার পর এক-একটি ব্রড সাইড কাগজ অক্টেভো ভাজে মুড়ে দিলে প্রত্যেকটি পাতা পরপর সাজানো হয়ে যেত। এক ইম্পোজিং স্টোনে বইয়ের পৃষ্ঠা সাজানোর বিশেষ কিছু নিয়ম আছে। কাগজের ভাঁজ কেমন হবে তা হল এই বিশেষ নিয়মের একটি এই পদ্ধতিতে সাজানোর কাজটি হল ইম্পোজিশন। এরপর বইয়ের পাতা অনুযায়ী টাইপগুলির ইম্পোজিশন সম্পূর্ণ হলে টাইপগুলিকে লোহার ফ্রেম দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এই লোহার ফ্রেমগুলিকে বলে 'চেজ'। কিন্তু সম্পূর্ণ ইম্পোজিশন যাতে নড়ে না যায় তাই 'চেজে'র চারদিকের ফাঁক ভরাট করার প্রয়োজন থাকেই। আর সেই প্রয়োজন মেটে এক ধরনের কাঠের পাটা বসিয়ে। যার পারিভাষিক নাম 'ফারনিচার'। 'ফারনিচার' বসানোর পরেও সম্পূর্ণ চেজকে শক্ত করে আটকে রাখার জন্য এক জোড়া গজালের মত দেখতে পেতল বা ইস্পাতের তৈরি 'কয়েন' বসানো হয় চেজের চারপাশে। এই 'কয়েন' বসানোর পরেই চেজের ভিতরে থাকে সমস্ত টাইপ গাথা ইম্পোজিশন একেবারে স্টিল হয়ে যায়। কয়েনের চাপে সেগুলি আর আলগা থাকে না। এইভাবে এক-একটি কমপ্লিট চেজ তৈরির পরে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হয় ছাপার মেশিনে। মুদ্রণ যন্ত্রের মেশিনের যে টাইপ বেড সেখানে সেটি স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয়। এতক্ষণ আমরা বই ছাপার আগে ষোল পৃষ্ঠা করে প্রত্যেকটি ফর্মা কীভাবে কম্পোজ করা হয় সেটি দেখলাম। এখন যে প্রক্রিয়ায় ছাপা

মেশিনে কাগজ আর কালির মিলিত সমন্বয়ে বই-এর পৃষ্ঠাগুলি ছেপে বেরিয়ে আসে সেই প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা দেখে নেব।

ছাপাখানা বা মুদ্রণের স্পষ্টতই দুটি ভাগ। একটি কম্পোজিং সেকশন যেখানকার বিরাট কর্মকাণ্ডের কথা আমরা আগেই দেখলাম। অন্যটি হল ছাপা বা প্রিন্টিং সেকশন। কম্পোজিং সেকশন টাইপ গাঁথার কাজ সম্পূর্ণ হলে সেটিকে স্থানান্তর করা হয় প্রিন্টিং সেকশনে। প্রিন্টিং সেকশনের মুদ্রণযন্ত্র দুধরনের হয়। একটি হ্যান্ড প্রেস অর্থাৎ হাতে চালানো মেশিন অন্যটি মেশিন প্রেস অর্থাৎ যন্ত্রচালিত প্রেস।

মুদ্রণ শিল্পীর প্রথম যুগের মেশিন ছিল হ্যান্ড প্রেস। লোহার টেবিলের মতো দেখতে এই যন্ত্রটির একটি অংশ থাকে 'বেড' বা 'কফিন' বলা হয়। সেখানে কম্পোজ করা এক ফর্মার ইম্পোজিশনকে স্ক্রু দিয়ে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয় এবং তার ওপর কালি লাগানো হয়। এরপর কালি লাগানো ইম্পোজিশনের উপরে কাগজ রাখা হয়। ইম্পোজিশন যে বেডে রাখা হয় ঠিক তার উপরেই আছে বেডের সমান মাপের একটি চারকোনা লোহার পাত। এটির পারিভাষিক নাম প্ল্যাটেন। একটি লোহার হাতল লাগানো থাকে এই প্ল্যাটেনের সঙ্গে; যেটি হাত দিয়ে টানলে প্ল্যাটেন নিচে নেমে এসে কাগজের ওপর প্রেসার সৃষ্টি করে এবং সেই প্রেসারের ফলস্বরূপ কাগজে ছাপ উঠতে থাকে। প্ল্যাটেন-এর হাতলটি আলগা করলে পুনরায় সেটি আগের অবস্থায় ফিরে যায় অর্থাৎ কাগজের উপরে উঠে যায়।

তবে এই পদ্ধতিটি যত সহজে বর্ণনা করা হল বিষয়টি কার্যকর করা এতটা সহজ নয়। কারণ কাগজের মতো পাতলা একটি পদার্থের উপরে ধাতব প্ল্যাটেন নেমে এসে বিপরীতদিকের ধাতব কম্পোজিশন-এর ছাপ তোলার সময় সেটি স্বাভাবিকভাবেই ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে মুদ্রণ যন্ত্রটির আভ্যন্তরীণ গঠনে থাকে আরও কিছু আয়োজন। অর্থাৎ কাগজকে কখনই সরাসরি ধাতব প্লেটের উপর বসানো হয় না। কাগজ রাখা হয় লোহার পাত দিয়ে তৈরি একটি ট্রের উপরে। লোহার পাত মোড়া এই ট্রেটির নাম 'টিমপ্যান'। 'টিমপ্যান' নানা ধরনের স্ক্রু-কব্জা দিয়ে আটকানো থাকে একটি ফ্রেমের সঙ্গে যার নাম 'ফ্রিসকেট'। এই ফ্রিসকেটের কাজ কাগজের ছাপা অংশের বাইরে যে সাদা অংশটি থাকে তাকে অবাঞ্ছিত কালির সংসর্গ থেকে বাঁচানো।

এবার পুরো প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হয় সেটি দেখে নেব— প্রথমে টিমপ্যানের উপরে কাগজ রেখে তার উপর ফ্রিসকেট লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে শুধুমাত্র যে অংশটিতে ছাপা হবে তার বাইরে কালি ছড়িয়ে পড়বে না। ফ্রিসকেটে আটকানো কাগজ নিয়ে টিমপ্যান ফর্মার উপরে আসে তখন হাতলের চাপে প্ল্যাটেন চাপ দেয় নিচে কালি লাগানো ফর্মার উপরে থাকা কাগজে। ফলে নির্ভুল ঝকঝকে ছাপা হয়ে যায় কাগজের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই। হ্যান্ডপ্রেস সিস্টেমের এই প্রেস বহু বছর পর্যন্ত ছাপার জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তবে মেশিন প্রেস বা যন্ত্রচালিত প্রেসের সিস্টেমটিও এবার জেনে নেওয়া দরকার। হ্যান্ডপ্রেসে হাতলের সাহায্যে ফর্মা ও কাগজকে প্ল্যাটেন যা দিয়ে প্রেসার দেওয়া হয় তার নীচে আনা হত। মেশিন প্রেসে এই হাতলের ব্যবহার উঠে গেল। তার বদলে এল চাকা। এই চাকা দুইভাবে কাজ করতে পারে। একটি হল ম্যানুয়াল অন্যটি বৈদ্যুতিক শক্তির মাধ্যমে। প্ল্যাটেনযুক্ত এই মেশিনই বেশিরভাগ প্রেসে কাজ করে। তবে

আরও একধরনের সিলিন্ডারযুক্ত প্রেস রয়েছে যেগুলির কাজ প্ল্যাটেন প্রেসের তুলনায় আরো দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। এই মেশিনে ঘন্টায় দু-হাজার কপি ছাপানো যায়।

লেটার প্রেসের যুগে আরেকটি প্রেসেরও সন্ধান আমরা পেয়েছি সেটি হল রোটারি প্রেস। এই রোটারি প্রেস সিলিন্ডার প্রেসের থেকেও অনেক বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন। খবরের কাগজগুলি এই প্রেসে ছাপানো হয়। ঘণ্টায় ৬০,০০০ কপি ছাপা যায় এই মেশিনে। সময়ের সাথে সাথে যুগ এগোয়, এগোয় তার প্রযুক্তি। লেটার প্রেসের যুগেই তাই মুদ্রণ শিল্প থেমে থাকলো না। হাতে করে হরফ সাজানো বা কম্পোজিং-এর বিশাল কর্মকাণ্ডও একসময় থেমে গেল গতির যুগে। চলে এল যন্ত্রে টাইপ সেটিং-এর বিচিত্র কার্যপ্রণালী। বিভিন্ন নাম সেসব মেশিনের কর্মপ্রণালীও আলাদা। লাইনো টাইপ, মনোটাইপ, স্টিরিও টাইপ, ইলেক্ট্রোটাইপ প্রভৃতি যান্ত্রিক উপায়ে তৈরি কম্পোজিশনের অনেক স্তর পেরিয়ে আমরা অবশেষে এসে পৌঁছেছি ফটোকম্পোজিং এবং অফসেট লিথোগ্রাফিতে।

এই ফটো কম্পোজিং-এ টাইপ হরফ সাজানোর কাজটি সম্পন্ন হয় ফটোগ্রাফির মাধ্যমে। এই কাজটির জন্য উপযুক্ত মেশিন অনেকটা মনোটাইপ মেশিনেরই মত। শুধু মনোটাইপ মেশিনে যে পদ্ধতিতে সীসার হরফের মাধ্যমে ঢালাই করে কম্পোজ করা হত সেই জায়গাটি জুড়ে এখানে থাকে এক ধরনের ফটোগ্রাফিক প্লেট। কাজেই কোনো ধাতব হরফের মাধ্যমে কম্পোজিশন নয় এক্ষেত্রে কম্পোজ করা হয় হরফের ফটো দিয়ে। এই ফটো কম্পোজিং সম্পন্ন হলে যে পদ্ধতিতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ছাপার কাজ সম্পন্ন হয় সেই পদ্ধতিটি হল অফসেট লিথোগ্রাফি। এই ব্যবস্থায় একটি ধাতব পাতের উপরে ফটোগ্রাফিক ক্যামিক্যাল জিলাটিনের একটা আচ্ছাদন ফেলা হয়। এরপর টাইপের ফটো অর্থাৎ নেগেটিভের মধ্যে আলো প্রবেশ করানো হয়। এই আলো প্রবেশ করানোর সময় নেগেটিভের পরে লিথোগ্রাফ রাখা হয়। লিথোগ্রাফের ভিতর দিয়ে আলো নেগেটিভের মধ্যে থাকা টাইপের আকারগুলি জিলেটিন দ্বারা আবৃত আশে শক্ত হয়ে ফুটে থাকতে সাহায্য করে তার উপর কালি ফেললে সেই ছাপ কাগজে উঠে আসে।

ছাপার জগতে আরো একটি পরিচিত প্রক্রিয়া হল জেরোগ্রাফি বা জেরক্স অফসেট। এই পদ্ধতির মুদ্রণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এখানে যে কালি ব্যবহার করা হয় সেটি শুষ্ক। জেরোগ্রাফি কথাটির অর্থও তাই শুস্ক মুদ্রণ। খুব কম সময়ের মধ্যেই এই পদ্ধতিতে মুদ্রণের কাজটি সম্পন্ন হয়। অফসেট লিথোগ্রাফির মতো এক্ষেত্রেও যে বিষয়টি ছাপতে হবে তার একটি নেগেটিভ তুলে নিতে হয়। এরপর ধাতু নয় এমন একটি প্লেটকে পজিটিভ এনার্জির মধ্যে রেখে দেওয়া হয় সেই প্লেটটির উপর ফটো নেগেটিভের ভিতর দিয়ে আলো প্রবাহিত করলে ছাপার বিষয়টি অধাতুর প্লেটে প্রতিলিপি হয়ে রূপায়িত হয়। এরপর নেগেটিভ তড়িৎ দ্বারা আবৃত এক ধরনের প্রিন্টিং পাউডার মূলের প্রতিলিপি ধরা আছে যে অধাতব প্লেটে তার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয় একটা আস্তরণ হিসাবে। এক্ষেত্রে বলা দরকার এই পাউডার কিন্তু একমাত্র পজিটিভ তড়িৎ দ্বারা আবৃত অংশেই আটকে থাকবে। ফলে ছাপার বিষয়টি প্লেটে ফুটে উঠবে কালো হয়ে। এরপর কাগজ ফেলতে প্লেটের উপরে এবং পজিটিভ তড়িতের আকর্ষণে প্রিন্টিং পাউডার কাগজে কয়েক সেকেন্ডের আলোর সংস্পর্শে থাকলেই ছাপার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায়।

এরপর আমরা চলে আসব ছাপার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কালির প্রকৃতি বিষয়ে। মুদ্রণযোগ্য কালি সবসময় খুব ঘন আর চটচটে হয়। হ্যান্ড প্রেসের যুগে হাত দিয়েই ছাপার মেশিনের রুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টাইপ সেটিং -এর উপর কালি লাগানো হত। মেশিন প্রেসে ছাপার যে রোলার সেটি যন্ত্রের সাহায্যে ঘোরে। আর উপর থেকে কালি ফেলা হয়। গ্লিসারিন শিরীষ প্রভৃতি অন্য আরও নানা ধরনের জিনিস দিয়ে তৈরি এই কালি রোলারের মাধ্যমে হরফ সেটিং বা প্লেটের উপরে সূক্ষ্ম আস্তরনের মতো লেগে থাকে এবং এর মাধ্যমেই কাগজ ছাপা সম্পূর্ণ হয়।

৩.৬. আদর্শ প্রশ্নাবলী

অতি-সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশন কে কত খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন?

২) গতিশীল বা মুভেবল্ টাইপ কে কত খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কার করেন?

৩) হালহেডের বাংলা ব্যাকরণ কত খ্রিস্টাব্দে মুদ্রিত হয়? এই গ্রন্থের মুদ্রাকর কে ছিলেন?

৪) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে স্থাপিত হয়?

৫) ১২২১ খ্রিস্টাব্দে কোন দেশে সর্বপ্রথম বিচ্ছিন্ন কাঠের টাইপ সাজিয়ে বই ছাপানো শুরু হয়?

৬) গুটেনবার্গ ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কোন বই ছাপেন?

৭) 'The Printing Press in India' বইটি কার লেখা?

৮) মাদ্রাজের পর আর কোন শহরে ছাপাখানার বিস্তার ঘটেছিল?

৯) লিথোগ্রাফি পদ্ধতি কে আবিষ্কার করেন?

১০) মোনোটাইপের আবিষ্কর্তা কে?

১১) লাইনো কম্পোজিং (Lino Composing) পদ্ধতি কে কত সালে আবিষ্কার করেন?

১২) 'বডকিন' বলতে কি বোঝায়?

১৩) কম্পিউটার চালিত DTP আসার আগে যে যে পদ্ধতিগুলি প্রচলিত ছিল তাদের নাম উল্লেখ করুন।

১৪) শ্লাগ কী?

১৫) ঠাণ্ডা টাইপ বলতে কী বোঝায়?

১৬) দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম সংবাদপত্রটির নাম কী?

১৭) কোন প্রেস 'বাবুরামের প্রেস' নামে পরিচিত ছিল?

১৮) বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানার নাম লিখুন।

১৯) কম্পোজিং বলতে কী বোঝায়?

২০) DTP এর পুরো কথাটি লিখুন।

২২) মুদ্রণ যন্ত্রের জনক কাকে বলা হয়?

২৩) চিন দেশে প্রথম কে কাগজ আবিষ্কার করেন?

২৪) সর্বপ্রথম গতিশীল টাইপ কে, কত খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন?

২৫) গুটেনবার্গের বাইবেল প্রথম কত খ্রিষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়?

২৬) বাংলার প্রথম ছাপাখানাটির নাম কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১) টীকা রচনা করুন— জেরোগ্রাফি বা জেরক্স অফসেট, লেটার প্রেস, লাইনো কম্পোজিং।

২) মুদ্রণ ও ছাপাখানার ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

৩) মুদ্রণব্যবস্থার দু'টি প্রধান অংশ কি কি? সেই দু'টি অংশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৪) "বাংলা মুদ্রণের সেকাল ও একাল" এ বিষয়ে একটি তুলনামূলক প্রবন্ধ রচনা করুন।

৫) লিথো অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

৬) মুদ্রণযন্ত্র আবির্ভাবের প্রাথমিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭) ছাপাখানা বা মুদ্রণ যন্ত্রে কীভাবে প্রিন্টিং করা হয়?

বিস্তারিত প্রশ্ন:

১) বাংলা ছাপাখানার অগ্রগতিতে উইলিয়াম কেরীর অবদান সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করুন।

২) বাংলা ছাপাখানায় নতুন কম্পিউটার মুদ্রণ পদ্ধতির সুবিধা এবং অসুবিধার দিকগুলি সম্পর্কে আপনার ভাবনা ব্যক্ত করুন।

৩) কম্পিউটার DTP প্রযুক্তি আসার আগে কোন কোন পদ্ধতিতে কম্পোজ করা হত? এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩.৭. সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) আশিস খাস্তগীর, 'উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা', সোপান, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

২) গীতিকা চক্রবর্তী, 'আজকের মুদ্রণশিল্প', গ্রন্থাগার (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র), সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা, কলকাতা, ১৯৯৩।

৩) গোলাম মুরশিদ, 'বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৪) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গ-প্রসঙ্গ', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০।

৫) চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'দুই শতকের বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮১।

৬) ছন্দা রায় ও সনৎকুমার নস্কর (সম্পা.), 'গণমাধ্যম ও বাংলা সাহিত্য', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪।

৭) দীপঙ্কর সেন, 'মুদ্রণচর্চা', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০।

৮) জয়ন্ত চক্রবর্তী, 'ব্রাহ্মী থেকে বাংলা', সঞ্চয়ন প্রকাশনী, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯।

৯) শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৬।

১০) স্বপন চক্রবর্তী (সম্পা.), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', অবভাস, কলকাতা, ২০০০।

১১) সুবীর মণ্ডল, 'বাংলা লিপির উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।

১২) সুস্নাত চৌধুরী, 'পুস্তানি পেরিয়ে', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০২৪।

মডিউল- ২

বাংলার বানান

একক ৪ : বানান সংস্কারের ইতিহাস

৪.১. উদ্দেশ্য
৪.২. প্রস্তাবনা
৪.৩. বানান কী
৪.৪. বানান ও বর্ণমালা
৪.৫. বাংলা বানান সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টা
৪.৬. বাংলা বানানের বিবর্তন সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা
৪.৭. বানান সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
৪.৮. বানান সংস্কার: চিন্তা-প্রবণতা
৪.৯. অনুশীলনী

৪.১ উদ্দেশ্য

মুখের কথাকে বা ধ্বনিকে স্থায়ী করার চেষ্টা থেকেই বর্ণ ও বর্ণমালার ব্যবস্থার উদ্ভব। আর অস্থায়ী ধ্বনির স্থায়ী বর্ণন বা বর্ণায়ন থেকেই 'বানান' কথাটির উদ্ভব, পণ্ডিতেরা এমন কথাই বলেন। কিন্তু ধ্বনির বর্ণন বা বর্ণায়ন খুব সহজ ব্যাপার নয়। এতে নানা দিক থেকে নানা সমস্যা আছে। অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলা ভাষাও অনেক দিন ধরে লেখা হয়ে আসছে। তাই বর্ণায়নের প্রায় সব কয়টি সমস্যাই বাংলা ভাষার লিখিত অনুশীলনের ক্ষেত্রে দেখা দেয়। সংক্ষেপে এটাই হল বাংলা ভাষার বানান সমস্যার স্বরূপ। বাংলা বানান সমস্যা নিয়ে অনেকেই অনেকদিন ধরে লিখে আসছেন। বিভিন্ন সময়ে এই আলোচনাগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, বানানের ব্যাপারে আমরা কতটা এগিয়েছি এবং কোথায় আমরা আটকে রয়েছি। তাই ভাষার লিখিত অনুশীলনের মানোন্নয়নের জন্য বানান সংস্কার তথা বানান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার একটা কালানুক্রমিক মূল্যায়ন খুব জরুরি। মূলত এই উদ্দেশ্যেই এই এককটির পরিকল্পনা। এই একককের অন্তর্গত একাধিক উপএককে আপনা বানানের সংজ্ঞা সহ বানান সমস্যার স্বরূপ ও সেই সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব সেবিষয়েও ধারণা লাভ করতে পারবেন। বাংলা বানান সংস্কারের একটি নিজস্ব ইতিহাস রয়েছে। যেখানে বানান বিশারদদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সেই চিন্তাভাবনাও এই এককে আলোচিত হয়েছে।

৪.২. প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের জন্মের সাথে সাথেই বাংলা বানান বিষয়ক চিন্তাভাবনার সূত্রপাত

ঘটে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেও বাংলা বানান নিয়ে চিন্তার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের মূল উদ্যোগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সমিতি গঠন করে। কিন্তু তৎকালীন জনসাধারণ বানান কমিটির সংস্কার বা সুপারিশ মানতে রাজী হন নি। ফলে সংস্কারকগণ চাপে পড়ে সংশোধন করলেন 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা। কিন্তু তারপরও নিয়ম মানতে রাজী হননি সেকালের অনেক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, কবি, ভাষাবিদ। তুমুল হৈ চৈ বেঁধে গিয়েছিলেন বানান সংস্কারকে কেন্দ্র করে। শেষ পর্যন্ত সরকারি শিক্ষা বিভাগ আর বিশ্ববিদ্যালয় নতুন বানানের বাধ্যতা মূলক অনুসরণের আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ১৯৭৮ সালে আবার গঠিত হয় বানান কমিটি। দেবপ্রসাদ ঘোষ, মনীন্দ্রকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র মজুমদার বারবার বানান নিয়ে মনোযোগী গবেষণার দ্বারা বানান সংস্কার ক'রে সমতাবিধান আনতে চেয়েছেন। সর্বশেষ গত শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ভাষাবিজ্ঞানী ড. পবিত্র সরকারের তত্ত্বাবধানে সম্মানিত সদস্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কবি শঙ্খ ঘোষ, এবং অমিতাভ চৌধুরি জ্যোতিভূষণ চাকি, নির্মল দাস, বিজিতকুমার দত্ত, সুভাষ ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায় প্রমুখের মিলিত প্রয়াসে বানান সংস্কারের কাজ করে। বাংলা বানান নির্মাণে অনেক গ্রহণ বর্জন পরিমার্জন সাধিত হয়। এই নতুন বানানবিধি 'আকাদেমি বানানবিধি' নামে পরিচিত এবং সমস্ত সরকারি কাজকর্মে, পাঠ্যপুস্তক নির্মাণে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যমান্য।

৪.৩. বানান কী

'বানান' কথাটা এসেছে সংস্কৃত 'বর্ণন' কথাটা থেকে। বর্ণন-এর একটা মানে হল বর্ণনা করা, বিবরণ দেওয়া, সাজিয়ে বলা। আর-একটা মানে হল 'বানান' করা। অর্থাৎ ঠিক জায়গায় ঠিক বর্ণটা বসানো। এবার প্রশ্ন হল, 'বর্ণ' কী? বর্ণ কথাটার একটা অর্থ হল 'রঙ', আর-একটা অর্থ হল বর্ণমালার অক্ষরগুলো-যেমন অআইঈ, কখচ ছ ইত্যাদি। কিন্তু আপনারা জানেন, শুধু এগুলো বর্ণমালার বর্ণ হিসেবে সাজানো থাকলেও এগুলোর নানা চেহারা আছে। আ-এর যেমন একটা ভিন্ন চেহারা হল আ-কার। হ্রস্ব-ই কারের আর-একটা চিহ্ন আছে। এই রকম আলাদা চিহ্ন আছে য-এর-যেটাকে আমরা য-ফলা বলি। বর্ণমালা শেখার পরে তোমাদের সেই চিহ্নগুলোকেও শিখে নিতে হয়। এই সব বর্ণ আর তার চিহ্নকে ঠিক ঠিক জায়গায় বসানোর নামই বানান। কীসের বানান, না শব্দের বানান। শব্দ কী, না এমন এক-একটা ছোটো ছোটো আস্ত কথা, যেগুলোর অর্থ আছে। 'আমি' একটা শব্দ, 'ভাত' একটা শব্দ, 'খাই' একটা শব্দ। আমরা কথা বলি শব্দের সঙ্গে শব্দ জুড়ে। এই সব শব্দের ঠিক ঠিক বানানই আমাদের শিখতে হয়, লিখতে হয়। ধরুন, 'প্রণাম' কথাটা। তাতে প্রথমে 'প-এ র-ফলা (র-এর আর-একটা চেহারা) লাগাতে হবে, তার পরে মূর্ধন্য ণ-এ আ-কার দিতে হবে, তার পরে 'ম' লিখতে হবে। প-এ র-ফলার জায়গায় রেফ (র-এর আর-একটা চেহারা) দিলে চলবে না। মূর্ধন্য ণ-এর জায়গায় দন্ত্য-ন হলেও হবে না। শেষে 'ম' তো বসাতেই হবে। ঠিক জায়গায় ঠিক বর্ণ বা তার চিহ্ন বসানোর

নামই বানান লেখা, ঠিকটা না বসালেই বানান-ভুল হবে। যে ঠিকঠাক লিখতে শেখে, সে ঠিকঠাক বানানও লিখতে শেখে। ঠিকঠাক বানান লেখা 'শিক্ষিত' হওয়ার একটা লক্ষণ। তাই বানানের মূল কথা হল 'লেখার মধ্যে ঠিক জায়গায় ঠিক চিহ্ন'। চিহ্ন মানে 'বর্ণ', 'কার' (স্বরবর্ণের চিহ্ন), ফলা (ব্যঞ্জনবর্ণের চিহ্ন)। এ ছাড়াও আছে যতিচিহ্ন, সংখ্যা, , = ইত্যাদি নানা গণিতের চিহ্ন। শেষেরগুলো সোজাসুজি বানানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

৪.৪. বানান ও বর্ণমালা

আমরা বাক্য নির্মাণ করে মনের ভাব প্রকাশ করি। বাক্যের মূল কথা হল শব্দ। শব্দ হল এক অথবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থ-বোধক ও উচ্চারণ যোগ্য একক। অর্থাৎ শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। মানুষের বাগযন্ত্র দিয়ে নিঃসৃত এক ধরনের স্পন্দন হল ধ্বনি, যা কানে শোনা যায়। কিন্তু আমরা শুধু মুখে কথা বলেই মনের ভাব প্রকাশ করি না- লিখেও করি। এই লিখে মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে আমাদের যা করতে হয় তা হল ধ্বনিকে বর্ণে পরিণত করা। আমরা জানি ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ। ধ্বনিকে লিখে অর্থাৎ বর্ণে প্রকাশ করতে গিয়ে ঘটে যায় বিপত্তি। সমস্ত বানান এই বর্ণগুলিকে কেন্দ্র করেই। আমাদের বেশি বিভ্রান্ত ঘটে যখন বর্ণ বা বর্ণগুলিকে সংযুক্ত হয়ে ব্যবহার হয়। যেমন 'বিজ্ঞান' লিখতে গিয়ে তোমরা অনেকেই লিখে ফেলো 'বিঞ্জান'। 'মালঞ্চ' লিখতে গিয়ে লিখে ফেলো 'মালঞ্জ'। 'হ' য়ে 'ম' (হ্ম) এবং 'ক' য়ে 'ষ' (ক্ষ) নিয়েও গোলমাল ঘটে বেশ। 'ব্রাহ্মণ' না 'ব্রাক্ষণ' কী হবে তা নিয়েও সংশয় থাকে তোমাদের। এই ভুলটি অতি সাধারণ হলেও কিন্তু মারাত্মক। সংযুক্ত বর্ণওয়ালা বানান যাতে ভুল না হয় তার জন্য কতিপয় বহুল ব্যবহৃত সংযুক্ত বর্ণের রূপ আমরা তুলে ধরলাম। -

বর্ণ+বর্ণ	যুক্তবর্ণ	শব্দ
ক+ষ	ক্ষ	ক্ষতি, ক্ষয়, ক্ষমা
ক+ষ+ণ	ক্ষ্ণ	লক্ষ্মী, লক্ষ্মণ, সূক্ষ্ম, যক্ষ্মা, তীক্ষ্ণ
ক+ত	ক্ত/ক্ত	রক্ত, ভক্ত, শক্তিমান
ক+র	ক্র	ক্রন্দন, ক্রমশ, ক্রয়
গ+ধ	গ্ধ	দগ্ধ, মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, দুগ্ধ
ঙ+ক	ঙ্ক	অঙ্ক, পালঙ্ক
ঙ+গ	ঙ্গ	অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ
ঞ+চ	ঞ্চ	মালঞ্চ, গুলঞ্চ
ঞ+ন	ঞ্ন	বাঞ্ছা
দ+ধ	দ্ধ	শুদ্ধোদন, অশুদ্ধ

বর্ণ+বর্ণ	**যুক্তবর্ণ**	**শব্দ**
ন+থ	ন্থ	পান্থ
ব+ধ	ব্ধ	লব্ধ
ষ+ণ	ষ্ণ	কৃষ্ণ
স+থ	স্থ	সুস্থ
হ+ম	হ্ম	ব্রাহ্মণ

৪.৫. বাংলা বানান সমস্যা ও সমাধানের প্রচেষ্টা

নিয়ম না মেনে বানান লেখা হলে সে বানান ভুল বলে বিবেচিত হয়। বানান লেখায় ভুল হওয়ার নমুনা সেই আদিকাল থেকে শুরু করে হাল আমল পর্যন্ত সুলভ। আধুনিক প্রযুক্তিতে অতি উন্নত ধরনের ছাপার মধ্যেও ভুল বানান থাকা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু বানানের এমন কিছু নিয়মকানুন রয়ে গেছে যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একই শব্দের দু'রকম বানান থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়। ভুল করলে বানান ভুল হয়, কিন্তু শুদ্ধ বানান লিখেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। বানানের সমতা বিধান করতে পারলেই বানান সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সমতা বিধান বা একরকম বানান লেখার সব উদ্যোগই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। বানান কেন ভুল হয় বা বানানের সমতা বিধান কেন করা যায় না তার অনেক কারণ লক্ষ করা যায়। নীচে তারই কয়েকটি তুলে ধরছি—

১. বাংলা বর্ণমালায় উচ্চারণ অনুযায়ী অনেক বানান লেখা হয় না। বর্ণমালার উচ্চারণের সঙ্গে তার লিখন পদ্ধতির অসংগতি দেখা যায়। উচ্চারণ ও লেখার পার্থক্যের জন্য বানান ভুল হতে পারে। উদাহরণ:

লিখি	**বলি**	**বলি**	**লিখি**
কবি	কোবি	বড়ো	বড়
ক্ষণ	খন	মোন	মন
গহনা	গহোনা	নাটোক	নাটক
ধ্বনি	ধোনি	দ্যাখা	দেখা
স্বাগত	শাগতো	শাসথো	স্বাস্থ্য

২. বাংলা ভাষায় বানানে ও উচ্চারণে মিল নেই এমন নমুনা অনেক পাওয়া যায়। এমনকি এমন অনেক বর্ণ আছে যারা বিভিন্ন শব্দে প্রয়োগ হ'য়ে উচ্চারণের ভিন্নতার সৃষ্টি করে। যেমন-গণ, বন, ঘন, জলখাবার, জলযোগ, আষাঢ়, গাঢ়, সহিত, গলিত, একদা, একটা ইত্যাদি।

৩. একাধিক বর্ণের একরকম উচ্চারণ বাংলা বানানের একটি জটিল সমস্যা। বর্ণমালার কয়েকটি ধ্বনির বেলায় এরকম দেখা যায়। যেমন: ই-ঈ উচ্চারণ। আরও কতিপয় উদাহরণ—

* ই, ঈ-উচ্চারণ একই কিন্তু বর্ণ দুটি। যথা-নিতি, নীতি। বাসি, বাসী।

* উ, ঊ-দুই বর্ণের এক উচ্চারণ। যথা-কুল, কূল। গুড়, গুড়।

* ঙ, ং-একই উচ্চারণ বর্ণ দুটি। যথা-রঙ, রং। বাংলা, বাঙলা।

* জ, য-উচ্চারণ একই। যথা-জাদু, যাদু। বোজা, বোঝা।

* ত, ৎ-একই উচ্চারণ। যথা-সাক্ষাৎ, মহৎ।

* ণ, ন-একই উচ্চারণ। যথা-কোণ, কোন। আপন, আপণ।

* শ, ষ, স-এ তিনটি বর্ণের উচ্চারণ একই। যথা-সবিশেষ, আসা, আশা, আষাঢ়।

৪. ঘোষবর্ণ অর্থাৎ প্রত্যেক বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য করতে না পারলে বানান বিভ্রাট ঘটে। যেমন- গ ঘ, জ ঝ, ড ঢ, দ, ধ, ব ভ, বর্ণের উচ্চারণে পার্থক্য ধরতে না পারায় বানান সমস্যা দেখা দেয়। যেমন- আদি, আধি, আবাস, আভাষ ইত্যাদি।

৫. সমধ্বনিযুক্ত যুক্তব্যঞ্জনের সমস্যা বানান বিভ্রাট সৃষ্টি করে। যেমন- ত্ব, ও, ত্ত্ব, ত্য। এসব ক্ষেত্রেও উচ্চারণের সমতা আছে। কিন্তু বানানে সমতা নেই। যেমন- কৃতিত্ব, বৃত্ত, স্বত্ত্ব, সাহিত্য ইত্যাদি।

৬. শব্দগঠনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় গঠিত শব্দের বানানে পরিবর্তন ঘটে। যেমন- সন্ধিতে 'রবি' কিন্তু রবীন্দ্র, প্রত্যয়ে- প্রতিযোগী, কিন্তু প্রতিযোগিতা, উপসর্গে সম যোগে সম্মান, সংবাদ, সঞ্চয় ইত্যাদি। সমাসে হিত + অহিত = হিতাহিত, নয় অতি দীর্ঘ = নাতিদীর্ঘ, শব্দগঠনের এসব পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন না থাকায় বানান বিভ্রাট ঘটে।

৭. কোনো কোনো ধ্বনির জন্য উপযুক্ত বর্ণ না থাকায় বানানে সমস্যা হয়ে থাকে। তখন বিকল্প চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন- এসিড, অ্যাসিড, এ্যাসিড, এটর্নি, অ্যাটর্নি, ইত্যাদি।

৮. তৎসম শব্দ ও অতৎসম শব্দের বানানের পার্থক্য থাকায় বানান সমস্যা দেখা দেয়। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে সংস্কৃত নিয়ম অনুসরণ করা হয়। কিন্তু অতৎসম (তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশি ও বিদেশি) শব্দের বানানে সংস্কৃত রীতি অনুসরণযোগ্য নয়। তৎসম ও অতৎসম শব্দের পরিচয় জানা না থাকলে তৎসম শব্দের বানান অনুসরণে অতৎসম শব্দের বানান লেখা হয়। ফলে বানানে ভুল ঘটে। যেমন- ধূলি তৎসম শব্দ। ধূলি অনুসরণে লেখা হয় 'ধূলা'। কিন্তু তদ্ভব শব্দ হিসেবে বানান হবে 'ধুলা'। লেখা হয় লণ্ঠন, লণ্ডন, মডার্ণ। হবে লণ্ঠন, লন্ডন, মডার্ন। শব্দের জাত সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে এ ধরনের বিভ্রাট ঘটে।

৯. প্রতিবর্ণীকরণে বানানে সমস্যা হয়। সব ভাষার বর্ণ একই উচ্চারণের অনুগত নয় বলে বিদেশি ভাষার অনেক শব্দ বাংলায় এসে উচ্চারণ ও বর্ণগত সমস্যায় পড়ে এবং বানান সমস্যার সৃষ্টি করে। কেউ লেখেন ইংলন্ড, কেউ লেখেন ইংল্যান্ড, ফার্মেসি লেখা হয় ফার্মেসী।

১০. মুদ্রণ প্রযুক্তির বিবর্তনের ফলে বর্ণের আকার বদলে যাচ্ছে। যেমন- শু > শ ু, ক্ত > ক্ত, রূ > র ূ ফলে আগের বানান আর এখনকার বানান একরকম নয়। কিন্তু পাঠকেরা আগের বানানের বইও পড়েন আবার নতুন বানানের বইও পড়েন ফলে লেখায় বানান বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়। যেমন-অঙ্ক, অংক,

অঙ্ক;। বিভিন্ন বইয়ের বানানের সমতা না থাকায় লিখতে গিয়ে অনেকে শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলেন।

১১. অনুসরণযোগ্য অভিধানের সবগুলোতে একই শব্দের বানানে সমতা নেই বলে অনেকসময় লেখক বিভ্রান্ত হন। শব্দের বানানে অনেক সময় বাহুল্য প্রয়োগ সমস্যার সৃষ্টি করে, একই বানান নানা রূপে লেখা হয়। যেমন-

হত, হোত, হতো, হোতো।

কোন, কোনও, কোনো।

ছোট, ছোটো।

ভাল, ভালো।

মত, মতো।

এধরনের বানানে কোনটি ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নীতি নেই।

আবার অভিধানে একই শব্দের ভিন্ন বানান থাকায় কখনও প্রথমটি কখনও দ্বিতীয়টি গ্রহণ করায় সমস্যার সৃষ্টি করে যেমন:

দেউড়ি, দেউড়ী, দেউরি, দেউরী।

বড়শি, বড়শী, বঁড়শি, বঁড়শী, বরশী।।

নকশি, নকশী, নকসী, নক্সী, নকসি।

একই শব্দের দুটি করে বানান-এমন শব্দের সংখ্যাও প্রচুর। যেমন-বৌ-বউ, রং-রঙ, শিষ-শীষ, শাড়ি-শাড়ী ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কোনটি ব্যবহার করতে হবে তা জানা নেই। আবার কেউ প্রথমটি কেউ দ্বিতীয়টি ব্যবহার করেন।

১২. লেখকের নিজস্ব বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও মতামত বানান রীতি অনুসরণে প্রাধান্য পায় বলে বানানে সমস্যার সৃষ্টি করে।

কেউ লেখেন দেখে, কেউ লেখেন দ্যাখে।

কেউ লেখেন হিশেব, কেউ লেখেন হিসেব

কেউ লেখেন পাশ, কেউ লেখেন পাস।

১৪. উচ্চারণে ত্রুটি বা লেখকের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির জন্য ভুল প্রয়োগ হয়। যেমন- জোড়া-জোরা, রিকশা-রিশকা, বাক্স-বাস্ক।

এসব কারণে বাংলা বানানে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। ভাষার সুষ্ঠু ও সুন্দর প্রয়োগের জন্য প্রমিত বানান ব্যবহার করতে হবে, বানানে আনতে হবে সমতা এবং সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা বা অসামঞ্জস্য দূর করে বানানকে একরকম করতে হবে। সেজন্য বানানে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে বহুদিন থেকেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা বানানে সমতা বিধান করা সম্ভব হয়নি। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বিশ্বভারতী চলতি ভাষার বানানের একটি নিয়ম স্থির করে। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন ক্রমে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র

রচনাবলি ঐ বানানরীতি অনুসরণে মুদ্রিত হতে থাকে। এরপর ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়। ৮ মে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে এবং তার পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ বের করে ১৯৩৭-এর মে মাসে। বিশ্বভারতী বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রচারিত বাংলা বানানের নিয়মকানুন দেশের বিদ্বৎসমাজের প্রশ্নাতীত সমর্থন যেমন পায়নি, তেমনি সৃজনশীল সাহিত্যিকগণ সর্বাংশে মান্য করেননি; ফলে বানানের বিশৃঙ্খলা রয়েই গেল।

৪.৬. বাংলা বানানের বিবর্তন সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

বাংলা বানানের বিবর্তন বিষয়ে বলতে গেলে একেবারে শুরুর দিনগুলিতে যাঁরা বিষয়টি নিয়ে চর্চা করেছিলেন তাঁদের কথা এসেই যায়। অন্য অনেকের মধ্যে যাঁর নাম পথিকৃৎ হিসাবে এসে পড়ে তিনি হলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বাংলা বানানের সংস্কার বিষয়ে মনোযোগ দিতে গিয়ে তিনি ১৩১৫ সালে 'বাংলা ভাষা প্রথম ভাগ' বইটি রচনা করেন। এসময় তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা বানান ও অক্ষরের সমস্যাগুলি ঠিক কী? এ বিষয়ে সমকালের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে একাধিক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দ', 'বাঙ্গালা শব্দের-য়', 'বাঙ্গালা শব্দের ড়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমকাল তাঁর এ জাতীয় ভাবনা চিন্তার যথেষ্ট বিরোধিতা করেছিল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মতে সে যুগে তিনি বাংলা বানানের 'দফারফা' করেছেন। তাঁর 'শব্দকোষ' গ্রন্থে তিনি লুপ্তপ্রায় 'ই'কার বোঝানোর জন্য নতুন অক্ষরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাঢ় বাংলার বিপুল অঞ্চলের কথ্যভাষায় এই নতুন অক্ষরের নির্দেশের যে প্রয়োজন ছিল তা বোঝা যায়। তিনিই প্রথম বলেছিলেন একই অক্ষরের মাধ্যমে একাধিক বর্ণের প্রয়োজন বোঝালে অক্ষরের উদ্দেশ্যটি আর সিদ্ধ হয় না। তাই যতগুলি বর্ণ ঠিক ততগুলি অক্ষর প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। তাই অন্তঃস্থ 'ব'-কার এরও প্রয়োজনীয়তা তিনি দেখিয়েছেন। 'শব্দকোষে' হলন্ত শব্দের ল-এর ব্যবহারও দেখিয়েছেন।

যোগেশচন্দ্রই বাংলা বানানের সংস্কার করতে বসে প্রথম বলেছিলেন যুক্তাক্ষরের অনাবশ্যক জঞ্জাল সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। তা না হলে নতুন শিক্ষার্থীদের বাংলা শিখতে অসুবিধা হবে। সহজ ও সোজা বাংলা ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। এইসব বিষয় নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদ সে সময় দেখা দিয়েছিল। ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির বিরুদ্ধে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বর্ণমালার অভিযোগ' এনেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত এই সহজ বাংলা বানানকে 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নাম দিয়েছিলেন 'যৌগেশ বানান'। একমাত্র 'প্রবাসী' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেনই তাঁর বানান সংস্কারকে মান্যতা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে আনন্দবাজার পত্রিকাও তাঁর প্রদর্শিত পথে ছাপা হতে শুরু করে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে বলেছিলেন, "আপনার উদ্ভাবিত অক্ষরে 'আনন্দবাজার' ছাপাচ্ছি।"

অঞ্চলভেদে বাংলা কথ্যভাষার নানা ছাঁদ, কত বিচিত্র তার রূপ। কিন্তু এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সমতাবিধানের জন্য বাঙালি নিজেই তৈরি করেছে মান্য চলিত রূপ। প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষ তার মৌখিক ভাষায় স্থানিক ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে চললেও একটি সর্বজনমান্য চলিত কথ্যরীতি লিখনরীতিকেও ছুঁয়ে গেছে। তাই মান্য চলিত গদ্যরূপের জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ ভাষাকে মৌখিক ও লিখিত উভয় স্তরেই সর্বজন মান্যতা দেবার একটা প্রচেষ্টা বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে ছিল। লিখিত ভাষায় সমতা রক্ষায় একটি বড় অন্তরায় ছিল বানান। কোন শব্দের কী বানান হবে তা নিয়ে বিভ্রান্তি ছিল তুঙ্গে।

হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের দিকে নজর দিলে দেখা যাবে বানান কখনো অভিন্ন ছিল না। মান্য বানান শেখবার মতো কোনো উপায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালির জানা ছিল না। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাঙালির হাতে বানান শেখার মতো কোনো অভিধান এসে পৌঁছোয় নি। সে সময় বানান শিক্ষা দিতেন টোল মাদ্রাসার শিক্ষকেরা। তাদের এ বিষয়ে গভীর কোনো জিজ্ঞাসা বা জ্ঞান কোনোটাই ছিল না। এইসব টোল বা মাদ্রাসা থেকে পড়াশুনা শিখে উত্তরপর্বে কিছু মানুষ ছাত্র পাঠ্য বই লিখেছেন। কিন্তু তাদের শিক্ষাতেই অনেক ফাঁক ছিল। তাছাড়া টোল মাদ্রাসায় যা শিখতেন তার কিছুটা মনে থাকলেও, অনেকটা ভুলে যেতেন। কিছুটা অনুমান করেও লিখতেন। ফলে বানানের জগতে এক অরাজকতা তৈরি হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছাপাখানার যুগ শুরু হল। এই সূত্রে বানানের জগতে একটি সমতাবিধানের চেষ্টাও শুরু হল। এই সময় থেকেই সংস্কৃত জানা কিছু মানুষ লেখক হিসাবে উঠে এলেন মুদ্রণের জগতে। প্রুফ সংশোধনের প্রয়োজনে যাঁরা এলেন মুদ্রণের জগতে তাদেরও সংস্কৃতে জ্ঞান থাকায় ছাপার জগতে বানান বিভ্রাট খানিকটা কমে এল। তবে আজকের বানান থেকে তা অনেকটাই আলাদা। অর্থাৎ বানানের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার প্রচেষ্টা শুরু হলেও বানান বিবর্তনেরও একটা ক্রমিক ইতিহাস তৈরি হতে শুরু করল। যেমন, অতৎসম শব্দে দীর্ঘ ঈ-কার, দীর্ঘ ঊ-কারের বহুল প্রচলন ছিল। রেফের পরে যুগ্মব্যঞ্জনের ব্যবহার সেকালের বানানকে একাল থেকে পৃথকভাবে চেনা যায়। আবার সেকালে সর্বত্রই যে এমনটি হত তেমনও নয়। অর্থাৎ সমতাবিধানের কাজ শুরু হলেও তা কিছুদিনের মধ্যেই প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। প্রশ্ন তুলেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৫ তে। কিন্তু তারও ৭ বছর আগে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রশ্ন তুললেন, বাংলা শব্দে এত দীর্ঘ ঈকার, উ-কার, ন, য, য, র-এর ছড়াছড়ি কেন? তার মতে তৎসম শব্দগুলিতে ব্যবহারের জন্যে বাকি সব শব্দে উচ্চারণ প্রকৃতিকে মেনেই মৌলিক বানান লেখা উচিত।

বানান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখও। কখনো 'সবুজপত্র' কখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে আশ্রয় করে তাঁদের সেই বানান সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। 'সবুজপত্র'-এ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে পরামর্শ ছিল তার সাথে অনেকটাই মিল পাওয়া গেল ১৯২৫-এ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বানান সংক্রান্ত পরামর্শের। আবার

এইসব ভাবনাচিন্তাগুলিকে যুক্তিসহ যতটা সম্ভব মান্যতা দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬-এ বানান সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলাকে একটি নির্দিষ্ট বিধিতে বাঁধতে চাইলেন। ইতিমধ্যে ১৯৩৯-এ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ নানা খণ্ডে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশ করার সময় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশিত বানান বিধিকেই মান্যতা দিলেন।

ষাটের দশকে পৌঁছে আনন্দবাজার পত্রিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান বিধিকে খানিকটা অভিনবত্ব দানের চেষ্টা করেছিলেন। তা নিয়ে অবশ্য বিতর্কও উঠেছিল। বিদেশি শব্দের যুক্তব্যঞ্জন তারা ভেঙে দিতে চাইলেন। যেমন-

লন্ডন- লনডন

পার্ক- পারক

আনন্দবাজার গোষ্ঠীর এ জাতীয় প্রচেষ্টা মেনে নিতে পারেননি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বা মনীন্দ্রকুমার ঘোষেরা, আনন্দবাজার কেন্দ্রিক বানানে সমতা বিধানের প্রচেষ্টা শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুললেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধিই বানান বিবর্তনের ধারাবাহিকতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। বানান নিয়ে ভাবনা-চিন্তার নানামুখী স্রোতকে একটি বিশেষ মান্যতারূপ দিতে চেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। তারা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মানুষকে জানিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তক রচনায় সেই নিয়মনীতিকেই গুরুত্ব দিতে পরামর্শ দিয়েছেন তারা। ফলে ছাত্রজীবন থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট বানান বোধ উত্তরপ্রজন্মের মানুষের মধ্যে জন্ম নেবে বলেই তাদের ধারণা।

বাংলা বানান বুঝতে গেলে বাংলা ভাষার শব্দগুলি কোন কোন উৎস থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে তা জানতে হবে। উৎস বিচারে বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলিকে তৎসম, অর্ধ তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। বাংলা বানান বিভ্রাট অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৎসম ও বিদেশি শব্দগুলিকে কেন্দ্র করেই দেখা যায়। নিচে পরিবর্তিত ও মান্যতাপ্রাপ্ত কিছু নিয়ম ও শব্দের বানান দেওয়া হল-

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বানান	**পরিবর্তিত ও মান্যতাপ্রাপ্ত বানান**
শ্রেণী	শ্রেণি
সূচী	সূচি
ঊষা	উষা
নদী	নদি
অংক	অঙ্ক
কংকাল	কঙ্কাল
ইংরাজী	ইংরাজি
বাঙালী	বাঙালি

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বানান	পরিবর্তিত ও মান্যতাপ্রাপ্ত বানান
মাষ্টার	মাস্টার
ব্যানার্জী	ব্যানার্জি
প্রথমতঃ	প্রথমত
পূর্ব্ব	পূর্ব
কার্ত্তিক	কার্তিক
ক্ষুদ	খুদ
ক্ষ্যাপা	খ্যাপা
খ্রীষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
কাহিনী	কাহিনি
ডাক্তারী	ডাক্তারি
মাষ্টারী	মাস্টারি
তবলচী	তবলচি

বাংলা বানান সংস্কার বা বিবর্তনের ক্ষেত্রে লাইনোটাইপ প্রবর্তন বিষয়টিও অনেকখানি জড়িত। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিই প্রথম এই লাইনোটাইপের সূত্রটি দেন। ফলে বাংলা বানান সংস্কারের সেই প্রথম যুগেই 'গু', 'রু', 'শু' প্রভৃতির বদলে আজকের বাংলা অকাদেমির প্রচলিত বানানরীতির স্বচ্ছ রূপের ব্যবহার যে সম্ভব সেই ভাবনা তখন থেকেই দেখা দিয়েছিল। রেফ যুক্ত অক্ষরের দিত্ব তখনই বর্জিত হয়েছিল। সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও রাজশেখর বসু এই লাইনোটাইপের উদ্ভাবক হলেও যোগেশচন্দ্রই প্রথম লাইনোটাইপের পরিকল্পনা করেন। যোগেশচন্দ্র প্রবর্তিত এই বানান সংস্কাররীতি বর্তমানে বাংলা বানানের নতুন বিধিতে অনেকাংশেই গৃহীত হয়েছে। বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা না হলেও তা যেন ভারতবর্ষের কৃষ্টির ভাষা হয়ে ওঠে- সে বিষয়ে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। সময়ের চাকা ঘুরেই চলে, তাই আজকের বাংলা বানানরীতি নিয়েও এত পরীক্ষা নিরীক্ষা। বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত নতুন বানানবিধির প্রচলনের পিছনেও যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সেই সহজ ও সোজা বাংলা প্রচলনের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও তার সাফল্যও অনেকাংশে কার্যকরী ছিল বলে মনে হয়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার 'অবভাস' পত্রিকার ২০০৪-এর এপ্রিল-সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'বাংলা বানান ও লিপির সাম্প্রতিক পরিবর্তন' শীর্ষক একটি নিবন্ধে তাই স্পষ্টই বলেছেন- "বাংলা আকাদেমি হঠাৎ নিজের মাথা থেকে রাতারাতি এসব বানান উদ্ভাবন করেননি। তা বাংলাভাষা লেখার প্রবণতা, বাঙালির উচ্চারণ— দুইই লক্ষ করেছে।"

৪.৭. বানান সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদিতে বাংলা বানান সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই ধরনের আলোচনা থেকে আমরা আধুনিক বাংলা বানান-সংক্রান্ত

চিন্তাভাবনার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারি। কিন্তু আধুনিকপূর্ব যুগের বাংলা বানান সম্পর্কে সে ধরনের কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রত্যক্ষ উপাদান আমরা পাই না। তাই মধ্যযুগের বাংলা বানানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার জন্য কোনো পরোক্ষ উপাদানের সাহায্য নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এক্ষেত্রে এই পরোক্ষ উপাদান হচ্ছে আধুনিকপূর্ব যুগের বাংলা পুথির বানান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা পুথিতে যেসব বাংলা বর্ণ ব্যবহার করা হত তার সর্বজনবোধ্য মোটামুটি একটা রূপ ছিল ঠিকই, কিন্তু এর কোন সুনির্দিষ্ট মান্য রূপ ছিল না। বিশেষত বাংলা যুক্তাক্ষরগুলি ছিল বিবিধ আকারের। তবে কোনো নির্দিষ্ট বানানবিধি যে তখন ছিল না তা বলাইবাহুল্য।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা মুদ্রণের আবির্ভাব হয় ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ক্রমশ গদ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার লিখিত রূপ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হল। স্বাভাবিকভাবেই বর্ণ, বানান এবং ব্যাকরণের প্রসঙ্গ এসে গেল। বাংলা ভাষায় বর্ণের আধিক্য যে বানানের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড তাঁর 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে। বাংলা বানান যে পুরোপুরি উচ্চারণ-অনুযায়ী নয় তাও তিনি লক্ষ করেছিলেন। এই ব্যাকরণগ্রন্থে তিনি বলেছেন:

ণ-is never distinguished from ন by the Bengalese.

-in the Bengalese ব wo is never distinguished from ব bo either in form or utterance.

কেরির বাংলা ব্যাকরণে (১৮০১) আমরা হ্যালহেডের ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করি। তবে কেরি যে কেবল বাংলা বানান ও উচ্চারণের অসংগতিটুকু দেখিয়েছেন তা নয়, বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার ব্যাপারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বাংলা বানানকে বিধিবদ্ধ করার ব্যাপারে কেরি সংস্কৃতের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেছিলেন। কেরির বাংলা অভিধানে আমরা দেখি শুধু তৎসম শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব শব্দের বানানও তিনি সংস্কৃতানুযায়ী করেছিলেন। যদিও পরবর্তীকালে কেরির প্রবর্তিত বানান সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, তবু লিপিকরদের স্বেচ্ছাচারিতার যুগে কেরির এই ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কেরির পরই উল্লেখ করতে হয় রামমোহন রায়ের প্রসঙ্গ; তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি বাংলা ভাষার বর্ণমালা যে পুরোপুরি ধ্বনি-অনুসারী নয় সেদিকে প্রথম অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বাংলা বর্ণমালার অসংগতি নিয়ে পণ্ডিতমহলে বহু আলোচনা হলেও বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের প্রস্তাব তখনো কেউ করেন নি। এই ধরনের প্রস্তাব প্রথম আমরা প্রকাশিত হতে দেখি ১৮৩৮ সালের ২২শে এপ্রিল 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকায়। 'An important reform in the Bengalee alphabet' নামক এই প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে, বাংলা বর্ণমালায় 'ণ' ও 'ন', 'জ' ও 'য', 'খ' ও 'ক্ষ', 'শ', 'ষ' ও 'স', তালব্য ব ও অন্তঃস্থ 'ব'-এই ধরনের সমোচ্চারিত বর্ণগুলির মধ্যে একটিকে রেখে বাকিগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। স্বরধ্বনির মধ্যে ই ও ঈ, উ ও উ-এর মধ্যে যে-কোনো একটিকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনুরূপভাবে ঋ, ঌ-এর কাজ র বা ল দিয়ে সারা হলে অনায়াসে ঋ, দীর্ঘ ঋ, ঌ, দীর্ঘ ঌ-কেও বাদ দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বাংলা বর্ণমালা থেকে ১৪টি বর্ণ ও স্বরচিহ্ন বাদ

দিয়ে বাংলা বানানের সরলীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে সেকালের ভাষাচর্চায় সংস্কারপন্থী রক্ষণশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রস্তাব বিশেষ সমর্থিত না হওয়াই সম্ভব।

পরবর্তীকালে বাংলা বর্ণমালা ও বানান সংক্রান্ত যাঁর প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে গৃহীত হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তাঁর 'বর্ণপরিচয়' গ্রন্থে (প্রথম ভাগ-১৩ই এপ্রিল ১৮৫৫) বাংলার নিজস্ব বর্ণমালার রূপ তুলে ধরেন। সেই কারণেই দীর্ঘ ঋ এবং দীর্ঘ ৯ কে বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেন এবং ড়, ঢ় ও য়-কে বাংলা বর্ণমালায় স্থান দেন। চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে চিহ্নিত করেন। অনুস্বার এবং বিসর্গকে ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্থান দেন। এই ভাবে তাঁর বর্ণমালায় দেখা যায় ১২টি স্বরবর্ণ (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৯, এ ঐ, ও, ঔ) এবং ৪০টি অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ (ক, খ, গ, ঘ,ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ, ং, ঃ, ঁ)। বিদ্যাসাগর বাঙালির উচ্চারণ-প্রবণতার কথা স্মরণ রেখে বাংলা বর্ণমালাকে নতুন করে বিন্যস্ত করলেন। সংস্কৃত এবং বাংলা উভয় ভাষার প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে এমন এক বর্ণমালা তৈরি করলেন বিদ্যাসাগর। ক্রমশ সংস্কৃতচর্চা যত কমতে লাগল ততই বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত বর্ণমালার অসম্পূর্ণতা স্পষ্ট হতে লাগল। বর্ণবিন্যাস নিয়েও নানাবিধ প্রশ্ন উঠল। অ-তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃতানুসারী হবে, না বাঙালির উচ্চারণকে সেক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হবে—এই ধরনের বানান-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হল।

এই সকল চিন্তাভাবনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য এইসব চিন্তাভাবনার প্রকৃতি ছিল ব্যক্তিগত। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বানান-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা প্রথম সূত্রাকারে বদ্ধ হতে দেখা যায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'চলিত ভাষার বানান' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধের নিয়মাবলি রচিত হয় বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ রেখে। নিয়মগুলি ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রণীত নয়। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্ব যৌথভাবে আলোচনা করে নিয়মগুলি তৈরি করেছিলেন। এই চেষ্টার লক্ষ ছিল একটি বিশেষ প্রকাশন-সংস্থার বানানের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন। বানানে শৃঙ্খলা আনয়নের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ আরো ব্যাপক সামাজিক মাত্রা লাভ করে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান সংস্কারের কাজে সেই সময়কার প্রতিনিধিস্থানীয় মনীষীরা যুক্ত থাকলেও এই নিয়মাবলির বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সোচ্চার হয়ে উঠে। বহু লেখালেখি শুরু হয়। জনমতের চাপে পড়ে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দেরই অক্টোবর মাসে ঐ নিয়ম-পুস্তিকার সংশোধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সংশোধিত বানান সংক্রান্ত নিয়মাবলি পালনের স্বীকৃতি সংযোজিত হয়। তবু এই নিয়মাবলি বুদ্ধিজীবীদের মতৈক্য অর্জনে সমর্থ হল না। ফলে তাঁদের মতভেদ বিভিন্ন পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হল। এই বাদানুবাদে অংশ নিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সজনীকান্ত দাস, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এই আন্দোলনের কাছে বানান কমিটিকে

শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বানান কমিটি পুনরায় কিছু সংশোধন করে বাংলা বানানের নিয়মের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এই সংস্করণ প্রকাশের সময় বানান কমিটি ঘোষণা করেন: "সাধারণের অভ্যস্ত হইতে সময় লাগিবে এবং ছাত্রগণও প্রথম প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করিবে। সেজন্য এখন কয়েক বৎসর বানানের নিয়ম পালন সম্বন্ধে কোনো প্রকার পীড়ন বাঞ্ছনীয় নয়।" এই ঘোষণার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাংলা বানানের পাশাপাশি পুরনো বানানও অবাধে চলতে লাগল। ফলে বিশৃঙ্খলার অবসান তো হলই না, বরং নতুন এক সমস্যা সংযুক্ত হল। আসলে বানান কমিটির নিয়মাবলির মধ্যেই বহু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান সংস্কার জনসমাজে এতটাই আলোড়ন সৃষ্টি করে যে শুধু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরাই নন, এ বিষয়ে আগ্রহী বহু সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিও বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানান। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্য ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে এই সমিতি বাংলা বানানের নিয়ম শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সংশোধিত আকারে এই পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। ১৯৩৫ সালের এই 'বানান সংস্কার সমিতি'-তে ছিলেন: রাজশেখর বসু (সভাপতি), চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য (সম্পাদক), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, প্রমথনাথ চৌধুরী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, দুর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় একটি বানান সংস্কার সমিতি গঠন করে। সভাপতি ছিলেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এই সমিতির কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সমিতি বাংলা বর্ণমালা থেকে ঙ, ঞ, ণ, য-ফলা ও ঈ-কার বাদ দেবার প্রস্তাব করেছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৪৯ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সরকার মৌলানা মহম্মদ আকরম খাঁ-র নেতৃত্বে East Bengal Language Committee গঠন করে। ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমির তদানীন্তন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সদস্য ছিলেন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, ফেরদৌস খাঁ, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ। এই কমিটির প্রস্তাব ছিল যে, বাংলা বর্ণমালা থেকে ঙ, ঃ, ঈ, ঈ-কার (ী) বাদ দিতে হবে। ১৯৬৭ সালে ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহের ব্যক্তিগত আগ্রহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদে বাংলা বানান সরলায়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির প্রস্তাব:

ক) বাংলা বর্ণমালা থেকে ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ঈ-কার (ী), ঊ-কার (ূ), ঐ-কার, ঔ-কার বর্জন।

খ) ব-ফলা ও য-ফলার পরিবর্তে বর্ণদ্বিত্ব গ্রহণ।

গ) যুক্তবর্ণের উচ্ছেদ।

ঘ) য-জ, শ-স-ষ ব্যবহারের নতুন নিয়ম।

ঙ) এ-কার ও-কার কে ব্যঞ্জনের ডানপাশে বসাতে হবে।

১৯৬৮ সালে মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুনীর চৌধুরী এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে একটি বিবৃতি দেন।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করবার পর ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমী বানান বিষয়ক একটি সর্বজনগ্রাহ্য নিয়ম তৈরি করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে ও একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি তৈরি করে। বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, জামিল চৌধুরী, মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান প্রমুখ। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা একাডেমী প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশিত হয়। ১৯৯৮ সালে ঐ নিয়মাবলির দ্বিতীয় সংস্করণ ও ২০০০ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই নিয়ম ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বানানবিধি প্রায় অভিন্ন। ১৯৯৪ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা অভিধান প্রকাশিত হয়।

১৯৯১ সালে ভারতের আনন্দ পাবলিশার্স তাঁদের প্রকাশনা সংস্থা ও দৈনিক পত্রিকার (আনন্দবাজার পত্রিকা) জন্য একটি বানান বিধি প্রণয়ন করেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় তা বাংলা: 'কী লিখবেন, কেন লিখবেন' নামে প্রকাশিত হয়। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের প্রথম আলো নামক প্রকাশনা সংস্থাটি তাঁদের ব্যবহারের জন্য একটি বানান বিধি প্রবর্তন করেন।

১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক আকাদেমি বানান অভিধান প্রকাশিত হয়। এর মোট পাঁচটি সংস্করণ হয়েছে: প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ১৯৯৮, তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০১, চতুর্থ সংস্করণ: নভেম্বর ২০০৩, পঞ্চম সংস্করণ; আগস্ট ২০০৫। আকাদেমি বানান অভিধানের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা বানানে সমতা বিধান করা। এই অভিধানের সম্পাদক ছিলেন; নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, জ্যোতিভূষণ চাকী, নির্মল দাশ, সুভাষ ভট্টাচার্য, অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি।

৪.৮. বানান সংস্কার: চিন্তা-প্রবণতা

পূর্ববর্তী এককে বিভিন্ন সময়ে বাংলা বানান সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার মোটমুটি একটা কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই সমাপ্তির রেখা টানলে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শুরু থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যাঁরা বানান নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁদের চিন্তাভাবনার মধ্যে স্পষ্ট দুটি প্রবণতা মুখ্যত লক্ষ করা যায়। এক ধরনের লেখা পাওয়া যাচ্ছে যেখানে রক্ষণশীল মনোভাব প্রকট হয়েছে। এঁরা সনাতন প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার তীব্র বিরোধী। অন্য আর এক ধরনের লেখা দেখা যাচ্ছে, যেখানে রক্ষণশীলতার গন্ডি থেকে বেরিয়ে নতুন কিছু ভাবনার প্রতিফলন রয়েছে। তবে নতুন যাঁরা ভাবছেন বা ভাবতে চাইছেন তাঁদের মধ্যেও আবার দুই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। একশ্রেণির প্রবণতায় দেখা যায় বানান সংস্কার করতে গিয়ে প্রথা এবং অভ্যাসকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে

নতুন কিছু ভাবনা সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্কারের জন্যই সংস্কার। আর এক ধরনের লেখা পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে কেবল সংস্কারের জন্যই সংস্কার করা হয়নি। একান্তভাবে যুক্তিশীলতার উপর নির্ভর করে সমস্যার ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এমনভাবে সমাধানসূত্র সুপারিশ করা হয়েছে যাতে সামাজিক অভ্যাসে তীব্র আঘাত লাগে না অথচ উপস্থিত সমস্যারও বাস্তবায়িত সমাধান হয়।

যাঁদের লেখায় রক্ষণশীল মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ, ব্রজকিশোর গুপ্ত প্রমুখ পন্ডিতেরা। এঁরা যে 'বাংলা ব্যাকরণ' রচনা করেছেন তাতে সংস্কৃতানুসারিতাই লক্ষ করা যায়। এর পাশাপাশি আর এক ধরনের লেখা পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের ছায়া হিসাবে দেখা হচ্ছে না। বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য যাতে বানানে প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় কিছু পূর্ববর্তী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের কথা। তিনি ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ধ্বনি ও বর্ণমালার অসংগতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। ফরস্টার তাঁর 'Vocabulary in two parts-English and Boangalee' (১৭৯৯) গ্রন্থেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। উইলিয়ম কেরিও তাঁর ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণে (১৮০১) এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর রচনা সংস্কৃত-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। এই ধারায় বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে' বাংলা ধ্বনি ও বর্ণমালার অসামঞ্জস্য দৃষ্টান্ত সহযোগে তুলে ধরেছেন। প্রায় একই সময়ে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকাতেও বাংলা বর্ণমালা সম্পর্কে অত্যাধুনিক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার প্রমুখ মনীষীরা। বিভিন্ন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতার জন্য আমরা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা লক্ষ করি। সংস্কৃত পরিমন্ডলে পরিবর্ধিত এবং সনাতন ভাবধারায় বিশ্বাসী পণ্ডিতদের ব্যাকরণে তথা ভাষা বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতানুসরণ ঘটেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের অধিবাসী হ্যালহেড, ফরস্টার প্রমুখ ব্যক্তিরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। তাই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তাঁরা বাংলা বর্ণমালার অসংগতিগুলি দেখিয়েছেন। অন্যদিকে রামমোহন রায় সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত হলেও সমাজ-প্রগতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাহলেও হ্যালহেড প্রমুখ বিদেশি লেখকবৃন্দ এবং রামমোহন-প্রমুখ দেশীয় লেখকবৃন্দের আলোচনার বৈশিষ্ট্য হল তাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু সমকালের পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কোনআদর্শ গ্রহণযোগ্য সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশ পাওয়া যায় না।

এদিক থেকে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বিদ্যাসাগর এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি নতুন কিছু ভেবেছেন, তবে তা পুরাতনকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে নয়। তিনি বানান, সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এবং তার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণমালা সংস্কারের কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে বহু লেখা পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে কেবল বর্ণমালা নয়

বাংলা বানানের গঠন-প্রকৃতি কেমন বা কেমন হওয়া অভিপ্রেত সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই সব লেখায় সংস্কৃতঘনিষ্ঠতা যেমন রয়েছে, তেমনি বাংলা বানানকে সংস্কৃতের ছায়া থেকে মুক্ত করার প্রবণতাও রয়েছে। তবে সংস্কৃতের ছায়া থেকে মুক্ত করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন হঠকারী প্রস্তাব রাখা হয়েছে যা বানানের ক্ষেত্রে সমস্যা বা জটিলতা বাড়িয়েছে। অবশ্য এর মধ্যেও কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তির প্রস্তাব পাচ্ছি যার প্রয়োগিক উপযোগিতা যথেষ্ট। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়- ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কথা। তবে এঁদের মধ্যে বাংলা বানানকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর দীর্ঘ দিনের বানানচিন্তার মধ্যে দেখা যায়, তিনি আগাগোড়া ভাষাচর্চার বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে বানান সংস্কারের প্রশ্নটিকে বিবেচনা করেছেন এবং সমস্ত রকম পূর্বসংস্কার বর্জন করে বানান সম্পর্কে উদার ও প্রগতিশীল মত প্রকাশ করেছেন।

এইসব ব্যক্তিগত বানান-চিন্তার বাইরে বাংলা বানান-চিন্তা বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান কমিটির প্রচেষ্টায়, তবে এক্ষেত্রেও কমিটির সদস্যদের সামাজিক অবস্থান সক্রিয় ছিল। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান কমিটি 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার যে তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন সেগুলি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, সেখানে প্রচুর বিকল্পের ব্যবহার, অসংগতি, স্ববিরোধ বা সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার প্রবণতা রয়েছে। বানানসমিতির বাইরেও বানান নিয়ে পরবর্তীকালে বহু লেখা পাওয়া গিয়েছে। আসলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বানান-সংস্কার সমাজজীবনে বড়ো ধাক্কা দিয়েছিল। এর ফলে বানান-চিন্তার পরিসর অনেক বিস্তৃত হয়েছিল। এই সময়কার লেখাগুলি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠা, বিজ্ঞানমনস্কতার ছাপ বেশি লক্ষ করা যায়। তবে রক্ষণশীল লেখা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। এই সময়পরিধিতে আছেন দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো লেখক, যিনি সংস্কৃতের ঐতিহ্য থেকে বাংলা বানানকে মুক্ত করতে মোটেই রাজি নন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায়, বাংলা বানানকে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। তবে বাংলা বানানচিন্তা যে ক্রমপ্রসারশীল তার বড়ো প্রমাণ বানান-সংক্রান্ত গ্রন্থাদির উত্তরোত্তর সংখ্যাবৃদ্ধি। এই সংখ্যাবৃদ্ধি বিংশ শতাব্দীর আশি ও নব্বই-এর দশকে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই সময়সীমার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে বানান সংক্রান্ত গ্রন্থাদি, অভিধান বহু রচিত হয়েছে, যা বানান সমস্যা সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিচায়ক।

৪.৯. অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সমিতি কত খ্রিস্টাব্দে কার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়?

২) আকাদেমি বানান বিধি কার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়? এই সমিতিতে সদস্য হিসেবে কারা কারা ছিলেন?

৩) প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত বানান সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধের নাম লিখুন।
৪) 'যৌগেশ বানান' কী?
৫) 'যৌগেশ বানান' — এই নামকরণটি কে করেছিলেন?
৬) নীচের শব্দগুলির মধ্য থেকে পরিবর্তিত ও মান্যতাপ্রাপ্ত বানানগুলি চিহ্নিত করুন।—
ব্যানার্জি/ব্যানার্জী, খ্রিস্টাব্দ/খ্রীষ্টাব্দ, কাহিনী/কাহিনি, সূচী/সূচি, মাষ্টারী/মাস্টারি
৭) শুদ্ধ বানানটি নির্বাচন করুন —
ব্রাহ্মণ/ব্রাহ্মণ, মালঞ্চ/মালঞ্জ, বিজ্ঞান/বিঞ্জান
৮) বাংলায় মোট কতগুলি বর্ণ আছে?
৯) আনন্দ পাবলিশার্স ও আনন্দবাজার পত্রিকার জন্য লিখিত বানান বিধির সংক্রান্ত গ্রন্থটির নাম কী? গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
১০) 'বানান শব্দটির মূল উৎস কী?'

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) বাংলা বানান সরলীকরণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কতখানি তা আলোচনা করুন।
২) ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিষদ দ্বারা আয়োজিত বানান সংস্কার কমিটিতে কোন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল?
৩) বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
৪) বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কোন কোন কারণের জন্য বানান ভুলের সমস্যা তৈরি হয়?
৫) বাংলা বানান পরিমার্জনে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী দ্বারা কোন কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল?
৬) টীকা রচনা করুন: বর্ণমালা ও বাংলা বানান, 'যৌগেশ বানান'।

বিস্তারিত প্রশ্ন

১) বাংলা বানান ভুল হবার কারণগুলি উল্লেখ ক'রে এ বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করুন।
২) বাংলা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির ভূমিকা কতখানি ছিল তা নিজের ভাষায় লিখুন।
৩) বাংলা বানান সংস্কারের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও উদার তথা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করুন।
৪) বাংলা বানানের সরলীকরণের বিধি উপস্থাপনে কলিকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখুন।
৫) সংক্ষেপে বাংলা বানানের বিবর্ততের রূপরেখাটি নিজের ভাষায় চিত্রিত করুন।
৬) স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা বানানের সংস্কার সাধনে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

একক ৫ : মান্য বাংলা বানানবিধি

৫.১. উদ্দেশ্য
৫.২. প্রস্তাবনা
৫.৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধি
৫.৪. বিশ্বভারতীর বানান বিধি
৫.৫. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি
৫.৬. আধুনিক বানানের নিয়ম-কানুন
৫.৭. অনুশীলনী

৫.১. উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী এককে আমরা বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে কতিপয় প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব বানান রীতির প্রচলন করতে সচেষ্ট হয়। যার ফলশ্রুতিতে বানান বিধির নির্মাণ ঘটে। বলাবাহুল্য, বানান সম্পর্কে শেষকথা কারও পক্ষেই বলা সম্ভবপর নয়। কেননা ভাষা যদি গতিশীল হয়, তাহলে কালক্রমে তার উচ্চারণও বদলায়, আবার বানানও। তবুও এই বাংলার ছাত্রছাত্রীদের সামনে বানান প্রয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক বানান বিধি রয়েছে। তার কয়েকটির সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই জ্ঞাত আছি। এই সবকটি বিধিই মান্য করা যেতে পারে। কে কোন বিধি মান্য করবেন তা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাহলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মান্য বানান বিধির পরিচয় প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই এককের অবতারণা।

৫.২. প্রস্তাবনা

বানান সংস্কার ও বানানের সমতা বিধানের একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তা হলেও তাতে কারও সর্বাংশে একমত হওয়া এখনও পর্যন্ত সম্ভবপর হয়নি। আর মতবিরোধ থাকার ফলে এখনও পর্যন্ত বানান সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবসান ঘটেনি। লেখকগণ ও সম্পাদকগণও একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এককে সময়ে এককে বানানবিধি মান্যতা প্রাপ্ত হয়। এই এককে আমরা তারই মধ্যে থেকে খুবই উল্লেখযোগ্য মান্য বানানবিধি হিসেবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধির উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি তিনটি মান্য বানান বিধি পাঠ করলে ছারাছাত্রীদের মধ্যে সংশয় জাগতে পারে — তাহলে এবার আমরা কোনটিকে মান্য বলে গ্রহণ করব? এ প্রেক্ষিতে সবগুলো নিয়মের মধ্যে সমন্বয় করে আধুনিক বানানে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিগুলোও

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

উল্লেখ করা হল। এসব নিয়ম অনুসরণ করে লেখা হলে বানানের সমতা আসবে এবং বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে। এ নিয়মগুলো সবার জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং তাতে বানানের সমস্যা অনেকটা কমে যাবে বলে মনে করা যেতে পারে।

৫.৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই জ্ঞাত আছি। এ-সম্পর্কে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না। পরিবর্তে এখানে আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৩৭) থেকে গৃহীত ১ থেকে ২২ সংখ্যক নিয়মগুলি হুবহু তুলে ধরছি। গৃহীত অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানা ও ভাষা যথাযথ রক্ষিত হবার কারণে সাধুভাষার প্রয়োগ করতে হয়েছে। -

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব: রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা- অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্ধ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ। না করিলে দোষ হয় না, বরং লেখা ও ছাপা সহজ হয়।

২। সন্ধিতে ঙ স্থানে অনুস্বার: যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ বিধেয়। যথা-'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার' 'ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুসারে বর্গীয় বর্ণ পরে থাকিলে পদের অন্তস্থিত মস্থানে অনুস্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়, যথা-'সংজাত, স্বয়ংভু' অথবা 'সঞ্জাত, স্বয়ম্ভূ'। বাংলায় সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে, কিন্তু ক-বর্গের পূর্বে অনুস্বার ব্যবহার করিলে বাধিবে না, বরং বানান সহজ হইবে।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব: রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। যথা- কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি।

৪। হসচিহ্ন: শব্দের শেষে সাধারণত হসচিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথ-ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হসচিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণত স্বরান্ত, যথা- দহ, অহরহ, কান্ড, গঞ্জ। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয় তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হসচিহ্ন আবশ্যক, যথা- 'শাহ্, খত জেমস বণ্ড কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে যথা-'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ। মধ্য বর্ণে

প্রয়োজন হইলে হসচিহ্ন বিধেয়, যথা-'উলকি, সটকা'। যদি উপান্ত্য স্বর অন্ত হ্রস্ব হয় তবে শেষে হসচিহ্ন বিধেয়, যথা 'কট খপ সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা-'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা-'অচল, গভীর, পাঠ, করুক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হসচিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলাভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে/অ/উচ্চারণ/হয়, যথা-'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হসচিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হসচিহ্ন বিধেয়।

৫। **ই ঈ উ ঊ:** যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা উ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ শব্দে ই বা উ অথবা বিকল্পে ঈ বা ঊ হইবে, যথা-'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীঘ্র, ঊনিশ, চূন, পূর্ব' অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিম, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা 'নীলা (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়), চুল (চুল), তাড়ু (তর্দু) জুয়া (দ্যূত)।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা- 'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা: 'ঝি, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, মাঝারি, চল্লি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুয্যেতর জীব, বস্তু, গুণ ও কর্ম বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে কেবল ই হইবে, যথা- 'বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, ছুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ ঊ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

৬। **জ য:** এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়-'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোতা, জোয়াল'।

৭। **ণ ন:** অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা-কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার, কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ ও চলিবে, যথা: 'ঘুন্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। **ও-কার ও ঊর্ধ-কমা প্রভৃতি:** সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধ্য হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা-'কাল, কালো, ভাল, ভালো, মত, মতো, পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়-'এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ: 'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয় প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা- 'রং, রঙ, সং, সঙ, বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা-'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং-এর' অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গে র' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'-এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স: মূল সংস্কৃত শব্দ অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, য বা স হইবে, যথা: আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসি (পিতৃঃস্বসা)। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা-'মিনসে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে ꝭ স্থানে স ও ꝭতস্থানে শ হইবে, যথা: 'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্সপিয়র'। কিন্তু কতগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা-ইস্তাহার (ইশতিহার), গোমস্তা (গুমাস্তাহ) ভিস্তি (বিহিশতি), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ, ষ, স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ, য, স প্রয়োগ বহু প্রচলিত এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা-'শরবৎ, সরবৎ; শরম, সরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের ꝭ ধ্বনির জন্য বাংলার ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা-'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা-'করিস ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উশখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ: সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো', প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষার ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধকর্মা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং লাম বিভক্তি স্থানে-লুম বা-লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু: হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ; হ'ল, হ'লাম। হ'ত। হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু: খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু: দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম, দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু ধাতু: শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কৃ-ধাতু: করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্ ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু: কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কার্টুন, কাট, কাট। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু: লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ। লিখলে, লিখলাম। লিখত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখবে। লিখো, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু: ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু: করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাব, করান, করাও, করা। করালে, করালাম। করাত। করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপঃ 'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা-'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা- 'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন পুরনো'।

নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut এর **u**, **cat**-এর **a**, **f**, **v**, **w**, **z** প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা-'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেন্ড'।

১৩। বিবৃত অ (Cut-এর u): মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে

আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা-ক্লাব (club) বাস (bus). বাল্ব (bulb), সার (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget) জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), অগস্ট (August) রেডিয়ম (radium), ফসফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। বক্র আ (বা বিকৃত এ। cat এর a): মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে য-ফলা আকার বিধেয়, যথা: 'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে 'য-ফলা'-কে য ফলা আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন হিন্দিতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat-)। নাগরী লিপিতে যেমন অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও () হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ উ: মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ, উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ, উ বিধেয়, যথা: সীল (Seal), ঈস্ট (East), উস্টার (Worcester), স্পূল (Spool).

১৬। fv : f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা-'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা-'ফন (Von)'।

১৭। w : w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথাঃ 'উইলসন (wilson). উড (wood) ওয়ে (way)।

১৮। য়: নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়র, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বন্ড' না লিখিয়া 'এআর্ড, ওঅর-বন্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার' (hardware) বানানে দোষ নাই।

১৯। **s, sh** :১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। **st** : নবাগত বিদেশী শব্দে ইংরেজির স্ষ্ঠ স্থানে নূতন সংযুক্ত বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা : 'স্টোভ (stove)'।

২১। **z** : z স্থানে জ বা জ বিধেয়।

২২। **হস্ চিহ্ন** : ৪ সংখ্যক/নিয়ম/দ্রষ্টব্য।

৫.৪. বিশ্বভারতীর বানান বিধি

১. সংস্কৃত ও তৎসম শব্দের বানান প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার নিয়ম অনুসারে লেখা হবে।

ব্যতিক্রম

১.১ সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিভক্তি যুক্ত হলে ঈ-কারই বজায় থাকবে। ইন-অন্ত শব্দে সমস্ত পদে বিকল্পেই বানান চলতে পারে, কিন্তু আমরা বাঙলায় ঈ-কারান্ত

প্রথমার রূপকেই বাংলার শব্দরূপ বলে ধরে নেব। যেমন: ধনীরা, যাত্রীদল, সঙ্গীহীন, ইত্যাদি।

১.২ সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই ঈ-কারান্ত শব্দে সম্বোধনী কার বজায় থাকবে। যেমন: দেবী, জননী, রূপসী, সুন্দরী, ঊর্বশী ইত্যাদি।

১.৩ যেখানে অন্ত্যঃ (বিসর্গ) উচ্চারণ হয় না সেখানে: (বিসর্গ) না লেখাই ভাল, যেমন : জ্ঞানত, বিশেষত, আপতত, সাধারণত ইত্যাদি। অবশ্য, যেখানে বিসর্গ উচ্চারণ হয় সেখানে ঃ (বিসর্গ) লিখতেই হবে। যেমন: মাতঃ, পিতঃ, নমোনমো ইত্যাদি।

২. হসন্ত-চিহ্নের ব্যবহার

শেষে হসন্ত উচ্চারণ করাই বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম বলে শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। যেমন: সকল, বালক, নিশ্চিত, বললেন ইত্যাদি।

২.১ সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য সময়ে সময়ে শেষে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন: "এ জিনিসটার চলহয়ে গেছে "যদিও ব্রাহ্মণবংশজাত তবু জাতমানি না"; "রোজ রোজ যোগানযোগানো চলে না"। এই সব বাক্য চল জাত যোগানপ্রভৃতি শব্দ সাধারণত হসন্ত দিয়ে লেখাটা ভালো।

২.২ চলতি ভাষায় তুচ্ছ অনুজ্ঞায় (বিকল্পে) শেষে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। যেমন: ডাক্, কর্য,বল্, হোক্, বলিস্, করিস্ ইত্যাদি। কিন্তু হসন্ত চিহ্ন না দেওয়াই ভালো।

২.৩ সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্যান্য তিন অক্ষরের শব্দে উপান্ত অক্ষরে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয়া দরকার; যেমন: মেঘ্ লা, বাদ্ লা, পশ্ লা, জান্ লা ইত্যাদি।

কবিতার ছন্দ অনুসারে অনেক সময় উপান্ত অক্ষরের অ-অন্ত্য বা হসন্ত দু'রকম উচ্চারণই হয়; তাই কবিতায় অনেক জায়গায় উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন দেওয় দরকার। যেমন: ব র্ষা (বরিষা, সংস্কৃত বর্ষা নয়) আর বর্ষা, ভাবনা আর ভাব্না, ভরসা আর ভর্সা। এইসব শব্দে উচ্চারণ পার্থক্য দেখানোর জন্য হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা উচিত।

২.৪ চলতি ভাষায় তিন অক্ষরের ক্রিয়াপদে উপান্ত অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণই সাধারণ নিয়ম। এসব শব্দে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার না করলেও চলে। যেমন: করতে, বলতে, চলতে, ধরতে, পরতে, চিনতে। আবার হসন্ত ব্যবহার করাও চলে। কোনোটারই অসুবিধা হয় না; উচ্চারণের দিকথেকে হসন্ত ব্যবহার করাই বোধহয় ভালো।

শব্দের মধ্যস্থিত স্বর-ধ্বনির লোপের ফলে যেখানে উচ্চারণে অন্য বর্ণ এসে গিয়েছে সেখানে মূল রূপের অনুযায়ী ব্যঞ্জন-বর্ণগুলিকে ঠিক রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমরা পার্ব, কর্ব প্রভৃতি বানান ব্যবহারের পক্ষপাতী নই। কারণ তাতে ধাতুর নিজরূপ অনাবশ্যক বিকৃত হয়ে যাবে- অথচ বিশেষ কিছু সুবিধাও হবে না।

২.৫ সাধু ও চলিত ভাষা দুয়েতেই বিদেশি শব্দে উচ্চারণ অনুসারে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন: মশ্ গুল, বুল্ বুল ইত্যাদি।

২.৬ চলিত ভাষায় চার অক্ষরের ক্রিয়াপদে দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত দেওয়া যেতে পারে, না দিলেও চলে, কোনো অসুবিধা হয় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, বাংলা উচ্চারণের কাঠামো দ্বৈ-মাত্রিক। দুই দুই অক্ষরে শব্দকে ভাগ করে নিয়ে সাধারণত দ্বিতীয় অক্ষরে হসন্ত উচ্চারণ হয়।

৩. ইলেক-চিহ্ন (')র ব্যবহার

৩.১ কবিতায় সাধু ও চলিত ভাষা দুয়েতেই কি-কারান্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ইলেক-চিহ্ন দিতে হবে। যেমন: করি', ভরি', ধরি', চমকি', উচ্ছ্বসি' ইত্যাদি।

৩.২ মধ্যস্থিত অ-কারের ও ধ্বনি দেখাবার জন্য ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার হবে।

৩.২.১ চলিত ভাষার ক্রিয়ার লুপ্ত ই-কারের প্রভাবে অ-কার থেকে জাত ও ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে দেখাতে হবে। ও-ধ্বনি যে-ব্যঞ্জনবর্ণকে আশ্রয় করে, ইলেক চিহ্ন তার পাশে বসবে। যেমন: ক'রে, ব'লে, ক'রবো, ব'লবো, ক'রতে, প'রতে, ম'রতে, ক'রছো ইত্যাদি।

৩.২.২ কিন্তু যেখানে ও উচ্চারণ হয় না, সেখানে ইলেক ব্যবহার হবে না। যেমন: কবার, ধব্বার, বল্বার ইত্যাদি।

৩.২.৩ সাধুভাষা ও চলতি ভাষায়, দুয়েতেই বর্তমান অনুজ্ঞায় ইলেক ব্যবহার হতে পারে। যেমন: ডাক' (ডাকহ), দেখ' (দেখহ), কর' (করহ), বল' (বলহ) ইত্যাদি।। কিন্তু চলতি ভাষায় ও-কার ব্যবহার করাই সহজ। যেমন: ডাকো, দেখো, করো, বলো ইত্যাদি।

৩.২.৪ চলতি ভাষায় আছ', দিল', দিত', ছিল' এই কয়টি শব্দে ইলেক-চিহ্ন দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবত চোখে লাগবে।

৩.৩ সাধু ও চলতি ভাষা দুয়েতেই অর্থের পার্থক্য দেখাবার জন্য লুপ্ত অক্ষরের পরিবর্তে আবশ্যক মতো ইলেক-চিহ্ন ব্যবহার করা দরকার। যেমন: ক'বে (কহিবে) ও কবে (কোনো দিন), র'বে (রহিবে) ও রবে (শব্দে), তা'র (তাহার) ও তার (তন্ত্রী), তা'রা (তাহারা) ও তারা (নক্ষত্র), বা'র (বাহির) ও বার (দিন) ইত্যাদি। কিন্তু তাতে ইলেকের ও ধ্বনি জ্ঞাপক ব্যবহারের সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটবে।

৩.৪ অ-উচ্চারণ দেখাবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন: ভর'সা ও ভরসা, এমনি' ও এমনি ইত্যাদি কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটে। একই ইলেক-চিহ্নকে শুধু অ-ধ্বনি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয়। মধ্য ও ধ্বনি সর্বত্রই ও-কার দিয়ে লিখলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না।

৪. অ-কার ব্যবহার

৪.১ তৎসম শব্দে। যেমন: স্নেহ, গত, নত, মৃগ, পালিত, বিহিত, ইত্যাদি।

৪.২ অন্ত্য সংযুক্ত বর্ণে; তৎসম তদ্ভব ও বিদেশি শব্দে সর্বত্রই। যেমন: সূর্য্য, মন্দ ফন্দ, কর্জ ইত্যাদি।

৪.৩ সাধু ভাষার ক্রিয়া-পদে। যেমন: রহিয়াছ, করিয়াছ, বলিব, করিব ইত্যাদি।

৪.৪ যেন, কেন, যত, তত, এত, কত এই কয়টি অত্যন্ত প্রচলিত শব্দে উচ্চারণ-অনুসারে যেনো, কোনো, যতো, ততো, এতো, কতো লেখা উচিত; কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কারে সইবে কি না সন্দেহ। তবে

ও-কার চালিয়ে দিতে পারলেই ভালো হয়।

৪.৫ অন্ত ঃ (বিসর্গ) যেখানে লোপ হয়েছে সেখানে আপাতত শুধু অ-কার দিয়েই চালাতে হবে। যেমন: আপাতত, বিশেষত, সাধারণত ইত্যাদি। তাতে কিছু অসুবিধা আছে।

৪.৬ অ-উচ্চারণ দেখবার জন্য একটা বিশেষ চিহ্ন দরকার। ইলেক-চিহ্নকে এই কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে (৩.২)-এর সঙ্গে অসঙ্গতি দোষ ঘটবে। (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

৫. অ-এর ও ধ্বনি

৫.১ মধ্যস্থিত অ-এর ও ধ্বনি ইলেক দিয়ে দেখানো হবে। কিন্তু (৩.২) ও (৩.৪) দ্রষ্টব্য।

.৫.২ সাধু ও চলতি ভাষা দুয়েতেই তদ্ভব শব্দে যেখানে অন্ত্য অ-এর ও উচ্চারণ হয়, সেখানে ও-কার দেওয়া হবে। ভালো, কালো, যতো, ছোটো, বড়ো, কখনো, যখনো, এখনো, আরো, বারো, তেরো, চোদ্দো (কিন্তু চৌদ্দ), পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো, পুরানো ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: যেন, কেন, যত, কত, এত এই সব শব্দে ও-কার চলে কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে (৪.৪) দ্রষ্টব্য।

৫.৩ সাধু ও চলতি ভাষায় 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ও-কার দেওয়া হবে। যেমন: করানো, বলানো, পড়ানো, দেখানো ইত্যাদি।

৫.৪ সাধু ভাষায় বিকল্পে ও চলিত ভাষায় সাধারণত দ্বিত্ব শব্দে ও-কার ব্যবহার হতে পারে। যেমন: কাঁদো-কাঁদো, পড়ো-পড়ো, নিবো-নিবো। ৩.২.৩ দ্রষ্টব্য।

৫.৫ চলতি ভাষার ক্রিয়ার শেষে সাধারণ ও-কার ব্যবহার হবে। যেমন: ডাকো, (ডাকিও), থেকো (থাকিও); এলো, বললো, করলো, রয়েছো, বলেছে ইত্যাদি। (৩.২-৩) দ্রষ্টব্য।

৬. ই-ঈ-কার ব্যবহার

৬.১ সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই ইনপ্রত্যয়ান্ত শব্দে বাঙলা বিভক্তি যুক্ত হলেও ঈ-কার লেখা হবে। যেমন: গুণীকে, ধনীকে, মন্ত্রীকে, রোগীদের ইত্যাদি। (১.১ দ্রষ্টব্য)।

৬.২ সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই প্রশ্নসূচক অব্যয় কি (হ্রস্ব) ই-কার দিয়ে লেখা হবে। নির্দেশক সর্বনাম কী (দীর্ঘ) ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন: তুমি কি খাবে? (অব্যয়); তুমি কী খাবে? (সর্বনাম); তুমি কী কী খাবে? (সর্বনাম)।

৭. উ-কার ব্যবহার

তদ্ভব শব্দে সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই (অ) উ-কার লেখাই ভালো; ঔ-কার যতদূর সম্ভব কম ব্যবহার হবে। যেমন: বউ, লাউ, মউ ইত্যাদি। কিন্তু সমস্ত শব্দে বিকল্পে ৌ-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: বৌঠাকুরানী, চৌঘুড়ী, মৌমাছি, চৌধুরী ইত্যাদি।

৮. ে-কার ও ৈ-কার ব্যবহার

৮.১ চলতি ভাষায় সকর্মক ক্রিয়ায় অতীতে বিকল্প ে-কার লেখা হবে। যেমন: কাঁদলে, করলে, বললে ইত্যাদি।

অকর্মক ক্রিয়ায় ে-কার চলে না; সর্বত্র ও-কার কিংবা ইলেক ব্যবহার করতে হবে। যেমন: কাঁদলো, হলো, গেলো ইত্যাদি।

৮.২ চলতি ভাষায় অতীত ক্রিয়ায় বিকল্পে, যেমন: করতেম, করলেম,বলতেম ইত্যাদি।

৮.৩ সাধু ও চলতি দুই ভাষাতেই এ্যা উচ্চারণে সর্বত্র ে-কার ব্যবহার হবে। যেমন: দেখা, খেলা, ফেলা, মেলা, যেন, কেন ইত্যাদি।

৯. ও-কার ব্যবহার

ও-ধ্বনি যতদূর সম্ভব ো কার দিয়ে লেখাই সহজ। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের খাতিরে মধ্যস্থিত অ-কারের ও ধ্বনি ইলেক-চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করতে হচ্ছে। (৩) দ্রষ্টব্য।

৯.১ সাধু ও চলতি ভাষা এই দুয়েতেই [মোতি, গোরু, কোলু এবং বিকল্পে নোতুন] এই কয়টি তদ্ভব শব্দে ও-কার লেখা হবে।

৯.২ (কোনো) আর (কোনও) এই দুয়ের মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আবশ্যক-মতো কোনও, কখনও, আজও, তখনও ইত্যাদি লেখা হবে।

৯.৩ করিয়ো, নিয়ো প্রভৃতি শব্দে "য়ো" লেখাই আপাতত চলবে।

১০. ব্যঞ্জনবর্ণ

১০.১ সাধুভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই [যান, বানান, পান, সোনা] এই শব্দগুলি দন্ত্য-ন দিয়ে লেখা হবে। দন্ত্য-ন বাঙলা উচ্চারণ আর বাঙলা বানান এই দুয়েরই অনুমোদিত।

১০.২ সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই "আছ" ধাতুর বিকৃতিরূপে সর্বত্র "ছ" ব্যবহার করা হবে; "চ" লেখা হবে না। যেমন: ক'রেছো, লিখেছো, ব'লেছো ইত্যাদি।

১০.৩ সাধু ভাষা ও চলতি ভাষা দুয়েতেই বিদেশি শব্দে মূলরূপ-অনুসারে তালব্য-শ ব্যবহার করা হবে। যেমন: শহর, শেক্সপিয়র, শেলি, শাজাহান, হামেশা, মশলা ইত্যাদি। কিন্তু (সরম) শব্দটিতে প্রচলিত বানান অনুযায়ী দন্ত্য 'স' লেখাই চ'লবে।

১১. স্বরাণুক্রম

চলতি ভাষায় উচ্চারণ অনুসারে স্বরাণুক্রম (vocalic harmony) চলবে। যেমন: একটা, দুটো, তিনটে, বিলিতী, দেশী, পূজো, জুয়ো, ধুনুরী, খুড়ো, বুড়ো, শুখো, ফিতে, হিসেবে ইত্যাদি।

৫.৫. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি

হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরচিহ্ন

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে যেখানে হ্রস্ব ই উ/ি কার এবং দীর্ঘ ঈ ঊ/ী-কার, ঊকার দুটি রূপই প্রচলিত ও গৃহীত সেখানে হ্রস্ব বিকল্পটিই গ্রহণ করা হয়েছে। অঙ্গুরী- অঙ্গুরি, অন্তরিক্ষ-অন্তরীক্ষ, কুটির-কুটীর, ঊর্ণনাভ- উর্ণনাভ, ভ্রু-ভ্রূ ইত্যাদি উদাহরণ যুগ্মকের প্রথম বিকল্পটি একটিমাত্র রূপে লেখা হয়েছে। হ্রস্ব বিকল্প না থাকলে তৎসম শব্দের বানানে দীর্ঘ স্বরচিহ্নই লিখতে হবে।

সংস্কৃত ইন্‌-প্রত্যায়ান্ত শব্দগুলি (অধিকারিন, গুণিন্‌, জ্ঞানিন্‌, শশিন্‌ সহযোগিন ইত্যাদি) কর্তৃকারকের একবচনে দীর্ঘ ঈ-কারান্ত হয় এবং এই দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপেই এগুলি বাংলায় পরিচিত। (অধিকারী, গুণী, জ্ঞানী, শশী, সহযোগী ইত্যাদি) সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে সমাসবদ্ধ কিংবা প্রত্যয়যুক্ত হলে এই সব শব্দের দীর্ঘ-ঈ-কার আবার হ্রস্ব-ইকারে ফিরে যায়। যেমন, গুণিজন, শশিভূষণ বা সহযোগিতা ইত্যাদি। কিন্তু বাংলা বানান ব্যবহারে এই নিয়মের প্রচুর ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, আগামীকাল, পরবর্তীকাল, প্রাণীবিদ্যা, হস্তীদল। তাই স্থির হয়েছে, সমাসবদ্ধ শব্দের ক্ষেত্রে সংস্কৃত মূল শব্দটিকে দীর্ঘ-ঈ-কারান্ত 'বাংলা' শব্দ ধরে নিয়ে সমাস হলেই তার দীর্ঘ ঈ-কারের ব্যত্যয় ঘটানো চলবে না। তাই আগামীকাল, মন্ত্রীগণ, মন্ত্রীসভা, শশীভূষণ রূপই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হোক। তবে তৎসম ত্ব ও তা প্রত্যয় যোগ করা হলে এই সব শব্দের হ্রস্ব-ই-কারান্ত (অর্থাৎ ইনএর ন লোপের পর যা থাকে) মূল প্রাতিপাদিক রূপেই লেখা হবে। যেমন— প্রতিদ্বন্দিতা, প্রতিযোগিতা, মন্ত্রিত্ব, স্থায়িত্ব ইত্যাদি। লিঙ্গান্তরের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম পালিত হবে, যেমন— প্রতিদ্বন্দ্বিনী, প্রতিযোগিনী। অবশ্য অতৎসম প্রত্যয়ের বেলায় এ বিধি প্রযোজ্য নয়। যেমন— মন্ত্রীগিরি।

কোনো কোনো তৎসম শব্দকে বাংলা-ই প্রত্যয় যুক্ত করে বিশেষণে পরিণত করা হয়। যেমন— মধ্যপ্রদেশি, দক্ষিণি, প্রণামি, রামপ্রসাদি, স্বদেশি, হিন্দুস্থানি। কিন্তু এই প্রত্যয় অর্থ ও প্রয়োগগত দিক থেকে সংস্কৃত 'ইন', বা 'বিণ' প্রত্যয়ের সমান নয়। বিশেষ্যে পরিণত করার জন্য লিঙ্গান্তরের সময় বাংলা নি প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। যেমন- বয়সিনি, বিদেশিনি।

পূর্ববর্তী নয় পরবর্তী অর্থে সংস্কৃতে-চি প্রত্যয় যুক্ত হলে প্রত্যয় পূর্ব শব্দের সঙ্গে ঈ-কার যুক্ত হয়। যেমন- সমীকরণ, বশীকরণ প্রভৃতি। পূর্বপদের হ্রস্ব-'উ'-কার দীর্ঘ- 'ঊ'কারেও পরিণত হয়। যেমন- লঘুকরণ।

তবে প্রচলিত বর্তমান বাংলায় এই রীতি সবসময় অনুসৃত হয় না। এই ধরনের নতুন শব্দের জন্য নানা বিকল্প পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের রক্ষা / বর্জন :

বাংলা তৎসম শব্দের শেষে বিসর্গের উচ্চারণ প্রায় হয় না বলে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা মুদ্রিত শব্দে অন্তবিসর্গের ব্যবহার হয় না।

এখানে তসবা শমপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিতে অন্ত্যবিসর্গের প্রয়োগ প্রচলিত (কিন্তু কালক্রমে বর্জিত হতে দেখা যাচ্ছে), সেগুলিতে এখন আর বিসর্গ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ফলে অন্ততঃ প্রথমতঃ ফলতঃ বস্তুতঃ ক্রমশঃ প্রায়শঃ নয়, লেখা হোক, অন্তত প্রথমত ফলত বস্তুত ক্রমশ প্রায়শ।

বিসর্গসন্ধিযুক্ত পদেও অন্ত্যবিসর্গ বর্জিত হোক। যেমন, ইতঃ + ততঃ = ইতস্তত (ইতস্ততঃ নয়), অহঃ+অহঃ = অহরহ ইত্যাদি। কিন্তু সন্ধিতে যেখানে পদমধ্যে বিসর্গ রক্ষিত থাকে সেখানে পদমধ্যস্থ বিসর্গ লিখতে হবে। যেমন, অতঃ+পর = অতঃপর, মনঃ+পূত = মনঃপূত ইত্যাদি।

বিসর্গসন্ধিজাত ও-কারের প্রচলিত ও দীর্ঘকাল গৃহীত রূপগুলি লক্ষণীয়। যেমন— অকুতোভয়,

ততোধিক, বয়োজ্যেষ্ঠ, মনোযোগ, মনোরঞ্জন, মনোরম।

'চক্ষু' শব্দটিকে বাংলা শব্দ ধরে নিয়ে সমাসে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী 'চক্ষুঃরোগ'-এর পরিবর্তে 'চক্ষুরোগ' বানানই বিধেয়।

দুঃস্থ নিঃস্তব্ধ নিঃস্পৃহ বয়ঃস্থ মনঃস্থ ইত্যাদি শব্দের ব্যাকরণসম্মত বিকল্প রূপ প্রচলিত আছে। দুস্থ নিস্তব্ধ নিস্পৃহ বয়স্থ, মনস্থ- বিসর্গহীন এই বিকল্প রূপগুলিই ব্যবহার্য।

হসচিহ্নের সমস্যা:

পদের শেষে হসচিহ্নের ব্যবহার বাহুল্যসূচক বিবেচনায় এইসব ক্ষেত্রে পদান্ত হসবর্জনীয়: আশিম, দিক, ধিক, পরিষদ, বণিক, বিরাট, বিষয়ক, সভাসদ, সম্রাট ইত্যাদি।

তদ্ধিত মতুপ্ প্রত্যয়ের হসন্ত মান আর কৃৎ শানচ্ প্রত্যয়ের হসচিহ্নহীন মান নিয়ে বিভ্রমের অবকাশ থাকলেও উভয় ক্ষেত্রেই হস্‌বিহীন মান ব্যবহৃত হোক। যেমন, রুচিমান শক্তিমান শ্রীমান সংস্কৃতিমান এবং ঘটমান ধাবমান বর্তমান ম্রিয়মান ইত্যাদি। অনুরূপভাবে বতুপপ্রত্যয়জাত বান্‌ও বান্‌রূপে লেখা হোক: জ্ঞানবান ধনবান ভগবান।

তবে সংস্কৃত সন্ধিজাত শব্দে পূর্বপদের শেষে হসচিহ্ন থাকবে। যেমন, দিগ্‌ভ্রান্ত, পৃথককরণ, প্রাগজ্যোতিষ বাগসিদ্ধ, বাগধারা।

'ষড়যন্ত্র' শব্দটি অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। একই রকম উদাহরণ ষডদর্শন ষড়দর্শন, ষডরিপু ষড়রিপু রূপে প্রচলিত।

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব:

রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্রই বর্জনীয়। দ্বিত্বহীন এই রেফযুক্ত শব্দগুলির বানান লক্ষণীয়— অর্চনা অর্জন আর্য ঊর্ধ কর্ম চর্চা তুর্য পূর্ব বর্জন ভট্টাচার্য মূর্ছনা সূর্য হার্দিক ইত্যাদি তো বটেই, এমনকি কৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কার্তিক বা বৃদ্ধ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বার্ধক্য-তেও যথাক্রমে ত ও ধ-এর দ্বিত্ব অপ্রয়োজনীয়।

রেফের নীচে যয > র্য্য হবে কিন্তু র্ঘ্য (র্ঘ+য), র্ত্য (র্ত+য), দর্ঘ্য (র্দ+য)-এর ক্ষেত্রে য-ফলা আলাদা ব্যঞ্জন। ফলে সেটির বর্জন হবে না। যেমন- অর্ঘ্য, হার্দ্য প্রভৃতি।

ঙ আর ং :

ঙ আর ং দুটোই যে বানানে (সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে) শুদ্ধ, সেখানে শুধু ং-ই ব্যবহার্য। যেমন, অহঙ্কার/ অহংকার (> অহম কার), সঙ্গীত/সংগীত (> সম+গীত), প্রভৃতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বানানটিই গ্রহণীয়।

কিন্তু যেসব শব্দে ম-এর সন্ধি পরিণাম হিসেবে আসেনি, সেখানে ং ব্যবহার করা চলবে না। তাই অংক নয়, অঙ্ক (> অন্‌ক + অল্); বংগ নয় বঙ্গ, শংকা নয় শঙ্কা, সংগে নয় সঙ্গে।

আবার সন্ধির নিয়মে যেহেতু ম্-এর পরে বর্গীয় ব থাকলে তা মই থাকবে (ং হবে না), কিন্তু ম্-এর

পরে অন্তঃস্থ ব থাকলে তবেই সেটা ং হবে,/ সে-কারণে 'কিংবদন্তী, কিংবা প্রিয়ংবদা, সংবাদ, তেমনই সম্বন্ধ, সম্বুদ্ধ, সম্বোধি'।

কী/কি:

'কী'-র অর্থগত তাৎপর্য কখনো কর্মবাচক সর্বনাম কখনো প্রশ্নমূলক সর্বনাম, কখনো বিশেষণের বিশেষণ। যেমন- 'বা কী চমৎকার।' একই সঙ্গে সমজাতীয় ব্যাকরণের সূত্রে কীসে এবং কীসের দীর্ঘ-ঈ-কার লেখার প্রবণতাও বাড়ছে।

যে প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' হবে সেক্ষেত্রেই শুধু হ্রস্ব-ইকার যুক্ত 'কি' ব্যবহৃত হবে। যেমন 'তুমি কি বইটা দেখেছ?'

হ্রস্ব উ-কার, দীর্ঘ-উকার প্রয়োগ:

অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে হ্রস্ব উ-কারের ব্যবহার প্রচলিত। সুতরাং 'ধূলো', পূজো' প্রভৃতি শব্দের বানান 'ধুলো', 'পুজো'ই লিখতে হবে।

দীর্ঘ-ঊ-কার যুক্ত তৎসম শব্দে বাংলা প্রত্যয় বা শব্দ যুক্ত হলেও বোঝবার সুবিধার জন্য মূল শব্দের দীর্ঘ-ঊকারই বজায় রাখতে হবে। যেমন- 'মূর্খামি', পূজারি'।

তবে অর্ধ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে আবার দীর্ঘ-ঊকার বদলে হ্রস্ব-উ-কারই গৃহীত হবে। যেমন— উনতিরিশ, উনচল্লিশ প্রভৃতি।

ও-কার:

'ও' ধ্বনির উচ্চারণ বোঝানোর জন্য শব্দের বানানে ও-কার থাকবে। যেমন- 'ছোটো, 'খাটো', 'কালো' ইত্যাদি।

too অর্থে 'ও' অর্থাৎ সহযোগমূলক প্রত্যয় রূপে- 'ও'কে একইভাবে লেখা উচিত। যেমন- 'আজো', 'এখনো', 'তোমারো' না লিখে 'আজও' 'এখনও', 'তোমারও' লেখা দরকার।

ঙ বনাম ঙ্গ :

কিছু কিছু শব্দে ঙ এবং ঙ্গ দুই বানানই প্রচলিত। যেমন ভাঙা-ভাঙ্গা, বাঙালি-বাঙ্গালি। এসব ক্ষেত্রে মান্য উচ্চারণের ভিত্তিতে ঙ-বানানই লেখা হোক: কাঙাল, গোঙানি, ডাঙা, ডিঙি, ঢ্যাঙা, ধাঙড়, নোঙর, বাঙালি, ভাঙন, ভাঙা, রঙিন, রাঙা, লাঙল।

তবে যেখানে সাধারণত ঙ্গ উচ্চারণ হয়, সেখানে গ্-যুক্ত ঙ্গ-ই লিখতে হবে, যেমন জঙ্গল জঙ্গি লুঙ্গি হাঙ্গামা।

জ এবং য :

অ-তৎসম শব্দে মূল শব্দটির কথা স্মরণ করে দ্রুত অর্থবোধের সহায়ক বলে য-এর বদলে জ ব্যবহার করবার ব্যাপারে এইসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম থাকছে: যখন যত যন্তর যবে যাওয়া যিনি যে ইত্যাদি।

প্রচলিত কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য য-এর বদলে জ হবে। যেমন— কাজ, জাঁতা, জুঁই, জুতসই, জো, জোগাড় জোড়া জোয়াল।

ণ এবং ন :

সংস্কৃত ণত্ব-বিধান কেবল তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই এ ধরনের শব্দে দন্ত্য-ন হবে: অঘ্রান কান কোনাকুনি চুন ঝরনা ঠাকরুন দরুন ধরনা পুরোনো রানি সোনা ইত্যাদি।

অ-তৎসম শব্দেও মূর্ধন্য-বর্ণের সঙ্গে যুক্ত ন 'দন্ত্যন' গ্রাহ্য হবে। তাই প্যান্ট প্যান্টালুন লণ্ঠন ঝাণ্ডা ঠাণ্ডা লন্ডভন্ড ইত্যাদি।

পুণ্য গণ্য এসব শব্দ থেকে পুণ্যি গণ্যি হবে, তবে পুণ্য গন্যি এই রূপভেদও চলতে পারে।

য-ফলা:

কাব্য জন্য মান্যগণ্য সাধ্য সূর্য্য এই ধরনের শব্দের অতৎসম রূপ লেখা হবে কাব্যি জন্যে মান্যিগন্যি সাধ্যি সুয্যি।

আবার অ-তৎসম হিস্যা লস্যি লেখা হবে হিস্‌সি লস্‌সি। তেমনি মফঃসল হবে মফস্সল।

শ ষ স :

অ-তৎসম শব্দে প্রচলন অনুযায়ী শ-ষ-স ব্যবহৃত হবে। যেমন, ষাঁড় মোষ মাসি পিসি শরিক।

ক্ষ এবং খ :

ক্ষুদ ক্ষেত ক্ষ্যাপা ইত্যাদি শব্দে ক্ষ-এর বদলে খ ব্যবহারই সংগত। লিখতে হবে খুদ খেত খ্যাপা।

নি আর নে :

নিষেধাত্মক ও অতীতবাচক-নি বা নে-কে ক্রিয়ারূপের সঙ্গে জুড়ে লেখাই সংগত : করিনি দেখিনি শুনিনি হয়নি করিনে ভাবিনে চাইনে ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ বিষয়ে, একটু পৃথকভাবে :

বাংলা শব্দভাণ্ডারে গৃহীত বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বরচিহ্ন না দিয়ে হ্রস্ব স্বরচিহ্ন ব্যবহার করাই সংগত হবে। তাই লেখা হোক: ইগল, ইদ, ইঞ্জিনিয়ার, ইস্ট, কমিটি, কাজি, খ্রিস্টান, জানুয়ারি, ডিগ্রি, থ্রি, নবিশ, নেভি, প্লিডার, ফি, ফিরিঙ্গি, ফ্রি, বিচ, মিটিং, মিলিটারি, রেফারি, লাইব্রেরি, লেডি, সেক্রেটারি, হিজরি ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে মূর্ধন্য 'ণ' প্রযোজ্য হবে না, সর্বত্রই দন্ত্য 'ন' ব্যবহার করতে হবে: ইরান কন্ট্রাকটর কন্টোলার কর্নওয়ালিশ কার্বন কার্নিশ কোরান গভর্নর টার্মিনাল ট্রেন পরগনা লন্ডন ইত্যাদি।

st- বর্ণগুচ্ছ বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দে স্ট ব্যবহার করে লিখতে হবে ইস্ট পোস্ট পোস্টার মাস্টার স্টেশন স্টোর স্ট্রিট।

বিদেশি শব্দে শ স :

এইসব আরবি-ফারসি শব্দে স ব্যবহারই চলবে: ইসলাম তসবির ফারসি, মুসলিম, মুসলমান, সাদা, সিতারা সুলতান সোফিয়া ইত্যাদি।

আমাদের চালু অভ্যাসের মধ্যে এসে গেছে বলে এই শব্দগুলি তালব্যশ দিয়ে লেখা হোক: আপশোশ আয়েশ ওয়াশিশ তহশিল পোশাক বাদশাহি বালিশ হুঁশিয়ার ইত্যাদি। এইসব ইংরেজি শব্দের বাংলারূপে

তালব্য শ হবে: অ্যাশট্রে, নোটিশ, পালিশ, মেশিন, রাবিশ ইত্যাদি।

ইংরেজি (-এর উচ্চারণ বাংলা শব্দে বজায় থাকলে তা 'দন্ত্য স' দিয়েই লেখা হবে: কেস ক্রস নার্স নার্সারি পাস মিস সুটকেস ইত্যাদি

র-ফলা :

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঋ-কার ব্যবহার না করে র-ফলা ও ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন— খৃস্ট নয় খ্রিস্ট: বৃটিশ নয়, ব্রিটিশ।

ব্যঞ্জনপূর্ব র-রেফ :

হলন্ত র-এর পর ব্যঞ্জন থাকলে সাধারণভাবে ´রেফ হয়ে পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসবে, যেমন- উর্দি, কার্তুজ, গর্দান, তুর্কি, পর্দা, সর্দার ইত্যাদি। তবে সমাসবদ্ধ কিংবা বিদেশি উপসর্গযুক্ত কিংবা প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দে রেফ না দিয়ে মূলের 'র' বজায় রাখতে হবে: কারসাজি, খবরদার, বরকন্দাজ, হরদম ইত্যাদি।

৫.৬. আধুনিক বানানের নিয়ম-কানুন

(১) ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব: রেফ চিহ্ন-এর পরে কোথাও ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না।

যেমন: ধর্ম, পূর্ব, মূর্ত, আবর্ত, পর্যন্ত

(২) অনুস্বার (ং) ও উয়ো (ঙ):

(ক) সন্ধিতে প্রথম পদের শেষে ম্ থাকলে ক-বর্গের (ক, খ, গ, ঘ) বর্ণের পূর্বে ম্ স্থানে ং লেখা হবে। যেমন:

অহংকার, ঝংকার, ভয়ংকর, সংকলন, সংকোচ, সংগত, সংগীত, হুংকার

(খ) ওপরের নিয়মে সন্ধিজাত শব্দ না হলে, যুক্তব্যঞ্জনে ক খ গ ঘ এবং ক্ষ-র পূর্বে নাসিক্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে সর্বত্র ঙ হবে। যেমন: অঙ্ক, অঙ্গ, অঙ্গুলি, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, জঙ্গল, তরঙ্গ, পঙ্ক, বঙ্গ, সঙ্গে।

(গ) অনেক শব্দে ঈ-স্থলে আধুনিক প্রমিত ও কোমল উচ্চারণ অনুসারে শুধু ঙ লেখা হয়।

যেমন: আঙুল, চাঙা, ঠোঙা, ডিঙি, ফিঙে, বাঙালি।

(ঘ) প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন: এবং, ধ্যাং, ঢং, ব্যাং, রং, সং।

(ঙ) তবে অন্তে অনুস্বারযুক্ত শব্দে প্রত্যয় বিভক্তি বা স্বরবর্ণ যুক্ত হলে অনুস্বারের (ং) জায়গায় (ঙ) হবে।

যেমন: ঢঙে, ঢঙের, ফড়িঙের, ব্যাঙের, রঙের, রঙিন।

(৩) হসচিহ্ন ও ঊর্ধ কমা

(ক) হসচিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন: করিস, দিস, দেখলে, বলতে, যাস, লিখব

(খ) তবে উচ্চারণ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকলে প্রয়োজন মতো হস্ চিহ্ন দেওয়া যায়। যেমন: ওয়াক, বল্বাস্ ইত্যাদি।

(গ) ঊর্ধকমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: ক'রে > করে, কা'র > কার, প'ড়ে > পড়ে, হ'তে > হতে।

(৪) **হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরযুক্ত শব্দ**

(ক) যে সব শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় স্বর (ই/ঈ, উ/ঊ) অভিধানসিদ্ধ সে সব ক্ষেত্রে এবং অ-তৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর (ই, উ) প্রযুক্ত হবে।

(খ) কিছু তৎসম শব্দের বানানে হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর দুই সিদ্ধ। এসব ক্ষেত্রে শুধু হ্রস্বস্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন: অটবি, আবলি, উষা, কলশি, কুটির, ত্রুটি, পঞ্জি, পেশি, ভঙ্গি, মসি, রচনাবলি, সরণি।

(গ) তবে বহুল প্রচলিত বলে কিছু শব্দে ঈ-কার বজায় থাকবে। যেমন: রচনাবলী, ভঙ্গী, পেশী ইত্যাদি।

(ঘ) অ-তৎসম ও বিদেশি শব্দের বানানে শুধু হ্রস্বস্বর হবে। যেমন: আদমি, আমিন, আলমারি, আসমানি, কেরানি, খালাসি, খ্রিস্টাব্দ, গরিব, গ্রিক, দামি, পাখি, বগি, রাজি, লাইব্রেরি, রেফারি, শাশুড়ি, হিন্দি।

(ঙ) বহুল প্রচলিত কিছু বিদেশি শব্দে ঈ-কার বজায় আছে। যেমন: ঈদ, একাডেমী, পরী, লীগ, শহীদ।

(৫) **যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ :** ক্ষ-বিশিষ্ট সকল শব্দে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ (ক+য) অক্ষুণ্ণ থাকবে। যেমন: অক্ষম, অধ্যক্ষ, ক্ষণ, ক্ষৌর, মক্ষিকা, ক্ষেত।

(৬) **স্ত্রী বাচক শব্দের শেষে ঈ-কার**

ইনী, ঈ, ঈয়সী, বতী, বিনী, মতী, ময়ী, ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার হবে। যেমন: অধিকারিণী, দাসী , পিশাচী, প্রেয়সী , ময়ূরী, সিংহী।

(৭) ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই-কার হবে। যেমন: আরবি, জাপানি, তুর্কি, নেপালি, ফরাসি, ভুটানি।

(৮) আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষে ই-কার হবে। যেমন: ঘটকালি, চৈতালি, পুবালি, বাঙালি, সোনালি।

(৯) পদাশ্রিত নির্দেশক-টিতে ই-কার হবে। যেমন: কথাটি, ছেলেটি, ভাইটি, লোকটি।

(১০) সমোচ্চারিত শব্দে অর্থভেদ বোঝাতে প্রয়োজনে হ্রস্ব দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন: কি (অব্যয়) কী (সর্বনাম/বিশেষণ) তৈরি (ক্রিয়া) তৈরী (বিশেষণ)

(১১) (ক) কৃতঋণ বা বিদেশাগত শব্দের বানান বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতিতে লিখিত হবে। যেমন: অক্সিজেন, আমদানি, আয়েশা, আসমান, ইংলিশ, ইঞ্চি, ইরান, একাডেমী, ওয়ার্কশপ, সেশন, মজুরি, ম্যাজিস্ট্রেট, লাইব্রেরি, সালিশ, হাসপাতাল।

(খ) কয়েকটি ক্ষেত্রে ওপরের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে। যেমন: আখান, নামায, মুয়াযযিন, যাকাত, রমযান।

(গ) ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত শব্দে s ও c ধ্বনির উচ্চারণ স হলে বাংলা বানানে স

লেখা হবে। যেমন: অফিস, গ্যাস, পাস, সিট, সেশন, হাউস।

(ঘ) ইংরেজি শব্দের শেষে c, ch, s বা sh-এর উচ্চারণ শ-এর মত হলে বাংলা বানানে শ হবে। যেমন: অকশন, ইংলিশ, কমিশন, ক্যাশ, পালিশ, মেশিন, রেশন, শর্ট, শিপ, শেড, শো, সেশন।

(ঙ) ইংরেজি st ধ্বনির জন্য যুক্তবর্ণ স্ট লেখা হবে। যেমন: আর্টিস্ট, টেস্ট, পোস্টার, মাস্টার, লিস্ট, স্টোর।

(১২) ণত্ববিধি: ক-তৎসম শব্দে ণত্ববিধি ব্যবহৃত হবে এবং অ-তৎসম শব্দে ণত্ববিধি প্রযোজ্য নয়। ণত্ববিধি অনুসারে শব্দে ণ ব্যবহারের কিছু উদাহরণ: অরুণ, আণবিক, উচ্চারণ, ঋণ, কণ্ঠ, কর্ণ, ক্ষীণ, গ্রামীণ, চিকণ, তরুণ, দারুণ, প্রণয়, বিষণ্ণ, লবণ, শরণ, সারণি, স্বর্ণ, হরিণ।

(খ) তদ্ভব ও দেশি শব্দে ণত্ববিধি প্রয়োগ হবে না। যেমন: চিরুনি, ঝরনা, ধরন, শিহরন, পুরানো।

(গ) বিদেশাগত শব্দে ণত্ববিধি হবে না। যেমন: ইরান, কেরানি, কুরআন, শিরনি, হর্ন, সাইরেন।

(১৩) ষত্ববিধিঃ তৎসম শব্দে ষত্ববিধি প্রয়োগ হবে। যেমন: অদৃষ্ট, অনুষ্ঠান, অভিলাষ, আষাঢ়, ইষ্ট, ঈর্ষা, ঋষি, কৃষক, দূষণ, বিনষ্ট।

(১৪) (ক) যুক্তব্যঞ্জন গঠনে চ-বর্গের পূর্বে ঞ বসবে। যেমন: কঞ্চি, পঞ্চ, মঞ্চ, লঞ্চ, সঞ্চিত, অঞ্জন, খঞ্জ, জিঞ্জির, পাঞ্জা, প্রাঞ্জল।

(খ) যুক্ত ব্যঞ্জন গঠনে ট-বর্গের পূর্বে ণ বসে। যেমন: বণ্টন, কণ্টক, অকুণ্ঠ, গণ্ডি, ঠাণ্ডা, দণ্ড।

(গ) যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ত-বর্গের পূর্বে দন্ত্য ন বসে। যেমন: অত্যন্ত, অন্ত, একান্ত, তন্ত্র, পড়ন্ত, হসন্ত, গ্রন্থ, আনন্দ, দ্বন্দ্ব, গন্ধ।

(ঘ) যুক্তব্যঞ্জন গঠনে চ-বর্গের পূর্বে শিসধ্বনি শ বসে। যেমন: আশ্চর্য, নিশ্চল, নিশ্ছিদ্র, নিশ্চিত, নিশ্চুপ।

(ঙ) যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ট-বর্গের পূর্বে শিসধ্বনি ষ বসে। যেমন: অদৃষ্ট, অষ্ট বিশিষ্ট, স্পষ্ট, ওষ্ঠ, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠা, শ্রেষ্ঠ।

(চ) যুক্তব্যঞ্জন গঠনে ত-বর্গের পূর্বে শিসধ্বনি স বসে। যেমন: অস্ত, কুস্তি, শাস্ত্র, স্ত্রী, অস্তি, স্বাস্থ্য, স্থৈর্য।

(১৫) (ক) পদান্তে বিসর্গ চিহ্ন থাকবে না। যেমন: ক্রমশ, প্রথমত, দ্বিতীয়ত, প্রায়শ, বশত, সাধারণত।

(খ) তবে পদের মধ্যের বিসর্গ থাকবে। যেমন: অতঃপর, দুঃশাসন, প্রাতঃকাল, নিঃসম্বল, স্বতঃস্ফূর্ত

(১৬) পদান্তে ও-কার

(ক) ক্রিয়াপদের বানানে পদান্তে ও-কার অপরিহার্য নয়। যেমন: আনব, খেলত, চলব, বলত, লিখত, লিখব।

(খ) তবে বর্তমান অনুজ্ঞার সামান্যরূপে পদান্তে ও-কার দেওয়া বিধেয়। যেমন: আনো, খেলো,

দেখো, পড়ো, বলো, লেখো।

(১৭) সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: অর্থব্যয়, অস্থিরচিত্ত, ভাইবোন, সহজসাধ্য, হিসাবরক্ষক।

৫.৭. অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি অনুসারে কোথায় 'কী' আর কোথায় 'কি' বসে?

২) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি অনুসারে সঠিক বানানটি চিহ্নিত করুন- খ্রিস্ট/খৃস্ট, বৃটিশ/ব্রিটিশ।

৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (তৃতীয় সংস্করণ) কত সালে প্রকাশিত হয়?

৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধি অনুসারে কোথায় 'হস চিহ্ন বিধেয়?

৫) কোন বানান বিধিতে ইলেক চিহ্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়?

৬) আধুনিক বানানের নিয়মানুসারে ভাষা ও জাতির নামের শেষে 'ই' না 'ঈ'-কার ব্যবহার করা উচিত?

৭) আধুনিক বানানের নিয়মানুসারে কোন কোন শব্দের বানানে ণত্ববিধির প্রয়োগ হবে না?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি অনুসারে বিসর্গ চিহ্ন কোথায় কোথায় রক্ষিত ও বর্জিত হয় তা উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

২) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি অনুসারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরচিহ্নের প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩) টীকা রচনা করুন: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার

৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান বিধি অনুসারে নবাগত ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশি শব্দের বানান সংক্রান্ত নিয়মগুলি আলোচনা করুন।

৫) বিশ্বভারতীর বানান বিধি অনুসারে কোথায় কোথায় ইলেক চিহ্নের ব্যবহার করা উচিত?

৬) আধুনিক বানানের নিয়মানুসারে বাংলা বানানে 'ঙ' এবং 'ং'-এর প্রয়োগ কেমনভাবে করা উচিত— উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

বিস্তারিত প্রশ্ন

১) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বানান বিধি অনুসারে সংক্ষেপে বানান প্রয়োগের নিয়মগুলি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রবর্তিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' (তৃতীয় সংস্করণ)-এর বাংলা বানান সংক্রান্ত নিয়মগুলি উদাহরণ সহযোগে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) বিশ্বভারতী প্রবর্তিত বাংলা বানান বিধিগুলি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪) বানান বিধির সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কোন কোন নিয়মগুলি আমরা আধুনিক যুগে ব্যবহার করি — তা উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরুন।

একক ৬ : বাংলা পরিভাষা

৬.১. উদ্দেশ্য
৬.২. প্রস্তাবনা
৬.৩. পরিভাষা কী ও কেন?
৬.৪. পরিভাষা নির্মাণের শর্ত
৬.৫. পারিভাষিক শব্দ ও তার প্রয়োগবিধি
৬.৬. বাংলা পরিভাষা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা
৬.৭. বাংলা পরিভাষার তালিকা (প্রশাসনিক)
৬.৮. অনুশীলনী
৬.৯. গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

আজকের দৈনন্দিন জীবনে আমরা না-জেনে হলেও পদে পদে পরিভাষা ব্যবহার করে থাকি। পরিভাষা চর্চা ভাষাচর্চার অংশবিশেষ আর পরিভাষার সমস্যা তাই ভাষা-সমস্যার অন্তর্গত একটি বিষয়। পরিভাষার সঙ্গে মানুষের উপলব্ধি ও চেতনা ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন। তাই অধুনা আমরা ভাষা ও পরিভাষা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছি। বাংলা বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও একটি প্রধান সমস্যা পরিভাষার অভাব ও স্বল্পতা। বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের পরিভাষার স্বল্পতা আমাদের এখনও ভাবায়। কাজেই নতুন নতুন পরিভাষা রচনার প্রয়োজন সবসময়ই থাকে। কিন্তু পরিভাষা নির্মাণের কিছু রীতিনীতি রয়েছে। সেই নিয়মকানুনগুলি না জেনে আমরা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে করতে পারিনা। বর্তমান এককটি মন দিয়ে পাঠ করলে আপনারা বাংলা পরিভাষা নির্মাণের কলা-কৌশল বিষয়ে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। পাশাপাশি এই এককটি পাঠ করলে আপনারা বাংলা পরিভাষা চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা লাভ করবেন। পরিশেষে বাংলা পরিভাষার একটি তালিকা সংযুক্ত থাকবে যা আপনাদের দৈনন্দিন জীবনে সঠিক বাংলা পরিভাষার প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করবে।

৬.২. প্রস্তাবনা

ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির পর থেকে নিত্যনতুন শব্দ যেমন ভাষায় প্রবেশ করেছে, ঠিক সেভাবে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পরিভাষা। সমাজভাষা-বিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হিসেবে 'পরিভাষা' দীর্ঘ সময়পর্ব ধরে ভাষাতাত্ত্বিক মহলে একটি গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে, যার অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায় পরিভাষা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনা ও সমস্যা। বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে পরিভাষার একটা স্বতন্ত্র সমস্যা রয়েছে। বাঙলায় প্রকৃতপক্ষে 'পারিভাষিক শব্দ' নয়, 'পারিভাষিক প্রতিশব্দ' সৃষ্টিই

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

হ'লো যথার্থ বিষয়। কারণ আমরা জানি, একালে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাগ্রসর জাতি বলে পাশ্চাত্য জগতেরই একাধিপত্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎ কিংবা ভাবের জগৎ-সর্বত্রই তারা উত্তমর্ণ। তাদের আহৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানভাবের বিষয়কে আমরা অধমর্ণ-রূপেই গ্রহণ করছি। কিন্তু নিত্যনতুন আবিষ্ক্রিয়াকে তারা তাদের ভাষায় যেভাবে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ ক'রে যাচ্ছেন, তাদের বাঙলায় ভাষান্তরিত করতে গিয়ে আমরা কিন্তু অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। কেননা, আমাদের ভাষায় সেরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী যথেষ্ট শব্দসম্পদ নেই। অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় নবাবিষ্কৃত বিষয়, বস্তু বা ভাবের যে পরিভাষা (Technical term) সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই পরিভাষার যথার্থ প্রতিশব্দই আমাদের বিড়ম্বনার কারণ। কিন্তু একথাও স্বীকার করতে হবে যে, একটি মান্য পরিভাষা সর্বস্তরে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। নাহলে একই শব্দের একাধিক পরিভাষা ব্যবহৃত হতে থাকবে। তার ফলে সৃষ্টি হবে বিশৃঙ্খলার। এখন অনেক সময়ই দেখা যাচ্ছে যে, ছাত্রপাঠ্য বিজ্ঞানের বইয়ে যে পরিভাষা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের গৃহীত পরিভাষার সঙ্গে মেলে না। এই অবস্থা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত বানান বা পরিভাষার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা থাকত। (১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি বানান সংস্কারের পাশাপাশি বিবিধ বিষয়ের পরিভাষা রচনা ও সংকলন করেছিলেন।) এখন তা আর নেই। এখন এমন কোনো সংস্থা নেই যার দেখানো পথে সকলেই চলবে। এ বিষয়ে সর্বস্তরে ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন।

৬.৩. পরিভাষা কী ও কেন?

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগৎ এবং ভাবের জগতে বিস্তর উন্নতি সাধিত হয়ে চলছে এবং সেই সঙ্গে নিত্যনতুন বস্তু, বিষয় ও ভাব আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে। তাদের পরিচিতির জন্য যথোপযুক্ত সংজ্ঞা বা অভিধার প্রয়োজন। একই বস্তুকে যদি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, তবে বস্তুর পরিচিতি নিয়ে অচিরেই সমস্যার উদ্ভব ঘটবে। এইজন্যই বস্তুটির এমন একটি পরিচায়ক নাম আবশ্যক, যা অপর সকলেও মেনে নেবে। এইভাবেই বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ বা পরিভাষা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সাধারণত বস্তু বা ভাবের প্রথম যিনি স্রষ্টা বা আবিষ্কর্তা তিনিই তার একটা যোগ্য নাম নির্বাচন করে থাকেন, কখনও বা পরবর্তীকালে কোনো সুধী ব্যক্তি কিংবা সংসদ বা পর্ষদ সেই বস্তু বা ভাবের একটা যথোচিত পারিভাষিক নাম স্থির করেন, যা অন্য সকলে মেনে নিতে পারে। কখনও কখনও বিষয় বা ভাবের নামের সঙ্গে তার অর্থগত সাদৃশ্য থাকতে পারে অর্থাৎ ব্যুৎপত্তি বিচারে পরিভাষাটি সার্থকনামা হতে পারে, আবার অনেক সময় ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় পরিভাষা।

এখন প্রশ্ন পরিভাষা বলা হয় কাকে? আমরা বিশিষ্ট কয়েকজন পরিভাষা-চিন্তকের মতামত এই প্রসঙ্গে তুলে ধরছি—

ক) রাজশেখর বসু তাঁর 'লঘুগুরু' গ্রন্থের 'ভাষা ও সংকেত' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "ভাষা একটা নমনীয় পদার্থ, তাঁকে টেনে বাঁকিয়ে চটকে আমরা নানা কাজে লাগাই। কিন্তু এরকম জিনিসে কোনও পাকা কাজ হয় না, মাঝে মাঝে শক্ত খুঁটির দরকার, তাই পরিভাষার উদ্ভব হয়েছে। পরিভাষা সুদৃঢ় সুনির্দিষ্ট শব্দ, তার অর্থের সংকোচ নেই, প্রসার নেই। আলংকারিকের কথায় বলা যেতে পারে পরিভাষার অভিধা শক্তি আছে; কিন্তু ব্যঞ্জনা আর লক্ষণার বালাই নেই। পরিভাষা মিশিয়ে ভাষাকে সংহত না করলে বিজ্ঞানী তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না।"

এই অভিধাশক্তি বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আসলে শব্দের তিনটি শক্তি আছে: অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা। শব্দের যে শক্তিতে তার মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রতীত হয়, তা-ই অভিধা শক্তি।

(খ) রাজশেখর বসু তাঁর 'লঘুগুরু' গ্রন্থের 'বাংলা পরিভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন-

> "অভিধানে 'পরিভাষা'র অর্থ সংক্ষেপার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনও বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তা পরিভাষা। যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসঙ্গ বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষা স্থানীয়। সাধারণতঃ 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না"।

অর্থাৎ, সুনির্দিষ্ট সংক্ষেপার্থ সংশয়মুক্ত শব্দ-ই হল পরিভাষা।

(গ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের 'ভারতীয় পরিভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন, -

> "পরিভাষা মানেই হচ্ছে শব্দের সর্বজনস্বীকৃত বিশিষ্টার্থ প্রয়োগ।......পরিভাষা হবে ভাষার স্বকীয় প্রকৃতির অনুগত, সর্বজনগ্রাহ্য এবং যতটুকু সম্ভব আড়ষ্টতাহীন-পরিভাষার ব্যাপারে এই হল স্বাভাবিকতা, এবং এই স্বাভাবিকতাকে বজায় রেখে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দের বিশেষ-অর্থবাচক হয়ে ওঠা পরিভাষার লক্ষ্য"।

অতএব পরিভাষার চার বৈশিষ্ট্য-সর্বজনস্বীকৃতি, স্বাভাবিকতা, বিশিষ্টার্থপ্রয়োগ, আড়ষ্টতাহীনতা—এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

তবে, আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানীরা পরিভাষা (Terminology, Technical terms) সম্পর্কিত আলোচনায় এই বক্তব্য কিছুটা অন্যভাবে বলেছেন। তাঁদের মতে, পরিভাষা কোনো জ্ঞানক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারণার সংজ্ঞা বা নাম। পরিভাষা-পরিকল্পনা ও নির্মাণের জন্য প্রয়োজন সমন্বয় (coordination) ও সম্মতি (agreement)। একালের ভাষাবিজ্ঞানীরা পরিভাষা নির্মাণকে ভাষিক সৃজনশীলতার অন্যতম অভিব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করেছেন। নতুন শব্দনির্মাণের প্রবণতা সব সমাজেই দেখা যায় এবং সে বিষয়ে সামর্থ্যেরও অভাব ঘটে না। নতুন শব্দ তথা পরিভাষা নির্মাণের চারটি উপায় ভাষাবিজ্ঞানীরা নির্দেশ করেছেন, -

(ক) পূর্বব্যবহৃত শব্দ ও শব্দাংশ জুড়ে।

(খ) পূর্বব্যবহৃত শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে।

(ঘ) অন্য ভাষাসমূহ থেকে শব্দ ধার করে।

(ঘ) সোজাসুজি নতুন শব্দ নির্মাণ করে।

যে কোনো ভাষায় পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতি হতে পারে তিনটি- ১. ঋণ, ২. ঋণ অনুবাদ ও ৩. নির্মাণ।

১. ঋণ: কোনো ভাষা উন্নত কিনা তা জানা যায় তার অসামান্য ঋণপটুতা থেকে। অন্য ভাষা থেকে শব্দগ্রহণ ও স্বীকরণে ভাষার সামর্থ্যের উপর সেই নির্দিষ্ট ভাষার সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। যন্ত্রসভ্যতা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আন্তর্জাতিক পরিভাষার ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণে কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। অর্থাৎ যে সব পাশ্চাত্য উৎস থেকে আমরা ভাবনা ও প্রেরণা সংগ্রহ করেছি, সেই উৎস থেকেই পরিভাষা গ্রহণ করা উচিত। আমরা তা করেও থাকি। যেমন— অতিপ্রচলিত ঋণলব্ধ শব্দ: মেল ট্রেন, চ্যারিটি ম্যাচ, কেয়ার, প্লেন, প্রোমোশন, লোডশেডিড রেল ইআর্ড, ম্যাটিনি, বাস, স্টেশন, আপ ডাউন— এগুলিকে অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করা উচিত।

২. ঋণ-অনুবাদ: ঋণ অনুবাদের কাজে অন্যান্য ভারতীয় ভাষার কাছে আমরা হাত পাততে পারি। যেমন, অসমীয়াতে notice = জাননী, up = উজান, down = ভাঁটি; কন্নড়ে exicutive = কার্যাঙ্গ, judiciay = ন্যায়াঙ্গ।

৩. নির্মাণ: বাংলা ভাষায় মূলত চারটি উৎস থেকে শব্দ আর ভাবনা এসেছে— দেশি, সংস্কৃত, আরবি-ফার্সি-হিন্দুস্থানী আর ইংরেজি। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাদান মিশিয়ে পারিভাষিক শব্দ তৈরি করা যায়। এই নির্মাণের রীতি মূলত চার রকম— ফ্রেজ, সমাস, প্রত্যয় ও থাকবদল।

অনেকসময় পরিভাষাধর্মী ফ্রেজ পারিভাষিক শব্দের কাজ করে। যেমন, 'অন্ধপ্রক্ষেপ' না বলে 'আঁধারে ঝাঁপ'। এর পাশাপাশি সমাসের প্রয়োগ করে বাংলায় পরিভাষা তৈরি করা যেতে পারে। যেমন, 'বিলেতফেরত', 'নাচঘর', 'ছেলেধরা' প্রভৃতি। আবার প্রত্যয়ের (Suffix & prefix) প্রয়োগেও পরিভাষা নির্মাণ সম্ভব। যেমন: 'অতিমানব', 'বেটাইম', 'অর্ধশিক্ষিত' প্রভৃতি। থাক-বদল হল সেই প্রক্রিয়া যেখানে ক্রিয়াপদ হয়ে যায় বিশেষ্য, বিশেষ্য হয়ে যায় বিশেষণ ইত্যাদি। যেমন: 'শয়তান ছেলে', 'কাপ্তেন লোক'।

৬.৪. পরিভাষা নির্মাণের শর্ত

১. ইংরেজি শব্দটির সমান অর্থ প্রকাশক বাংলা শব্দ গ্রহণ করতে হবে। যেমন ইংরেজি 'Diabetes' শব্দটির উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ 'মধুমেহ'। পরিভাষিক শব্দটিতে মূল শব্দের ভাব ব্যঞ্জনা যথাযথ ভাবে ফুটে ওঠা চাই। যথার্থ পরিভাষার উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে - Coalition Government = মিলিজুলি সরকার, Jam = যানজট, Project = প্রকল্প ইত্যাদি।

২. বাংলা পরিভাষাটি যদি যথার্থ অর্থ প্রকাশক হয়েও দুরুচ্চার্য বা জটিল অথবা বিজাতীয় শোনায় তবে তা গ্রহণ না করাই হবে সঠিক সিদ্ধান্ত। যেমন, Air Condition শব্দটির বাংলা পরিভাষা করা হয়েছে 'শীততাপ নিয়ন্ত্রিত'। বলা বাহুল্য শব্দটি দীর্ঘ এবং বড়ই কৃত্রিম। কাজেই 'শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত' Air Condition এর যথার্থ অর্থ প্রকাশক হলেও তা পরিভাষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষায় চমৎকার পরিভাষা তৈরি করা হয়েছে। সেটি হল 'বাতানুকুল'। পরিভাষাকে এমনই সহজ সরল হতে হবে যা সাধারণে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

৩. পরিভাষা নির্মাণকালে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বর্জন করতে হবে। পরিভাষা নির্মাণে কোন ছুৎমার্গীতা চলবে না। পরিভাষা তৈরির ক্ষেত্রে সংস্কৃত শব্দ ভান্ডার থেকে যেমন অজস্র উপযুক্ত শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি পাওয়া যায় লৌকিক শব্দ ভান্ডার থেকেও। সংস্কৃত হলেই মান্যতা অধিক লৌকিক হলে নয়, এমন ধারণা ভুলে যেতে হবে। প্রয়োজনে আরবি, ফরাসি, হিন্দি শব্দ ভান্ডারও কাজে লাগতে পারে।

৪. বহুল প্রচলিত, লোকমুখে চর্চিত ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা পরিভাষা না করাটাই বাঞ্ছনীয়। বহু ব্যবহৃত হতে হতে অনেক শব্দই বিদেশি ঝাঁঝ হারিয়ে স্বদেশী হয়ে পড়েছে। যেমন- চেয়ার, কাপ, সাইকেল ইত্যদি। এ জাতীয় শব্দ গুলিকে অবিকল রেখে দেওয়াই উচিত। নইলে পরিভাষাটাই মনে হবে বিজাতীয় ইংরেজিটাই জাতীয়। যেমন Motor Cycle - এই ইংরেজি শব্দটির বাংলা পরিভাষা দ্বিচক্রযান শুনতে বেশ ভালো লাগলেও মানুষ কী মুখে তুলে নেবে? তাই বহু প্রচল ইংরেজি শব্দ রূপান্তরিত হওয়া উচিত শুধু অক্ষরের। অর্থাৎ Motor Cycle লেখা হবে মোটর সাইকেল, Cash Memo লেখা হবে ক্যাশ মেমো।

৬.৫. পারিভাষিক শব্দ ও তার প্রয়োগবিধি

পারিভাষিক শব্দ: অভিধানে পরিভাষার অর্থ সংক্ষেপণার্থ শব্দ। অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোন বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা। অন্যভাবে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট সংক্ষেপার্থ সংশয়মুক্ত শব্দই হলো পরিভাষা। সহজভাবে বললে, বিশেষ ভাষা। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত কতগুলো বিদেশি শব্দের সরাসরি কোনো প্রতিশব্দ না থাকায় ওই শব্দগুলোকে বোঝানোর জন্য যেসব বাংলা শব্দ ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে পারিভাষিক শব্দ বলে। যেমন: Acting-ভারপ্রাপ্ত, Aid - সাহায্য, Area - অঞ্চল, Art-কলা, Bank-ব্যাংক।

পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগবিধি:

পরিভাষা ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। সেগুলি হল-

১) মূল ভাষায় প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন — পুলিশ চোরকে ধরতে এসেছে। পুলিশের প্রতিশব্দ নেই।

২) মূল ভাষায় টেকসই প্রতিশব্দ না থাকলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যথা— ছেলেমেয়েরা

টেলিভিশন দেখছে। টেলিভিশন শব্দের প্রতিশব্দ দূরদর্শন, তবে এ শব্দটি টেকসই নয়।

৩) মূল ভাষায় প্রতিশব্দটি অপ্রচলিত হলে পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়। যথা— টেবিলে কলমটা রাখো। টেবিলের প্রতিশব্দ চৌপায়া, তবে এটি প্রচলিত নয়।

৪) মূল ভাষার প্রতিশব্দটি সর্বসাধারণের বোধগম্য না হলে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমন — গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডিগ্রির প্রতিশব্দ 'মান নির্ণায়ক বিশেষ' বলে অভিহিত করা হয়। তাই ডিগ্রি লেখাই শ্রেয়।

৫) পৌনঃপুনিক ব্যবহারের কারণে প্রতিশব্দ থাকলেও পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যথা— অ্যাকাউনটেন্ট পদে লোক নিয়োগ করা হবে। Accountant-এর প্রতিশব্দ হিসাব রক্ষক। কিন্তু অ্যাকাউনটেন্ট পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়।

৬) সহজে গ্রহণযোগ্য পরিভাষা প্রয়োগ করা যায়। যেমন --- টেলিফোন নষ্ট হয়ে গেছে। টেলিফোনের প্রতিশব্দ 'দূরালাপনী' কিন্তু টেলিফোন সহজে গ্রহণযোগ্য।

৭) অফিস-আদালতে ব্যবহার্য শব্দ পারিভাষিক হওয়াই উত্তম। যেমন — বিল জমা দেওয়া হোক। এখানে বিলের পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

৮) অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মূল ভাষার প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে শব্দের সর্বজনীনতা নষ্ট না করা উচিত। সে ক্ষেত্রে পরিভাষা প্রয়োগ করা শ্রেয়। যেমন — স্কুল খোলা নেই। স্কুলের পরিবর্তে বিদ্যালয় প্রয়োগ করলে সর্বজনীনতা নষ্ট হয়।

৯) বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক বিদেশি শব্দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর মধ্য থেকে বাংলা শব্দভাণ্ডারে কিছু গৃহীত হয়েছে আবার কিছু বর্জিত হয়েছে। অর্থাৎ পারিভাষিক শব্দ বাংলা ভাষার বিকল্প এবং প্রয়োজনের জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষায় পারিভাষিক শব্দের গুরুত্ব অনেক।

৬.৬. বাংলা পরিভাষা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা

বাংলা পরিভাষা চর্চার সূত্রপাত হয় ১৭৮৪ খ্রিসটাব্দে। সূত্রপাত করেছিলেন মিশনারি সাহেবরা। মূলত প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের প্রয়োজনে এর চর্চা শুরু হয়। তারপর থেকে পরবর্তী দু'শ বছর (১৭৮৪-১৯৮৫) বিদেশি প্রশাসক ও মিশনারি আর দেশি বিজ্ঞানী ও গদ্যলেখকের মেধা ও প্রযত্নে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা পরিভাষা। পরিভাষা চর্চার এই ইতিহাস আমাদের চিন্তা ও কৌতূহলকে উদ্রিক্ত করে। প্রথমেই এ বিষয়টি নিয়ে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভাবনা-চিন্তা করেছেন, তেমন কতিপয় মনীষীদের কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করছি। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খ্রীঃ) 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকার 'পরিভাষা'-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' নামক প্রবন্ধে বলেন:

> "ইংরেজী শব্দের অনুবাদ বা রূপান্তরদান না করিয়া উহাদিগকে অবিকল গ্রহণ করিতে পারা যায় কিনা, এইকথা প্রথমে বিবেচ্য। সর্বত্র এই ব্যাপার সাধ্য হইলে পরিভাষা-প্রণয়নে চিন্তা

> করিবার কিছু থাকিত না। কিন্তু সর্বত্র ইহা সাধ্য নহে, কর্তব্যও নহে।... ইংরেজী শিল্পের ও ইংরেজী বিজ্ঞানের বিস্তারের সহিত অনেক ইংরেজী শব্দ আমাদের দেশে লোকমুখে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে ও ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। টেবিল চেয়ার... প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য বস্তুর মত, কোর্ট আপীল পুলিস প্রভৃতি বিলাত হইতে আমদানি পদার্থের মত,... মিনিট, সেকেন্ড, ডিগ্রি প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ এখন আমাদের আত্মীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের সবগুলি এখনও আমাদের মাতৃভাষার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় নাই; কালে মিশিয়া যাইবে।... তবে সর্বত্র ঋণ গ্রহণে প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রত্নগর্ভা। ঐ অনন্ত আকর হইতে যথেচ্ছ পরিমাণে চিরদিন ধরিয়া রত্ন সংগ্রহ করিলেও এই ভাণ্ডার শূন্য হইবার নয়।... সুতরাং আমরা নিশ্চিন্তভাবে দ্বিধাহীন হইয়া সংস্কৃত শব্দ গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞানের ভাষা পুষ্ট করিতে পারি। কিন্তু এইখানে আর একটি কথা আছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃতের পাশে খাঁটি প্রচলিত বাঙলা কখন কখন আসিয়া দাঁড়ায়। সেই খাঁটি চলিত বাঙলার দাবি কতক পরিমাণে আমাদিগকে রক্ষা করিতেই হইবে"।

এর পরবর্তীকালে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিন্তু পরিভাষার ব্যাপারে কিছুটা উদার মতবাদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "আমি বলি, যাহা চক্তি, সকলে বুঝে তাহাই চালাও, যাহা চলিত নয় তাহাকে আনিও না। যাহা চলতি তাহা ইংরেজীই হউক, পারসীই হউক, সংস্কৃতই হউক-চলুক। তাহাকে বদলাইয়া শুদ্ধ সংস্কৃত করিবার দরকার নাই।" মহামহোপাধ্যায় আরও বলেন: "এখন সোজা বাংলায়, সোজা কথায়:- নূতন জিনিসের নাম দেওয়া ও নূতন ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা উচিত, নহিলে কতকগুলো দাঁত ভাঙ্গা কটকটে শব্দ তৈয়ার করিয়া লইলে ভাষার সঙ্গে তাহা খাপ খাইবে না। যে দিকেই হউক, ভাষা লইয়া স্বেচ্ছাচারিতা করাটা ঠিক নয়।"

রামেন্দ্রসুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীরা যখন উক্ত মতামত প্রকাশ করেছেন, তখন ভারত ছিল পরাধীন, আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমই ছিল ইংরেজি ভাষা। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানত ইংরেজি ভাষাতেই সম্পন্ন হত, তাই পরিভাষা-সমস্যাটা তখনো খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তা সত্ত্বেও কোন কোন মনীষী সেই সময়েই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

এখন বাঙলাই আমাদের শিক্ষার মাধ্যম বলে পরিভাষা-বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিজ্ঞান-শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়েও যিনি বাঙলা ভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম বলে মেনে আসছিলেন, তেমন একজন বিজ্ঞানাচার্যের পরিভাষা বিষয়ক একটি প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধার করা হচ্ছে। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন:

> "গত দেড়শো বছর ধরে পরিভাষা রচনার চেষ্টা কম হয়নি। সেই মূলধন নিয়েই আপাততঃ কাজে লাগা যেতে পারে। তাছাড়া পরিভাষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় তার আদৌ কোন যুক্তি আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। পরিভাষা অনেকটা ধাতুর মত। তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়ে ব্যবহারিক অর্থই অধিক গণ্য। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা

সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অনেকাংশ পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে নেওয়া। তারা বৈজ্ঞানিক তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে যে নামে চিহ্নিত করেছে, সেই তথ্য, যন্ত্র বা ধারণাকে আমরা সেই নাম সমেত গ্রহণ করছি। সেই নামের প্রতিশব্দ সন্ধান করা অনেকটা টেলিফোনকে দূরভাষ যন্ত্র বলার মতই বাতুলতা। অপরের কাছ থেকে নেওয়া জিনিস অপরের দেওয়া নামেই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। বাঙলা ভাষয় বিভিন্ন বিদ্যায় ও বৃত্তির নিয়মিত চর্চার ফলে বাংলা পরিভাষা যথাকালে দেখা দেবে। ততদিন পর্যন্ত ইংরেজী পরিভাষাকে অন্ত্যজ জ্ঞান করার কোন কারণ নেই। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ইংরেজী পরিভাষা যদি বাঙলায় সাজবদল করে তাতে বাঙলারই লাভ। কোন ভাষাই চারিদিকে দেওয়াল তুলে সমৃদ্ধ হ'তে পারে না।"

পরবর্তীতে যখন স্বাধীন ভারতে উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ে যখন মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম-রূপে অঙ্গীকৃত হল, তখন পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নানা গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবার প্রয়োজনও দেখা দিল। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-বিষয়টি নিয়ে সর্বভারতীয় বিদ্বৎ সমাজ নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হলেন। ফলে, কেন্দ্রীয়ভাবেও পরিভাষা সমস্যা-সমাধানে অনেকেই উদ্যোগী হয়ে উঠলেন। সমগ্র ভারতীয় আর্যভাষাগুলি যেহেতু একই মূল থেকে উৎপন্ন তাই সংস্কৃতের দ্বারস্থ হওয়াই যে সমস্যা সমাধানের যথার্থ পথ, এ বিষয়ে আর কারও দ্বিধা রইল না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিভাষার পাশাপাশি প্রচলিত আরবী-ফার্সি বা দেশি অথবা আঞ্চলিক ভাষার চলিত শব্দকেও মেনে নেওয়া হয়েছে।

১৮৩৪ খ্রীঃ শ্রীরামপুর কলেজের জন স্যাক 'Principles of Chemistry'-র যে গৌড়ীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন, তাতে রসায়ন শাস্ত্রের বাঙলা ভাষায় আলোচনা ছাড়াও পরিভাষা নির্দেশ করার চেষ্টা ছিল। বাঙলা পরিভাষা-রচনার সচেতন প্রচেষ্টার এটিই সম্ভবত প্রথমতম নিদর্শন। ১৮৭৭ খ্রীঃ মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র রচনা করেন 'A Scheme for Rendering of European Scientific Terms into the Vernacular of India'- ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এরপর 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৩০১ বঙ্গাব্দ (১৮৯৪ খ্রীঃ) থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ পত্রিকার পৃষ্ঠায় পরিভাষা-সংকলন প্রকাশিত হতে থাকে। পরিষৎ কর্তৃপক্ষ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ভাষা-বিজ্ঞান সমিতি, পরিভাষা সমিতি এবং শব্দ সমিতির একীকরণ সাধন করে এক কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করে তাদের হাতে পরিভাষা রচনা ও সঙ্কলনের দায়িত্ব অপর্ণ করেন। ফলত বিভিন্ন বিষয়ে বহু পরিভাষা সঙ্কলিত হয়। সমকালে অন্যান্য সাময়িক পত্র, সমিতি এবং ব্যক্তিবিশেষও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এইভাবে দীর্ঘকালের প্রচেষ্টায় বাঙলা পরিভাষা-সংকলনের কাজ এগিয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে একটি 'পরিভাষা সংসদ' গঠন করেন এবং এই সংসদ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' (১ম স্তবক) প্রকাশ করেন।

পরিভাষা-প্রণয়নে এই সংসদ যে মূলনীতি অবলম্বন করেছিলেন, অন্যান্য প্রাদেশিক সরকার-কর্তৃক

কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক গঠিত সংসদও মূলত একই নীতি অনুসরণ করেছেন।—

(১) পরিভাষা-রূপে গৃহীত শব্দগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংস্কৃত-তৎসম শব্দ। এর স্বপক্ষে কতগুলি যুক্তি রয়েছে।

প্রথম বড় যুক্তি এই— অন্যরা যদি এগুলি গ্রহণ না-ও করেন, তবে অন্তত এগুলি তাদের নিকট বোধগম্য বিবেচিত হবে।

দ্বিতীয় যুক্তি- এই সংস্কৃত ভাষার অসাধারণ সৃজনী-ক্ষমতা- যা বাঙলা, হিন্দি-আদি ভাষার নেই; যেমন, 'কৃ' ধাতুর সহায়তায় 'করণ করণিক, অধিকরণ, অধিকার, আধিকারিক, মহাকরণ অধিকর্তা' এবং এ জাতীয় আরও অসংখ্য শব্দ-রচনা সম্ভবপর।

তৃতীয় যুক্তি-সংস্কৃত পরিভাষা বাঙলা ভাষার সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়, কারণ অর্ধেকের বেশি বাঙলা শব্দই সংস্কৃত বা তৎসম, গুরুগম্ভীর আলোচনায় শতকরা হিসেব আরও বেশি।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাঙলাদেশে (তখন ছিল পূর্ব পাকিস্থান) বাঙলা একাডেমী থেকে যে 'পরিভাষা কোষ' প্রকাশিত হয়, সেখানেও পরিভাষারূপে গ্রহণ করা হ'য়েছে সংস্কৃত শব্দ; আরবি বা ফারসি শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে।

(২) পরিভাষা-প্রণয়নের দ্বিতীয় নীতি হল: বহু প্রচলিত বাঙলা শব্দ যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকলে বর্জন করা হয়নি।

(৩) তৃতীয় নীতিটি এই: পরিভাষার সংক্ষিপ্ততা ও উচ্চারণ সৌকর্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মোটামুটি এই আদর্শ সামনে রেখেই প্রথম পর্যায়ে পরিভাষা-প্রণয়ন এবং সংকলনের কাজ এগিয়ে চলছিল।

যে কোন পরিভাষা-সংকলককেই পরিভাষার উপযোগী শব্দ-নির্বাচন-বিষয়ে বিশেষ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। এ বিষয়ে দীর্ঘকাল আগেই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কয়েকটি নির্দেশ দান করেছিলেন। তিনি পারিভাষিকত্বের কয়েকটি লক্ষণ উল্লেখ করেছেন:

"১। প্রত্যেক শব্দ একটি মাত্র অর্থে ব্যবহৃত হইবে; তাহার দ্বিতীয় অর্থ থাকিবে না।

২। এক অর্থে একটি মাত্র শব্দ প্রযুক্ত হইবে; দুই শব্দ একার্থবাচী হইবে না।

৩। প্রত্যেক শব্দ তাহার নির্দিষ্ট অর্থে মর্যাদা প্রযুক্ত হইবে।"

শুধু তাইই নয়, শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারেও আচার্য ত্রিবেদী যথেষ্ট উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন:

> "নূতন শব্দ সঙ্কলনের সময় ব্যবহারে সুবিধা ও উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। ব্যাকরণের দিকে ও ব্যুৎপত্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে গেলে কাজের ব্যাঘাত হয়। অনেক সময় অভিধান ছাড়া শব্দ সৃষ্টি করিতে হয়, অথবা আভিধানিক শব্দকে সুবিধামত কাটিয়া ছাঁটিয়া গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ভাষা মূলে সঙ্কেতমাত্র, ইহা মনে রাখিলে এই বিষয়ে আপত্তির কোন সঙ্গত কারণ থাকিবে না। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লট লোট লঙ লুঙ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দের দৃষ্টান্ত থাকিতে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।"

ইদানিং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে হলেও অপরাপর নানা বিষয়েই পরিভাষার প্রয়োজন চিরকাল অনুভূত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতের প্রয়োজনে যে অসংখ্য পরিভাষা সৃষ্টি করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন শব্দ আছে যেখানে শব্দ এবং অর্থের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান, আবার এমন শব্দও আছে, যেগুলি অর্থহীন কতকগুলি সঙ্কেতমাত্র। এমনকি প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ অন্য ভাষা থেকেও পরিভাষা গ্রহণে অকৃপণ ছিলেন, তারও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে এরকম প্রচুর গ্রিক শব্দ এখনও বর্তমান— যেমন, 'হেলি' (Helios), 'কোন' (kronos), 'আস্ফুজিৎ' (Aphredite), 'হোরা' (hora), 'কেন্দ্র' (kentron), 'আপোক্লিম' (apoklim), 'জামিত্র' (diamotros) প্রভৃতি।

একালে প্রধানত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও সরকারি কার্যে ব্যবহৃত পরিভাষা-রূপে যে সকল শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে, তাদের একাংশ যথাযথ-রূপে কিংবা সামান্য ধ্বনিপরিবর্তন রূপে গৃহীত হয়। যেমন- ডিগ্রি (degree), মিনিট (minute), বোল্টু (bolt), টেবিল (table), অক্সিজেন (oxygen) প্রভৃতি। কতকগুলি শব্দের প্রতিশব্দ প্রচলিত ভাষা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন- 'বস্তু (mass), পরকলা (lens), হাওয়া (wind), কাজ (work), টান (tension)' প্রভৃতি। বাঙলায় সাম্প্রতিককালে সাংবাদিকরাও আকস্মিক প্রয়োজনে দ্রুত কিছু অর্থবোধক পরিভাষা তৈরি করে নেন, ক্রমে সেগুলিই ভাষায় প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। যেমন- 'সান্ধ্য আইন' (curfew), 'উড়ালপুল' (fly over) 'কাঁদানে গ্যাস' (tear gas), 'যানজট' (traffic jam) প্রভৃতি। তবে পরিভাষা-রূপে সর্বাধিক পরিচিত শব্দগুলি প্রায় সবই সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ। এদের মধ্যে কিছু আছে প্রচলিত শব্দ সহযোগে তৈরি নবসৃষ্ট শব্দ, যেমন- 'বিশ্ববিদ্যালয়' (University), 'দূরবীক্ষণ' (Telescope), 'সমধ্বনিরেখা' (Isophone), 'স্বরসঙ্গতি' (vowel harmony), 'নিদানবিদ্যা' (Actiology) প্রভৃতি। প্রয়োজনে একেবারে যে নতুন শব্দ সৃষ্টি হয়নি, তা কিন্তু নয়। যেমন- 'অপিনিহিতি' (Epenthesis), 'অভিশ্রুতি' (Umlaut) 'অপশ্রুতি' (Ablaut) প্রভৃতি। তবে একালে পরিভাষারূপে যে সমস্ত শব্দাবলী প্রযুক্ত হচ্ছে তার বড় অংশ হয় প্রচলিত অথবা প্রাচীনতর গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত। যেমন- 'অনুদান' (grant), 'অবর' (under), 'বরিষ্ঠ' (senior), 'আরক্ষা' (police), 'অধ্যাদেশ' (ordinance), 'আয়োগ' (commission), 'যোজনা' (planning), 'নভশ্চর/মহাকাশচারী' (Astronaut)।

পরিভাষা-সংকলনের ব্যাপারে যে নির্দেশিকা সরকারি বাঙলা পরিভাষা উপসমিতি ০৯/০৮/৮৫ তারিখে প্রচার করেছিলেন, সেই নির্দেশনামাটি নীচে তুলে ধরা হল।-

"সিদ্ধান্ত: নিম্নলিখিত সূত্রগুলি মনে রেখে পরিভাষা সংকলন করা হবে।

১। পরিভাষা যথাযথ, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত শব্দ বিদেশী হ'লেও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া বর্জন না করা।

৩। পরিভাষায় গৃহীত শব্দ বাঙলাভাষা স্বভাবের বিরোধী যাতে না হয়।

৪। পরিভাষা নিয়ে পূর্বেকার সমস্ত উদ্যোগ যথাযোগ্যভাবে বিবেচনা।

৫। প্রশাসন ও বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ উপযুক্ত ব্যক্তিদের পরিভাষা-সংকলনে পরামর্শ গ্রহণ।

৬। পরিভাষা নির্মাণকালে হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় নির্মিত পরিভাষাও প্রয়োজনে বিবেচনা।"

৬.৭. বাংলা পরিভাষার তালিকা (প্রশাসনিক)

A

১. Abduction - অপহরণ

২. Abeyance - স্থগিতকরণ, মুলতুবি

৩. Abolish - বিলোপ করা, তুলে দেওয়া, রদ করা

৪. Abridge - সংক্ষেপ করা, ছোট করা

৫. Absconder - ফেরারি, পলাতক

৬. Abstract budget - সংক্ষিপ্ত বাজেট

৭. Accession Register - সংযোজন পঞ্জি, পরিগ্রহণ খাতা

৮. Accountancy - হিসাবশাস্ত্র

৯. Accumulation of capital - মূলধনের পুঞ্জীভবন

১০. Acquittance Book - বেতন বই

১১. Administrative law - প্রশাসনিক বিধি

১২. Advisory Committee - উপদেষ্টা সমিতি, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান

১৩. Allowance - ভাতা, দস্তুরি

১৪. Anti-corruption - দুর্নীতি-নিরোধ

১৫. Approximate value - আসন্ন মান, আনুমাণিক মূল্য

১৬. Assembly, Legislative - বিধানসভা

১৭. Assessee - করদাতা

১৮. Attestation - প্রত্যয়ন

১৯. Audit - নিরীক্ষা, আয়-ব্যয় পরীক্ষা

২০. Autocracy — স্বৈরতন্ত্র

B

২১. Balance - স্থিতি, বাকি, উদবর্ত

২২. Balanced budget - সুষম বাজেট

২৩. Ballot system - ভোট পদ্ধতি
২৪. Bank balance - ব্যাংক-স্থিতি, ব্যাংক-জমা
২৫. Bankrupt - দেউলিয়া
২৬. Banned - নিষিদ্ধ
২৭. Barter deal - বিনিময় বাণিজ্য
২৮. Beneficiary - উপস্বত্বভোগী, উপকৃত
২৯. Bill Book - মুল্যপত্র-বই, বিল-বই
৩০. Black Book - গলদ নথি
৩১. Budget - বাজেট, আয়ব্যয়ক
৩২. Bi-annual - ষান্মাসিক
৩৩. Bi-centenary - দ্বি-শতবার্ষিকী
৩৪. Bi-monthly - অর্ধ-মাসিক
৩৫. Bi-weekly - অর্ধ-সাপ্তাহিক
৩৬. Bureaucracy – আমলাতন্ত্র

C

৩৭. Cabinet - মন্ত্রীপরিষদ, মন্ত্রীসভা
৩৮. Capital - মূলধন, পুঁজি
৩৯. Capitulation - আত্মসমর্পন
৪০. Cash - নগদ, রোক
৪১. Censor - বিবাচক, সেনসর
৪২. Census - জনগণনা, আদমশুমারি
৪৩. Collector - সমাহর্তা
৪৪. Conservation - সংরক্ষণ
৪৫. Council - পরিষদ, সংসদ
৪৬. Charge - ব্যয়; অভিযোগ; কার্যভার।
৪৭. Consignment - চালান, প্রেষণ

D

৪৮. Debit - খরচ, বিকলন
৪৯. De facto - কার্যত

৫০. Democracy - গণতন্ত্র
৫১. Demi-Official - আধা সরকারি
৫২. Demography -জনতত্ত্ব
৫৩. Demotion - পদাবনতি
৫৪. Domicile - নিবেশ, নিবেশাধিকার

E

৫৫. Economy - অর্থব্যবস্থা; মিতব্যয়িতা
৫৬. Edit - সম্পাদনা করা
৫৭. Elect - নির্বাচন করা
৫৮. Enactment - বিধিবদ্ধকরণ
৫৯. En bloc একযোগে, সদলবলে
৬০. Estimate - প্রাককলন, মূল্যানুমান
৬১. Estate - সম্পত্তি, ভূস্বত্ত্ব, মহাল
৬২. Expenditure - ব্যয়

F

৬৩. Finance - অর্থ, বিত্ত, অর্থসংস্থান
৬৪. First-hand information - সরাসরি তথ্য

G

৬৫. Gross income - মোট আয়
৬৬. Guard file - নির্দেশিকা নথি

H

৬৭. Honorarium - সম্মানদক্ষিণা, সম্মানী
৬৮. Honorary - অবৈতনিক, সাম্মানিক

I

৬৯. Identification - শনাক্তকরণ
৭০. Illegal gratification - ঘুষ, উৎকোচ

৭১. Implied condition - উহ্য শর্ত
৭২. Imprest account - অগ্রদত্ত হিসাব
৭৩. Inconvertible - অবিনিময়যোগ্য
৭৪. Indemnify - ক্ষতিপূরণ করা
৭৫. Index - অনুক্রমণী, সূচি, নির্ঘণ্ট
৭৬. Informer - চর
৭৭. Inverse ratio - ব্যস্ত অনুপাত

J

৭৮. Judgement reserved - রায় স্থগিত
৭৯. Jurisdiction - অধিকারক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র, এক্তিয়ার
৮০. Juvenile offender - নাবালক অপরাধী

K

৮১. Keeper of Records - মহাফেজ, দলিলরক্ষক
৮২. Key Officer - মুখ্য আধিকারিক

L

৮৩. Lacuna - ত্রুটি
৮৪. Laissez faire - অবাধ-নীতি, অবাধ-বাণিজ্য
৮৫. Landed property - ভূসম্পত্তি
৮৬. Law, Tenancy - প্রজাস্বত্ব আইন
৮৭. Ledger - খতিয়ান
৮৮. Levy - ধার্য করা
৮৯. Liaison Office - সংযোগ কার্যালয়, সংযোগ অফিস
৯০. Life conviction - যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
৯১. Linked file - সংযুক্ত নথি, সংলগ্ন নথি
৯২. Litigant — মামলাকারী

M

৯৩. Maintain a suit - মামলা বহাল বা চালু রাখা

৯৪. Mandate - আজ্ঞা, আদেশ

৯৫. Masseur - সংবাহক

৯৬. Minute Book - কার্যবিবরণ বই

৯৭. Monetary policy - মুদ্রানীতি

N

৯৮. Negotiable Instrument - হস্তান্তরযোগ্য দলিল, সম্প্রদেয় পত্র

৯৯. Non-alignment - জোট নিরপেক্ষতা

১০০. Non-bailable - জামিন অযোগ্য

১০১. Nullify - বাতিল করা

O

১০২. Obligatory - বাধ্যতামূলক, অবশ্যকর্তব্য

১০৩. Occupancy right - ভোগস্বত্ব, দখলিস্বত্ব

১০৪. Ordinance - অধ্যাদেশ

১০৫. Overdue - মেয়াদ-উত্তীর্ণ

১০৬. Overruled - বাতিল, খারিজ

P

১০৭. Payable - পরিশোধ্য, প্রদেয়, দেয়

১০৮. Pay slip - বেতন পত্রী

১০৯. Penal code - দন্ড-বিধি, দন্ড-আইন

১১০. Perjury - মিথ্যা সাক্ষ্য

১১১. Personnel - কর্মচারীবৃন্দ

১১২. Planned economy - পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা/অর্থনীতি

১১৩. Plebiscite - গণভোট

১১৪. Pre-emption - ক্রয়ের অগ্রাধিকার

১১৫. Pre-audit - পূর্ব-নিরীক্ষা

Q

১১৬. Quantum index - পরিমাণ সূচক

১১৭. Quarterly - ত্রৈমাসিক

১১৮. Quasi Government - আধা-সরকারি

১১৯. Quota - নির্ধারিত অংশ/ভাগ

R

১২০. Racketeering - প্রতারণামূলক অর্থোপার্জন

১২১. Receipted challan - রসিদ চালান

১২২. Recommend - সুপারিশ করা

১২৩. Resource person - বিশেষজ্ঞ

১২৪. Revenue account - রাজস্ব হিসাব

১২৫. Round up - ধরপাকড়

১২৬. Salaried - বেতনভুক

১২৭. Sales tax - বিক্রয় কর

১২৮. Seize - ধরা, আটক করা, বাজেয়াপ্ত করা

১২৯. Sentry - সান্ত্রী, প্রহরী

১৩০. Status quo - স্থিতাবস্থা

১৩১. Stay order - স্থগিতাদেশ

১৩২. Statutory - বিধিবদ্ধ

১৩৩. Supertax - অধিকর

T

১৩৪. Tabulate - সারণিবদ্ধ করা

১৩৫. Tax exemption - কর-রেহাই, করমুক্তি

১৩৬. Temporary transfer - সাময়িক বদলি

১৩৭. Title-deed - স্বত্বদলিল, স্বত্বনামা, সম্পত্তির দলিল

১৩৮. Trial - বিচার

১৩৯. Treasury - কোষাগার

১৪০. Treaty contract - সন্ধিচুক্তি

১৪১. Triennial - ত্রৈবার্ষিক

১৪২. Trimonthly - ত্রৈমাসিক

১৪৩. Trustee - অছি, ন্যাসরক্ষক

১৪৪. Toll - উপশুল্ক, পথকর, পারানি

U

১৪৫. Unamendable - অসংশোধনীয়

১৪৬. Unanimous - সর্বসম্মত

১৪৭. Unaudited - অনিরীক্ষিত

১৪৮. Unbalanced budget - অসম বাজেট

১৪৯. Underhand policy - গোপন নীতি

১৫০. Undeeded sale - বিনা দলিলে বিক্রয়, দলিলহীন বিক্রয়

V

১৫১. Vest - বর্তানো, ন্যস্ত হওয়া, ন্যস্ত করা

১৫২. Verdict - নির্ণয়, রায়

১৫৩. Verified - সত্যতা, পরীক্ষিত

W

১৫৪. Waive - (দাবি, স্বত্ব ইত্যাদি) মকুব করা, রেহাই দেওয়া

১৫৫. Working plan - কার্যক্রম, কাজের ছক

১৫৬. Written Statement - লিখিত বিবৃতি

X

১৫৭. X-ray examination - এক্স-রে পরীক্ষা

Z

১৫৮. Zamindari system - জমিদারি প্রথা

১৫৯. Zone - অঞ্চল

১৬০. Zonal trade - আঞ্চলিক বাণিজ্য

৬.৮. অনুশীলনী

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) পরিভাষা কাকে বলে?

২) পরিভাষার প্রয়োজন কেন হয়?

৩) পরিভাষা নির্ণয় করুন: প্রশ্নের মান অনুসারে ৬.৭. উপ-এককে উল্লিখিত শব্দাবলি থেকে বাংলা পরিভাষা নির্ণয় করতে দেওয়া যেতে পারে।

৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা 'সরকারি কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা' (১ম স্তবক) কত সালে প্রকাশিত হয়?

৫) পারিভাষিক শব্দ বলতে কী বঝায়?

৬) রাজশেখর বসু পরিভাষা বলতে কী বুঝিয়েছেন?

৭) পরিভাষা বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ ও তার রচয়িতার নাম উল্লেখ করুন।

৮) কত খ্রিস্টাব্দে বাঙলাদেশের বাঙলা একাডেমী থেকে 'পরিভাষা কোষ' প্রকাশিত হয়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) সরকারি বাঙলা পরিভাষা উপসমিতি ০৯/০৮/৮৫ তারিখে পরিভাষা-সংকলনের ব্যাপারে কোন কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন?

২) টীকা রচনা করুন: বাংলা পরিভাষা সমস্যা।

৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা সংসদ পরিভাষা-প্রণয়নে কোন কোন নীতি অবলম্বন করেছিলেন?

৪) টীকা রচনা করুন: রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরিভাষা-চিন্তা।

৫) বাংলা ভাষায় কোন কোন উপায়ে নতুন পরিভাষা সৃষ্টি হতে পারে? — নিজের ভাষায় লিখুন।

বিস্তারিত প্রশ্ন

১) যেকোন দুই জন বাঙালির পরিভাষা-বিষয়ক চিন্তাভাবনার পরিচয় তথ্য-সহযোগে আলোচনা করুন।

২) পরিভাষা কী? যথার্থ পরিভাষা নির্মাণের কোন কোন শর্ত মানা জরুরি বলে আপনি বিবেচনা করেন- নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পরিভাষা বলতে কী বুঝিয়েছেন? সংক্ষেপে পরিভাষা নির্মাণের পদ্ধতিগুলি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা করুন।

৪) পরিভাষার উপযোগী শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে নির্দেশগুলি প্রদান করেছিলেন তার উল্লেখ করুন।

৬.৯. গ্রন্থপঞ্জি

১) 'প্রসঙ্গ: বাংলা ভাষা', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৮৬।

২) 'বাগর্থ', বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ,' মার্চ, ১৯৫০।

৩) 'বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা', সমতট প্রকাশনী, প্রকাশক, অর্ঘ্যকুসুম দত্তগুপ্ত, বৈশাখ, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।

৪) 'বাঙলা বানানবিধি', পরেশচন্দ্র মজুমদার, কলিকাতা, ১৯৮২।

৫) 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১৯৯১।

৬) 'বাংলা পরিভাষার দু'শ বছর', রত্না ঘোষ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৯৮৮।

৭) 'বাংলা বানান', মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৮৭।

৮) 'বাংলা বানান সংস্কার সমস্যা ও সম্ভাবনা', পবিত্র সরকার, কলিকাতা, ১৯৮৭।

৯) 'বাংলা বানানের নিয়ম', মাহবুবুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।

১০) 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম', রমেন ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৯০।

১১) 'বাংলা লেখার নিয়মকানুন', হায়াৎ মামুদ, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৯২।

১২) 'বানান বিতর্ক', নেপাল মজুমদার সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলিকাতা, ১৯৯২।

পত্রিকা:

১) 'বাংলায় পরিভাষা-সংকলনের রীতিনীতি', পুণ্যশ্লোক রায়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৮৭৯-৮০ শক, পৃ. ২০৩-২০৮

মডিউল - ৩
বাংলা সম্পাদনা ও প্রকাশনা

একক ৭: প্রুফ সংশোধন

৭.১. উদ্দেশ্য
৭.২. প্রস্তাবনা
৭.৩. প্রুফ সংশোধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা
৭.৪. প্রুফ সংশোধন প্রক্রিয়া
৭.৫. প্রুফ রিডারের মূল কর্তব্য
৭.৬. প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও সঙ্কেত
৭.৭. প্রুফ সংশোধন- অনুশীলনী
৭.৮. গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই আলোচনায় আমরা দেখে নেব বাংলা বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রুফ সংশোধনের গুরুত্বকে। প্রুফ হল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণযোগ্য পাঠের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধক পদ্ধতি। যে পদ্ধতিটি বেশ কয়েকবার চলতে থাকে; তবে গিয়ে একটি নির্ভুল মুদ্রণযোগ্য পাঠ তৈরি হয়। প্রুফ সংশোধনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

৭.২. প্রস্তাবনা

মুদ্রণের জন্য যে কোনো লেখাকে প্রস্তুত হতে হয় প্রুফ রিডিং এর মধ্য দিয়ে। প্রুফ রিডিং (Proof Reading) ইংরেজি শব্দ। এর অর্থ সংশোধন বা পরীক্ষা। প্রকাশক মহলে proof এর বাংলা 'মুদ্রনিকা', যা থেকে মুদ্রণ করা হয়। সুতরাং প্রুফ-সংশোধন অর্থ মুদ্রণিকা সংশোধন। কিন্তু বাংলাতেও আমরা প্রুফ রিডিং শব্দটিকেই মান্যতা দিয়েছি। বলা যেতে পারে এটা প্রকাশনা জগতের ভাষা। গ্রন্থ, পুস্তিকা, পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা যে কোনো কম্পোজ বা লেখায় ত্রুটি দূর করে লেখা নির্ভুল করাকে প্রুফ বলে। গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা বা কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে যারা কম্পোজের সঙ্গে যুক্ত, প্রুফ-সংশোধন তাদের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বিষয়। প্রুফ সংশোধনের সময় আধুনিক প্রমিত বানান রীতি ও শব্দচয়ন সম্পর্কে ধারণা না থাকলে প্রুফরিডিং বা সংশোধনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কম্পোজার অথবা যিনি প্রুফ সংশোধন করেন উভয়ের কাছে ত্রুটিযুক্ত শব্দ বা বানান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে মুদ্রিত গ্রন্থ বা ত্বদ্রদ্মাটি অসংখ্য ভুলে ভর্তি হয়ে পাঠকের হাতে যায়। পাঠক এখন লেখা পড়ে লেখক, প্রকাশক, প্রুফ-সংশোধক সবার প্রতি ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে।

অক্ষরে ছাপা লেখার অনেক ভুল ও ক্রটি যুক্ত বিষয় ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। সে কারণেই লেখক, প্রকাশক, কম্পোজার এবং যিনি প্রুফ দেখবেন সকলেরই প্রুফ দেখার নিয়ম সম্পর্কে যথার্থ ধারণা থাকতে হবে। সে কারণে অনেক সময় লেখককে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় না। সম্পাদক বা কম্পোজার এই কাজের দায়িত্ব নেন। যা লেখকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে তা কম্পোজারের চোখ এড়াতে পারে না। এতটাই দায়িত্ব নিয়ে থাকেন সেই ব্যক্তি যিনি প্রুফ সংশোধনের কাজ করেন।

৭.৩. প্রুফ সংশোধন পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে Indian standards Institution প্রকাশনার সুবিধার্থে প্রুফ-সংশোধনের নিয়মাবলি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি প্রুফ বা লেখা সংশোধনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিয়মকানুন বিচার-বিশ্লেষণ করে আধুনিক ও যুগোপযোগী একটি সর্বভারতীয় নিয়মাবলি (Proof Corrections for Printers and Authors) প্রণয়ন করেন। আমাদের দেশেও বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সামান্য কিছু রদবদল করে সর্বভারতীয় নিয়মকেই অনুসরণ করা হয়। মুদ্রিত কোনো কিছু (যেমন খবরের কাগজ, পত্র-পত্রিকা, বই, অভিধান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা ইত্যাদি) কারও সামনে উপস্থাপন করার পূর্বে তা প্রেসে বা কম্পিউটারে ছাপিয়ে নিতে হয়। প্রেসের কম্পোজিটর (বর্তমানে কম্পিউটার অপারেটর) মেশিনের অক্ষরে তা আবার লেখেন। লেখার পর কাগজে ছাপ তোলেন। এ ছাপ তোলার কাগজটিই হল প্রুফ। অর্থাৎ লেখকের লেখার একটি প্রমাণ বা প্রুফ (proof)। কম্পোজিটর মেশিনে লেখার সময় লেখকের লেখা হুবহু লিখেছেন কি না তা লেখকের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। তখন যদি লক্ষ করা যায় কম্পোজিটর কিছু অংশ বাদ দিয়েছেন; কিংবা বানানে ভুল করেছেন, অথবা হস্তাক্ষর না বুঝতে পেরে অন্য শব্দ কম্পোজ করেছেন, তখন ওইসব ক্রটি সংশোধন করাই প্রুফ-সংশোধনের কাজ। শুধু কম্পোজিটরই ভুল করেন না, পাণ্ডুলিপিতে লেখকও তথ্য, বানান ইত্যাদিতে অনেক ভুল করতে পারেন। কাজেই proof reader-কে শুধু কম্পোজিটরের ভুল সংশোধন করলেই চলে না, সেই সঙ্গে লেখকের তত্ত্ব, বাক্য, শব্দ-বিন্যাস ইত্যাদিতে ক্রটি থাকলে তাও ঠিক করতে হয়। সমাস-সন্ধি, ণত্ববিধান, যত্ববিধান ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট সমস্যাও নিরসন করতে হয়।

প্রুফ সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা

নির্ভুল জ্ঞান লাভের জন্য নির্ভুল গ্রন্থ প্রকাশ করা অত্যন্ত জরুরি। আর নির্ভুল বই ছাপার পূর্বশর্ত হল প্রুফ কপির মধ্যে কোনো ভুল না থাকা। অন্যদিকে যদিও কোনো লেখকের পাণ্ডুলিপির যথাযথ কম্পোজ হল কিনা যাচাই করাই প্রুফ সংশোধনের কাজ, তবু বই হোক বা পত্রিকাই হোক, মুদ্রিত কোনো লেখা জনসাধারণের জন্য প্রকাশ পেলে প্রশাসনিক, সামাজিক, ধর্মীয় বহু ক্ষেত্রে তার বিস্তৃতি ঘটে এবং ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য ছাপাখানা আইন (Press Act)-এর আমলযোগ্য অপরাধের আওতাভুক্ত হতে পারে। কাজেই প্রুফ সংশোধন কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৭.৪. প্রুফ সংশোধন প্রক্রিয়া

পাণ্ডুলিপির সংশোধনের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের উপর আমাদের নজর দিতে হয়। যেমন

১। প্রুফ সংশোধনের আগে মূল পাণ্ডুলিপিটি ভালো করে পড়ে নিতে হবে এবং বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা আয়ত্ত করতে হবে।

২। প্রুফ সংশোধনের সময় সর্বদা সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে। কোনোভাবেই ভুল বিষয়টি যেন চোখের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়।

৩। বানান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। যুক্ত এবং যুগ্ম অক্ষরের অবস্থানগত ধারণা স্পষ্ট হওয়া উচিত।

৪। একই বইয়ের মধ্যে একই বানান দু'রকম লেখা চলবে না। যেমন 'বেশি' বানানটি 'বেশী'ও লেখা যায়। প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যে কোনো একটি বানানকে বেছে নিতে হবে।

৫। প্রুফ সংশোধনের সময় প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, লাইন এমনকি পৃষ্ঠা সম্পর্কে চিহ্ন বা সংকেতের দ্বারা অবস্থানকে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। যাতে ছাপাখানায় কর্মীরা সহজে বুঝতে পারে।

৬। একবার পড়ে প্রুফ রিডিং সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল করা যায় না। তাই বেশ কয়েকবার মনোযোগের সঙ্গে তা পড়ে দেখতে হবে। যদি সম্ভব হয় অভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তির কাছে আর একবার সংশোধন করলে বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে।

৭। প্রুফ রিডিং-এর ক্ষেত্রে কেবল তত্ত্ব, তথ্য কিংবা বানান ভুলই একমাত্র সংশোধনের বিষয় নয়। সামগ্রিক সৌন্দর্যের প্রতিও দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ কিভাবে বাক্য সাজালে কিংবা কোথায় মোটা অক্ষর বা আকারে বড়ো অক্ষর ব্যবহার করতে হবে, কিংবা কোথাও কোন তালিকা বা চিত্রের প্রয়োজন আছে কিনা তাও দেখতে হবে। এছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বাক্যগুলির অবস্থান সমান দূরত্বে হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে।

৮। ঠিক উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার না করলে বাক্যের তত্ত্বগত এবং অর্থগত পরিবর্তন ঘটে যায়। তাই চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

৯। প্রুফ রিডিং-এর সময় ছাপার কালির কালো রঙের কলম ব্যবহার করা যাবে না। তাতে সংশোধন করলেও বিষয়টি ছাপার কর্মীদের কাছে পরিষ্কার নাও হতে পারে।

১০। সর্বোপরি প্রুফ রিডিং-এর ক্ষেত্রে ধৈর্য্য একটা মুখ্য বিষয়। ধৈর্য্য হারালে সংশোধনের কাজে বিঘ্ন ঘটতে পারে। যেমন— কোন বিষয়ে সম্যকধারণা না থাকলে ধৈর্যের অভাবে তা এড়িয়ে গেলে কাজে ভুল থেকে যাবে।

৭.৫. প্রুফ রিডারের মূল কর্তব্য

১। যে-কোনো ধরনের ছাপার ভুল যাতে নজরে পড়ে সেদিকে সঠিক দৃষ্টি দেওয়া।

২। ছেদ ও যতিচিহ্নের ব্যবহার যাতে ভুলভাবে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রুফ রিডারের কর্তব্য এবং বাদ পড়া অক্ষর যুক্ত করা।

৩। মূল পাণ্ডুলিপির সঙ্গে কম্পোজ করা অংশ খুব ভালোভাবে মিলিয়ে দেখে নেওয়া প্রয়োজন। দেখা উচিত মূল বিষয়ের কোনো অংশ যেন বাদ না পড়ে যায়।

৪। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্ষর, শব্দ বা উল্টে যাওয়া অক্ষরকে সঠিকভাবে বাদ দেওয়া কর্তব্য এবং বাদ পড়া অক্ষর যুক্ত করা।

৫। কম্পোজ করা ম্যাটারে শব্দগুলির মধ্যে বা লাইনের উপর নীচে যথেষ্ট বা নির্দিষ্ট পরিমান ফাঁক আছে কিনা দেখে নেওয়াও প্রুফ রিডারের দায়িত্ব।

৬। পৃষ্ঠার সংখ্যা ঠিক আছে কিনা, সূচিপত্রের সঙ্গে তার বিন্যাস যথাযথ হয়েছে কিনা দেখে নেওয়া উচিত।

৭। অসতর্কতাবশতঃ অনেক সময় এক লাইন বারবার বা দু-তিন লাইন বাদ চলে যায়, সেগুলি দেখিয়ে দেওয়াও প্রুফ রিডারের কর্তব্য।

৮। অক্ষরের মাপ ও ধরন একরকম না হলে তা ঠিক করা উচিত।

৯। বানানের ক্ষেত্রে একইরকম নিয়ম মেনে চলতে হবে।

১০। লাইন বাঁকা কিংবা ভাঙা হলে তা সোজা করবার নির্দেশ দিতে হবে।

১১। কম্পোজ করা বিষয়ের মার্জিন ঠিক মাপের আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

১২। কম্পোজ করা অংশে উদ্ধৃতি চিহ্নের যথার্থতা দেখে নিতে হয়। অনেক সময় দ্বিত্ব উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করে শেষ করা হয় একক উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে। অথবা যেখানে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসবে না সেখানে উদ্ধৃতি চিহ্ন থেকে যায়। এসব ঠিক জায়গায় বসেছে কিনা দেখে নেওয়াও প্রুফ রিডারের কাজ।

১৩। নির্দিষ্ট মাপের হরফ, বা হরফের বৈচিত্র্য দেখে কাজ হয়েছে কিনা জেনে নেওয়া উচিত প্রুফ রিডারের।

১৪। উল্টে যাওয়া অক্ষরকে ঠিকঠাক বসানো হয়েছে কিনা দেখে নেওয়াও প্রুফ রিডারের দায়িত্ব।

৭.৬. প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও সঙ্কেত

● প্রুফ সংশোধনের বিভিন্ন প্রতীক, চিহ্ন ও সঙ্কেত ●

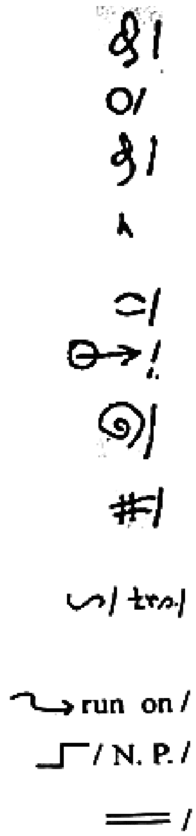

* শব্দের মধ্যে কোনো কোনো সময় বাড়তি অক্ষর বসে গেলে সেই বাড়তি অক্ষর বাদ দেওয়ার নির্দেশ-চিহ্ন—
* হরফের বদল হওয়ার চিহ্ন—
* কোনো শব্দ/লাইন/অনুচ্ছেদ বাদ দেওয়ার নির্দেশ চিহ্ন—
* কোনো হরফ/শব্দ/লাইন যোগ করতে হলে—
* অক্ষর সংযুক্তিকরণ অর্থাৎ একাধিক শব্দ বা অক্ষরের মাঝে ফাঁক থাকলে সেই ফাঁক যুক্ত করতে হলে—
* শব্দ বা অক্ষরের স্থানান্তর করার নির্দেশ-চিহ্ন—
* শব্দ বা অক্ষর উল্টে গেছে তার নির্দেশ-চিহ্ন—
* শব্দ বা হরফ বা লাইন কিংবা অনুচ্ছেদের মধ্যে ফাঁক দিতে হলে তার নির্দেশ-চিহ্ন—
* শব্দ বা অক্ষরের সন্নিহিত স্থান-পরিবর্তন সংশোধন করার নির্দেশ-চিহ্ন—
* নতুন অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ হবে না, টানা চলবার নির্দেশ— run on /
* নতুন অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফ করার নির্দেশ-চিহ্ন— / N. P. /
* বাঁকা লাইন সোজা করার নির্দেশ দিতে হলে—

* বাঁদিকে সাজানো লাইন সোজা করার নির্দেশ—
* ডানদিকে সাজানো লাইন সোজা করার নির্দেশ—
* ভুল করে কেটে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যেমন আছে তেমনি থাকার নির্দেশ— st. বা stet /
* কোনো হরফ উল্টো করে বসানো হলে তা ঠিক করার নির্দেশ-চিহ্ন—
* বিশেষ কোনো শব্দ বা লাইন বা লাইনের অংশকে অন্য কোনো স্থানে যুক্ত করতে হলে সেই অংশটিকে গোল দাগ ঘিরে চিহ্নিত করে তির চিহ্ন দিয়ে আসল স্থানটি নির্দেশ করতে হয়— O→ / tr. বা trs. /
* অক্ষর কম্পোজ করার সময় কোনো একটি অক্ষরের অভাব হলে কম্পোজিটররা সেই স্থানে অন্য একটি অক্ষর উল্টো করে বসান অথবা ফাঁকা লেড বসানো হয় যাতে সহজে চোখে পড়ে। একে পরিভাষায় বলে টর্ণ। সেটি বদলাতে হলে—
* ডানদিকে লাইন সরানোর নির্দেশ-চিহ্ন—
* লাইন বাড়ানোর নির্দেশ— Y /
* বাড়ন্ত অক্ষর বাদ দেওয়ার প্রতীক-চিহ্ন— + /
* সংগতিহীন হরফ বদলানোর নির্দেশ-চিহ্ন— w.f. /
* পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ বাদ পড়ে গেলে বা গোলমাল হলে পাণ্ডুলিপি অনুসরণের বা দেখার নির্দেশ-চিহ্ন— See copy /
* দুই স্থান সমান রাখার নির্দেশ-চিহ্ন— z /
* দুই লাইনের মধ্যে ফাঁক বা Leading বাড়াবার প্রয়োজন হলে নির্দেশ-চিহ্ন— lead in অথবা ld. in /
* দুটি লাইনের মধ্যে ফাঁক বা Leading কমানোর প্রয়োজন হলে নির্দেশ-চিহ্ন— ld. out /
* বাদ দিতে হবে এবং জায়গা মতো আনার নির্দেশ-চিহ্ন— m /
* ছাড় রয়েছে পাণ্ডুলিপি দেখুন— (h) অথবা See copy

* শব্দ বা হরফ বা লাইন বা অনুচ্ছেদের মধ্যে ফাঁক কমাতে নির্দেশ-চিহ্ন— less #
* বিকল্প শব্দ বসানোর প্রতীক-চিহ্ন— √/
* অঙ্ক বা বিজ্ঞান-বিষয়ক পাণ্ডুলিপিতে কোনো সংখ্যা বা চিহ্ন উপরের (x^2 বা y^2) দিয়ে বসানোর নির্দেশ-চিহ্ন— 2̬ 3̬
* নীচের দিকে বসাতে হলে (x_2 বা y_2) নির্দেশ-চিহ্ন— 2̷, 3̷

❑ যতিচিহ্ন :

* সমান-চিহ্ন বসাতে হলে— = ^/
* পূর্ণ-চিহ্ন বা ফুলস্টপ বসাতে হলে— (.)
* কমা-চিহ্ন দিতে হলে— ,/ বা ,
* কোলন-চিহ্ন দিতে হলে— :/
* পূর্ণচ্ছেদ বসাতে হলে— ।/
* হস্ বা হলন্ত-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ-চিহ্ন— ্ বা ʔ
* হাইফেন-চিহ্ন বসাতে হলে— -/
* ড্যাস্-চিহ্ন দিতে হলে তার নির্দেশ— /—/
* রেফ বসাতে নির্দেশ-চিহ্ন— ᐟ
* উদ্ধৃতি-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ— ‶ / ″ / ‵ / ′
* ঊর্ধ্বকমা বসাতে হলে— ᐟ
* সেমিকোলন বসাতে হলে— ;
* বিস্ময়-চিহ্ন বসাতে হলে— !
* জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসানোর নির্দেশ দিতে হবে— ?
* উহ্য রাখার চিহ্ন— ....
* ঐচ্ছিক চিহ্ন দিতে হলে— (/)
* শব্দের তলায় মোটা দাগ দিন— O̲/

❑ হরফ বা অক্ষর সম্পর্কিত চিহ্ন :

* ইংরেজি Capital অক্ষর বসাতে হলে— Cap.
* ইংরেজি Small বা ছোটো অক্ষর বসাতে হলে— L.C. / l. c.

* ইংরেজি Small Capital অক্ষর বসাতে হলে—	S.C. / s. c.
* হরফের টাইপ ফেস্ বদলাতে হলে কী ধরনের টাইপ বা কত Point-এর টাইপ দরকার তা জানতে হলে—সংক্ষেপে	Ital–(Italics–বাঁকা হরফ) (Normal–সাধারণ হরফ) (Bold–মোটা হরফ F_2)
* ছোটো টাইপে পরিবর্তন করুন—	♀ /
* বড়ো টাইপে পরিবর্তন করুন—	♂ /
* ভাঙা-টাইপ বদলাতে হলে তার প্রতীক চিহ্ন—	×
* অন্য আকারের হরফ দিন—	⊠ /
* রোমান হরফে পরিবর্তন করুন—	Ⓥ /
* ইটালিকে পরিবর্তন করুন—	॥ /

৭.৭. প্রুফ সংশোধন- সংশোধিত শুদ্ধরূপ

পাণ্ডুলিপি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

কম্পোজ ম্যাটার

কিনু গোয়ালারগলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই
নোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধ্বসে গেছে বালী,
মাঝে স্যাতা-পড়া দাগ।
প্রুফ সংশোধন
কিনু গোয়ালার/গলি। গোয়ালার/গলি-#/

দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই   ।/
লো/ নোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধ্বসে গেছে বালী,   ধ/ী/
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

❑ পাণ্ডুলিপি

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদদুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্ তল্ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল, ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষাবসানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল যে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকেল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম।

রবীন্দ্রনাথ

☐ কম্পোজ ম্যাটার

বিলায় খলম চমৎকাররোদদুর উঠেছেই
জল ল্‌ততল্‌ থৈথৈ করচে। নদি লজ
এবন তির পায় সম তল ধানের খেত
সুনদর লাগিল সে এআর
কী বল বদুপুর বিলা খও কএ পসলা
হয়ে গেল তার পরে বৈকেলে
পদ্দার ধারে আমাদের নাকেল বনের
মধ্য সুর্যাস্ত হল আমি নন্দর
ধার বেড়া চ্ছিলুম

রবীন্দ্রনাথ

☐ প্রুফ সংশোধন

ে/উঠে/দে/	বিলায় //খলাম চমৎকাররোদ‿দুর উঠেছেই	᠆/ D/
See copy /	/জল ল্‌ তত তল্‌ থৈ থৈ করচে। নদি ল জ	trs./র/ছ/D/ী/র/trs./
ং/ D/ী	এবন তি র পায় সম‿তল/ ধানের খেত	প্র/ ᠆/ , / ক্ষ/
ন্দ/	সুনদর লাগিল সে এআর	D/ য / D/
᠆/ \/	কী বল ব। দুপুর বিলা খব ক এ পসলা	ে/ খু/ এক/ শ/
বৃষ্টি /	/হয়ে গেল তার‿পরে বৈকেলে	\/ খু/ ᠆/ ি/
দ্মা /	পদ্দার ধারে আমাদের নাককেল/ বনের	র/ -/
ে /	ম/ধ্য সুর্যাস্ত হল/ আমি নদর	\/ ী/
ে /	ধার বেড়া‿চ্ছিলুম	উঠে/আস্তে অস্তে/ ᠆/
		রবি/দ্রনাথ বী ᠆/

☐ পাণ্ডুলিপি

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন—
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি',
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়, মন,
মজিনু বিফল তাপে অবরেণ্যে রবি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

❒ কম্পোজ ম্যাটার

হে বঙ্গ, ভাণ্ডা রেঁই তব বিবিদ তরন—
তা সব অবোদ আমি) উবহিলা করি',
পরেরধনলোবে মত্ত, করি নু ভমন
পরর দিশে, ভিক্ষাবৃততি কুখনে আচরি।
কাটাইলাম বউদিন সুখ পরি হারি।
নিদ্রাই, অনি হারেক সঁপি কায়, মন,
মজিলু বিফল তা পে অবারণ্যে রবি;
কেলিলু সৈবালে; কমল-কাননে!

❒ প্রুফ সংশোধন

./ ⌒/ D/	হে বঙ্গ/ ভাণ্ডা⌒রেঁই তব বিবিদ/ তরন—	ধ/ D/ -/
ে/ (/ ধ/	তা স//ব/ অবোদ/ আমি/) উবহিলা করি',	ি/ !/ অ/ D/
D/ D/ -/ -/	পরের /ধন/লোবে মত্ত, করি⌒নু ভমন/	ভ/ ⌒/ ভ্র / ণ/
D/ D/ ⌒/ ে/	পরর⌒দিশে, ভিক্ষাবৃততি কুখনে আচরি।	ↄ/ ও/ ক্ষ/ ণ/ ি/
নু/ D/ D/	কাটাইলাম বউদিন সুখ পরি⌒হারি।	হু/ ⌒/ D/
অ/ য়/	/নিদ্রাই, অনি/ হারেক সঁপি কায়, মন,	D/ ˈ/ D/ ˚/ ./
নু/	মজিলু বিফল তা⌒পে অ⌒বারণ্যে রবি;	⌒/ ⌒/ D/ ব/ র/
নু/ শৈ/	কেলিলু সৈবালে;/কমল/কাননে!	ভুলি/ -/ D/

❒ কম্পোজ ম্যাটার

হে বঙ্গ, ভাণ্ডা রেঁই তব বিবিদ তরন—
তা সব অবোদ আমি) উবহিলা করি',
পরেরধনলোবে মত্ত, করি নু ভমন
পরর দিশে, ভিক্ষাবৃততি কুখনে আচরি।
কাটাইলাম বউদিন সুখ পরি হারি।
নিদ্রাই, অনি হারেক সঁপি কায়, মন,
মজিলু বিফল তা পে অবারণ্যে রবি;
কেলিলু সৈবালে; কমল-কাননে!

❒ প্রুফ সংশোধন

./ ⌒/ D/	হে বঙ্গ/ ভাণ্ডা⌒রেঁই তব বিবিদ/ তরন—	ধ/ D/ -/
ে/ (/ ধ/	তা স//ব/ অবোদ/ আমি/) উবহিলা করি',	ি/ !/ অ/ D/
D/ D/ -/ -/	পরের /ধন/লোবে মত্ত, করি⌒নু ভমন/	ভ/ ⌒/ ভ্র / ণ/
D/ D/ ⌒/ ে/	পরর⌒দিশে, ভিক্ষাবৃততি কুখনে আচরি।	ↄ/ ও/ ক্ষ/ ণ/ ি/
নু/ D/ D/	কাটাইলাম বউদিন সুখ পরি⌒হারি।	হু/ ⌒/ D/
অ/ য়/	/নিদ্রাই, অনি/ হারেক সঁপি কায়, মন,	D/ ˈ/ D/ ˚/ ./
নু/	মজিলু বিফল তা⌒পে অ⌒বারণ্যে রবি;	⌒/ ⌒/ D/ ব/ র/
নু/ শৈ/	কেলিলু সৈবালে;/কমল/কাননে!	ভুলি/ -/ D/

প্রুফ সংশোধন- অনুশীলনী

মূল কপি-১

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরা মুক্তামানিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

প্রুফ কপি

একথা জানিতে তুমি শা-জাহান ভারত-ঈশ্বর,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
শুধু তব অন্তরবেদনাচিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তনদ্রাতলে হয় হোক লিন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস।
নিত্যউচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
হীরা মুক্তামানিক্যের ঘটা
এই তব মনে ছিল আশ।
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,

শুধু থাক্ একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল এ তাজমহল।

মূল কপি-২

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, সেইসময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে-বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে-সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শঙ্খ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

প্রুফ কপি

আমার যখন বয়স ছিল ইংলণ্ডে গিছিলেম সেই সময় জন্ বইটের মুখ থেকে পার্লামেণ্টে এবং তার কোনো বাহিরে কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যপ্তি জাতীগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমারআজপর্যন্তমনেআছে এবং আজকের এই ভ্রষ্ট দিনেও আমার পূবস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুক প্রশংসার বিষয় ছিল আমাদের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি, তা বিদেশীয়কে আশ্রয় ক'রে প্রকাশ পেলেও, আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি কারণ, মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। ইংরেজের যে-সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তারবিজয়শংখ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

॥ ৩ ॥

✣ মূল কপি :

পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ? এই ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল, যে পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল, সাগর নাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল।

✣ প্রুফ কপি :

"পৃথক, তুমি পথহা রাহায়ছ?" এই ধ্বনি নর্বব্যু বের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ কি উত্তর করিতে হইবে, কিন্তু মানেই ইলনা। ধ্বনিযে হর্ষবি কম্পিত হইয়া বেড়াইতে গিল; যেন পরণে সেই ধ্বনি বহিন বক্ষপত্রে মর্মবিত হইতে লাগিল, সাগর নাচে যে মন্দিভূত হতে লাগিল।

॥ ৪ ॥

✣ মূল কপি :

রঘুপতির যুক্তি ছিল, আমাদের প্রতিমা নির্মাণ করতে হয় মুর্খ সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য—আসলে যে দেবী মহাশক্তিময়ী ও অদৃশ্য, তিনি হত্যার লীলাই চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়ত, সুতরাং বলিদানে তাঁর অরুচি নেই। নাটকের এই প্রত্যেক দ্বন্দ্ব, তার জটিলতা এবং পরিণতি আমরা দেখেছি।

কিন্তু এর গভীরে আর একটি ভাবসত্য থাকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথেরই মানস উপলব্ধি, ফল্গুধারার মতো নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাট্যরচনার অব্যবহিত পরে 'সোনারতরী' কাব্যে উল্লেখ করেছিলেন। প্রায় সমসাময়িক প্রবন্ধেও এর উল্লেখ আছে।

✣ প্রুফ কপি :

রাঘুপতির্ঁ মুক্তি ছিল, আমাদের প্রতিমা নির্মাণ করতে হয় মুর্খ সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য আসল, যে দেবীশ মহাশক্তিময়ী ও অদৃশ্য

তিনি হত্যার লীলাই চালিয়ে যাচ্ছেন নিয়ত, সুতরাং বলিদান তাঁর অরুচি নেই রনাটকে এই প্রত্যক্ষদ্বন্দ্ব, তার জটিলতা এবং পরিণতি আমরা দেখেছি।

কিন্তু এর গভীরে আর একটি ভার সত্য যাকে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথেরই মানস উপলব্ধি, ফল্গুধারার মন নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' নাট্য রচনার অব্যবহিত পরে 'সোনারতরী' কাব্যে উল্লেখ করেছিলেন, প্রায় সমসাময়িক প্রবন্ধেও উল্লেখ এর আছে।

॥ ৫ ॥

✣ মূল কপি :

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত অসম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু চাইলেই তো মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায় চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক।

✣ প্রুফ কপি :

আজ আমাদের অনেকেরই ইয়ুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এমন দেশে এমন একজন ভারতবাসি নেই যে এই প্রাচীন পবী এ মাতৃভূমির নষ্ট-গোরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরীজীবিত না দেখতে চায় কিন্তুকে কেরল তো মেলে না, পারার করতে হয়। এ উপায়ের পথেইস সত বিগ্ন সত যতভেদ এবক এইখানেই একটি বসুকে আমতো মাদের চিরজীবনের চরম সত্য বলে। অবলম্বন করতে অনুরোধ করি এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপনা করা। মার সা দাবীতা কেতা পেতে দাও তা যে সেখানে এবং সারই হোক।

॥ ৬ ॥

✣ মূল কপি :

বেতন পঁচিশ টাকা
        সদাগিরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরাণি
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
        ছেলেকে পড়িয়ে

শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে। ("বাঁশি")

❖ প্রুফ কপি :

বেতন পঁচশ টাক
সদা গরি আফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী।
খতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে
শেয়াল স্টেশনে যাই
সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি
আলো জালাবার বাঁচ। ("—বাঁশি)

॥ ৭ ॥

❖ মূল কপি :

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, শিক্ষা মানুষের পূর্ণাঙ্গ চেতনা আনে, জীবনবোধের চেতনা ঘটায়। চিত্তের বিকাশ শিক্ষার অন্তরঙ্গ বিষয় হওয়া উচিত। যে শিক্ষা মানুষের চেতনাকে আলোকিত করতে পারে না তা মূল্যহীন। পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি, অনেকাংশে যান্ত্রিক, ফলত প্রাণহীন। সেকালে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষা এদেশের মানুষকে কেরাণী তৈরীর যন্ত্রে রূপায়িত করেছে; কিছু মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিল, দেশের অবশিষ্ট মানুষ অজ্ঞানরূপ তিমির আচ্ছন্ন হয়ে থেকেছিল। বস্তুত সেই শিক্ষা ভারতবর্ষে সার্বজনীন শিক্ষা হয়ে উঠতে পারেনি। হয়ে উঠতে পারেনি জীবনের অন্তরঙ্গ সাথী। রবীন্দ্রনাথ এই প্রাণহীন যান্ত্রিকশিক্ষাকে স্বীকার করে নিতে পারেন নি।

❖ প্রুফ কপি :

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষা মানুষের পুর্নাঙ্গ চেতনা আনে জীবনবোধের চেতনা ঘটায়। চিতের বিকাশস শিক্ষার অন্তরঙ্গ বিকাস হওয়া উচিত। যে শিক্ষা মানুষের চেতনাতে আলোকিত করতে পারে না তা মূল্যহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি অনেকাংশে যান্ত্রিক, ফলত প্রাণহীন? সেকালে প্রবর্তিত ইংরাজি শিক্ষা এদেশের মানুষকে কেরাণী তৈরীর যন্ত্রে রূপায়িত করেছে, কিছু মানুষ এই শিক্ষা লাভ করতে পেরেছিল, দেশের অবশিষ্ট মানুষ অজ্ঞানরূপ তিমির রূপ আচ্ছন্ন করে থেকেছিল বস্তুত সেই শিক্ষা

ভারতবর্ষে সার্ব জনীন শিক্ষা হয়ে উঠতে পারেনি হয়ে উঠতে পারেনি অন্তরসাথী। রবীন্দ্রনাথ প্রাণহীন যান্ত্রিকশিক্ষাকে স্বীকার করে নিতে পারেনি।

॥ ৮ ॥

+ মূল কপি :

বহুমুখী প্রতিভাধর উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি তৃতীয় সন্তান। সুখলতা রায় আর সুকুমার রায়ের ছোটোবোন, আমাদের মা পুণ্যলতা, নিজেও ছোটোদের জন্যে চমৎকার লিখতেন, তবে তিনি কম লিখেছেন, বেশিরভাগই শেষ বয়সে। পুণ্যলতা ছিলেন বেথুন কলেজের কৃতী ছাত্রী। বিবাহিত জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী অরুণানাথ চক্রবর্তীর কর্মক্ষেত্রে, বিহারের ছোটো ছোটো শহরে। সার্থক ছিল তাঁর ডাক নাম খুশি। যেখানেই যেতেন, তিনি সেখানকার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতেন। আমরা দুটি বোন, কাকা-কাকিমা খুব অল্প বয়সে মারা গেলে তাঁদের তিনটি ছেলে-মেয়ে, এই পাঁচজনকে নিয়ে মা সুখের সংসার রচনা করেছিলেন।

+ প্রুফ কপি :

বহুমুখী প্রতিভাধর উপেন্দ্রকিশর রায়চৌধুরীর তিনি তৃতীয় সন্তান। সুখলতা রায় আর সুকুমার রায়ের ছোটোবন, আমাদের মা পুণ্যলতা নিজেও ছোটদের জানে চমৎকার লিখতেন। তবে তিনি কম লিখেছেন, বেশির ভাগই শেষ বয়সে পুণ্যলতা ছিলেন বেথুম কলেজের কীর্তিছাত্রী। বিবাহিত জীবনের প্রায় সবটাই কেটেছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামী অমরনাথ চক্রবর্তীর কর্মক্ষেত্রে, বিবাহ হয় ছোটো শহরে। সার্থক ছিল তার নামডাক খুশি। যেখানেই যেতেন, তিনি সেখানকার সঙ্গে খাপ সাইয়ে অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তুলতে পারতেন আমরা। দুটি বোন, কাকি-কাকিমা খুব অল্প বয়সে মারা গেলে তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে, এই পাঁচজনকে নিয়ে মা সুখের সংসার রচনা করেছিলেন।

॥ ৯ ॥

+ মূল কপি :

অবশেষে ভূতনাথবাবু তাঁর জবানবন্দি দিতে কাঠগড়ায় উঠলেন। তিনি অল্পবয়সি নন। কিন্তু তাঁর পা দুটো এমন রোগা পটকা ভিখিরি বালক কাঙালিচরণের মতো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

উনিশ বছর ধরে শরিকি কোন্দলে তিনি জেরবার। তিনি নিজে নির্বিবাদী, গান্ধিজির ভক্ত। তরুণ বয়েসে সাহেবিয়ানা করেছেন প্রচুর। কিন্তু এখন চাকরিতে মাইনে বাড়া সত্ত্বেও জুতো জোড়া সেলাই করে চলে। সংসার বেড়েছে মা ষষ্ঠীর কৃপায়। (মনের তেজি ভাবটা আর নেই)।

কাঠগড়ায় উঠে তিনি কোনো রকমে জোর করে জজ সাহেবকে নমস্কার করলেন। কেন জানি তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি ফাঁসির আসামি। গম্ভীর জজসাহেব এক্ষুণি ডেথ্ সেন্টেন্স্ উচ্চারণ করে কব্জির চাপে কলমের নিবটি ভাঙবেন।

✢ প্রুফ কপি :

অবশেষে ভূতনাথ বাবু তাঁর জবানবন্দী দিতে কাটগড়ায় উঠলেন। তিনি অল্পবয়সী নয়। কিন্তু তাঁর পা-দুটো রোগা পট্‌ক্ ভিখিরি বালক কাঙালীচরণর মতো ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

উনিশ বছর ধরে শরিকী কন্দলে তিনি জেরবার। তিনি নিজে নির্বিবাদি, গান্ধিজীর ভক্ত। তরুণ বয়েসে সাহেবিআনা করেছেন প্রচুর। কিন্তু এখন চাকরীতে মাইনে বাড়া স্বত্বে ও জুতো জোড়া সেলাই করে চলে। সংসারে বেছেড়ে মা ষষ্ঠীর কৃপায়। মনের তেজী ভাবটা আর নেই।

কাঠগড়ায় উঠে তিনি কোনোরকমে হাত জোরা করে জজসাহেবাকে এক্ষুণি তাঁর ডেথ্ সেন্টেন্স্ উচ্চারণী করে কব্জীর চাপে কলমের—নিবটা ভাঙবেই।

৭.৮. গ্রন্থপঞ্জি

১। ডঃ তারকনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০২৩।

২। জগমোহন মুখোপাধ্যায়, 'গবেষণাপত্র অনুসন্ধান ও রচনা', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জানুয়ারি ১৯৯২।

৩। রমেন ভট্টাচার্য, 'বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম', সাহিত্য সংসদ, ২০১৬।

৪। ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি', দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৯০।

একক ৮: সম্পাদনার প্রকারভেদ

৮.১. উদ্দেশ্য

৮.২. প্রস্তাবনা

৮.৩. সম্পাদনার কয়েকটি দিক

৮.৪. সম্পাদকের কর্তব্য

৮.৫. সম্পাদনের প্রকারভেদ

৮.৫.১. পুঁথি সম্পাদনা

৮.৫.২. বই সম্পাদনা

৮.৫.৩. সংবাদপত্রের সম্পাদনা

৮.৬. অনুশীলনী

৮.৭. গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্পাদনার গুরুত্ব কোথায় সে বিষয়ে জানা যাবে এই পাঠ্য অংশে। সম্পাদনা বিষয়ে কয়েকটি সাধারন বিষয় জানব। যেমন

১) সম্পাদনা কাকে বলে?

২) সম্পাদক কে?

৩) সম্পাদকের দায়িত্ব কিরকম হয়ে থাকে

৪) সম্পাদনার নানান গুরুত্বপূর্ণ দিক

৫) সম্পাদনা কত রকমের হয়

৬) পুঁথি, বই সম্পাদনা কীভাবে হয়।

৭) সংবাদপত্র সম্পাদনা কীভাবে হয় ইত্যাদি

৮.২. প্রস্তাবনা

'সম্পাদনা'- শব্দের অর্থ সম্পূর্ণকরণ, নিষ্পাদন। অর্থাৎ কোনো কাজকে পরিমার্জিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করা। এই কাজ আমরা প্রতি মুহূর্তে করতে থাকি। এই যে কথা বলছি বা একটি বাক্য লিখছি; সেক্ষেত্রেও চলে পরিমার্জনার কাজ, সম্পাদনার কাজ। বলবার বা লেখবার আগে আমাদের আসে ভাবনা। হাজারও ভাবনাকে একজায়গায় করে আমরা সম্পাদনা করে চয়ন করছি কিছু শব্দ। তারপর তা

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

বলছি বা লিখছি ভাবপ্রকাশের জন্য। তাই সম্পাদনার নানা ধরনের হতে পারে। বই, সংবাদপত্র সম্পাদনা যেমন হতে পারে তেমনি গান, ছবি, সিনেমা সবই সম্পাদিত হয়ে থাকে। আবার টেলিভিশন, বেতার বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠানেরও সম্পাদনা হয়ে থাকে। এই সব বিষয়ের মধ্যে এখানে আমরা লিখিত বিষয়ের সম্পাদনা নিয়েই মূলত কথা বলব। যে কোনো লেখা বিষয়ের সম্পাদনার সঙ্গে প্রকাশনার যোগ রয়েছে। আর প্রকাশনার সঙ্গে ব্যবসায়ের। ফলে কাদের জন্য কী বিষয়ের লেখা কী উদ্দেশ্যে ছাপা হচ্ছে সে বিষয়ের সম্যক ধারনা যাঁর থাকে তিনিই সম্পাদক। সম্পাদক লিখিত আকারে যে ভাবনা রয়েছে তাকে সুষ্ঠুভাবে পাঠকের সামনে হাজির করেন। লেখাকে ছাপার উপযোগী করেন। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বা গ্রন্থ যে কোন প্রকাশনার জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন।

৮.৩. সম্পাদনার কয়েকটি দিক

সম্পাদনার ভূমিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রকাশক প্রকাশনা-ব্যবসায় কীভাবে কতটুকু সাফল্য অর্জন করবেন তা বহুলাংশে নির্ভর করে তার সম্পাদনা নীতি ও কার্যক্রমের ওপর। অনেকে একে প্রকাশকের ‘ব্যবসায়ী বুদ্ধি, সামাজিক বিবেচনা এবং সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির’ সঙ্গে একীভূত করে দেখতে চান। প্রকাশনা নীতি এবং সম্পাদনা নীতির মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য না থাকলেও এ দুটি অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠু সম্পাদনা নীতির ওপরই সুষ্ঠু প্রকাশনা-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। এ জন্য প্রকাশনা নীতি তথা সম্পাদনা নীতির দিকটি যে-কোন প্রকাশন সংস্থার কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়ে থাকে। প্রকাশন সংস্থার চরিত্র অনুসারে এই নীতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন, সরকারি প্রকাশন সংস্থার প্রকাশনা নীতি বেসরকারি যে-কোনো প্রকাশন সংস্থা কিংবা পুরোপুরি একাডেমিক প্রকাশন সংস্থার প্রকাশন নীতির সমতুল্য নয়। বড় প্রকাশন সংস্থার ব্যবসায়িক ও প্রকাশনা নীতিমালার সঙ্গে ছোট একটি প্রকাশন সংস্থার ব্যবসায়িক ও প্রকাশনা নীতিমালার অনেক অমিল লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সব কিছুর ওপরে প্রকাশনা নীতির একটি মৌল কর্মধারা রয়েছে যা কোনো প্রকাশকের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এই কর্মধারা নির্ধারিত হতে পারে:

- দেশকালের পটভূমিতে প্রকাশিতব্য বইয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ
- প্রকাশিতব্য বই পাঠকের কতটুকু প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম তা নির্ধারণ
- প্রকাশের সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ
- প্রকাশনা ব্যয়: বিক্রয় উন্নয়ন ও প্রচার ব্যয় সহ অন্যান্য ব্যয়ের সঠিক পরিমাণ নির্ধার উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মূল্য নির্ধারণ
- বইয়ের বণ্টন-পদ্ধতি নির্ধারণ

উক্ত বিষয়াদি সামনে রেখে একজন সম্পাদক তার প্রকাশন সংস্থার জন্য সম্পাদনা-নীতি প্রণয়ন করতে পারেন এবং পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কিংবা নতুন কোনো প্রকাশনা-পরিকল্পনা গ্রহণের

ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারেন। নীতি প্রণয়নের পর যে বিষয়টি অতি জরুরি হিসাবে দেখা দেয় তাহলো সম্পাদনা পরিকল্পনা বা সম্পাদনা কার্যাবলীর রূপরেখা নির্ধারণ। সুষ্ঠু ও গঠনমূলক সম্পাদনা পরিকল্পনার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা নিশ্চিত করা সম্ভব। একখানি ভাল ও উল্লেখযোগ্য বই প্রকাশন সংস্থার সুনাম সুখ্যাতি ও ব্যবসায়িক অবস্থানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা কি সম্পাদনা কাজটিকে প্রকাশন সংস্থার মস্তিষ্ক বলবো? তা হলে হয়তো সম্পাদনাকে একটু বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। আসলে প্রকাশন সংস্থার সমগ্র প্রকাশনা কার্যক্রম একটি 'দলগত উদ্যোগ'। কোনো একটি কার্যভাগ অন্য একটি কার্যভাগ থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবুও কাজের পরিধি, গুণগত মান, ও কাজের গুরত্বের কথা বিবেচনা করে সম্পাদনা কাজটিকে একটু প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন ত্রুটিপূর্ণ ও অবিন্যস্ত নকশা অনুসরণে সুদৃঢ় ও সুরম্য একটি ইমারত নির্মিত হওয়া যেমন অসম্ভব ব্যাপার, সুষ্ঠু সম্পাদনা পরিকল্পনা ছাড়া ত্রুটিমুক্ত প্রকাশনাও সম্ভব নয়। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'প্রকাশিতব্য বিষয়', 'পাঠক', 'লেখক'- এই তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদকের বিবেচনায় প্রকাশিতব্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঠককে গুরুত্ব দিতে হয়।

প্রকাশনকে পাঠক বা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া, তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রকাশনের জোগান দেয়া তার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। একজন সম্পাদক এ উদ্দেশ্য সাধনের সপক্ষে কাজ করে থাকেন। অতএব, সম্পাদককে নতুন কোনো প্রকাশনা-পরিকল্পনা হাতে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পাঠক বা ভোক্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেরানো দরকার। পাঠকের চাহিদা, রুচি, প্রয়োজন এবং সর্বোপরি দেশ ও কালের পটভূমিতে এর অবস্থান- এ সবই সম্পাদকের বিচার-বিবেচনার বিষয়। সম্পাদক যখন পরিকল্পিত প্রকাশনার সঙ্গে উপরিউক্ত বিষয়াদির ওপর সমর্থক ও সহায়ক যুক্তি খাড়া করতে সক্ষম হবেন তখন পরিকল্পিত বিষয় নির্বাচন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে। এরপর সম্পাদক সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ওপর লেখার জন্য অভিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন লেখক অনুসন্ধান করবেন। লেখক যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেহেতু লেখককে লেখা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার তেমন কিছু নেই। কিন্তু সম্পাদক অবশ্যই তার পাঠক সম্পর্কে, পাঠকের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে, সর্বোপরি প্রকাশন-সংস্থার প্রকাশনা নীতি সম্পর্কে লেখককে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে ভুল করবেন না। লেখক নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখেন কিন্তু পাঠক সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, লেখকের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থেকেই যায়। তাই শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে লেখককে সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব সম্পাদকের, অন্য কারো নয়।

একজন সম্পাদকের পক্ষে লেখক নির্বাচন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সম্পাদক তাঁর নির্বাচিত বিষয়ের প্রকাশনার মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত চিন্তা, জ্ঞান ও বার্তাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সম্পাদক ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরে প্রকাশিতব্য বইয়ের বিষয়, প্রকাশন সংস্থার নীতিকে অবশ্যই বেশি প্রাধান্য দেবেন। নির্ধারিত একটি বিষয় নিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য সম্পাদকের বিবেচনায় হয়তো তিনজন লেখক আছেন। এঁদের মধ্যে সম্পাদক কাকে নির্বাচন করবেন? শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা লেখকের পরিচিতি এ-জাতীয় নির্বাচনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। সম্পাদকের বিবেচনায়

সেই লেখকই উপযুক্ত যিনি সম্পাদকের পরামর্শ শ্রবণে যথেষ্ট মনোযোগ দেবেন, সাম্প্রতিক তথ্য পরিরেশনে যত্নবান হবেন, পাঠক বা ভোক্তার রুচি ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেবেন, প্রকাশ্ম সংস্থার নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং সর্বোপরি এ-জাতীয় কাজের জন্য যার হাতে যথেষ্ট সময় আছে এবং নির্ধারিত তারিখে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন।

প্রকাশিতব্য বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে সম্পাদক কি পরিমাণ ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে আগ্রহী সে বিষয়ে তিনি পূর্বেই লেখককে অবহিত করবেন। এ-জাতীয় বই প্রকাশনার পূর্ব নির্ধারিত বাজেটের আলোকেই বিষয়গুলি বিবেচিত হয়ে থাকে। সম্পাদকের সাধ থাকে অনেক কিন্তু সাধ্যের পরিমাণও তাঁর জানা। নির্ধারিত বাজেট অপরিবর্তিত রেখেই সম্পাদককে সকল ইচ্ছার সুসঙ্গত রূপ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।প্রকাশনকে পাঠক বা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়া, তাদের চাহিদা মোতাবেক প্রকাশনের জোগান দেয়া তার অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে। একজন সম্পাদক এ উদ্দেশ্য সাধনের সপক্ষে কাজ করে থাকেন। অতএব, সম্পাদককে নতুন কোনো প্রকাশনা-পরিকল্পনা হাতে নেয়ার সাঙ্গ সঙ্গে এর পাঠক বা ভোক্তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেরানো দরকার। পাঠকের চাহিদা, রুচি, প্রয়োজন এবং সর্বোপরি দেশ ও কালের পটভূমিতে এর অবস্থান- এ সবই সম্পাদকের বিচার-বিবেচনার বিষয়। সম্পাদক যখন পরিকল্পিত প্রকাশনার সঙ্গে উপরিউক্ত বিষয়াদির ওপর সমর্থক ও সহায়ক যুক্তি খাড়া করতে সক্ষম হবেন তখন পরিকল্পিত বিষয় নির্বাচন চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে। এরপর সম্পাদক সংশ্লিষ্ট বিষয়টির ওপর লেখার জন্য অভিজ্ঞ ও মেধাসম্পন্ন লেখক অনুসন্ধান করবেন। লেখক যেহেতু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেহেতু লেখককে লেখা সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার তেমন কিছু নেই। কিন্তু সম্পাদক অবশ্যই তার পাঠক সম্পর্কে, পাঠকের রুচি ও চাহিদা সম্পর্কে, সর্বোপরি প্রকাশন-সংস্থার প্রকাশনা নীতি সম্পর্কে লেখককে একটি স্পষ্ট ধারণা দিতে ভুল করবেন না। লেখক নিশ্চয়ই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান রাখেন কিন্তু পাঠক সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, লেখকের অজ্ঞতা ও উদাসীনতা থেকেই যায়। তাই শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে লেখককে সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশন করার দায়িত্ব সম্পাদকের, অন্য কারো নয়।

একজন সম্পাদকের পক্ষে লেখক নির্বাচন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। সম্পাদক তাঁর নির্বাচিত বিষয়ের প্রকাশনার মধ্য দিয়ে পরিকল্পিত চিন্তা, জ্ঞান ও বার্তাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। সম্পাদক ব্যক্তিগত অভিরুচির উপরে প্রকাশিতব্য বইয়ের বিষয়, প্রকাশন সংস্থার নীতিকে অবশ্যই বেশি প্রাধান্য দেবেন। নির্ধারিত একটি বিষয় নিয়ে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার জন্য সম্পাদকের বিবেচনায় হয়তো তিনজন লেখক আছেন। এঁদের মধ্যে সম্পাদক কাকে নির্বাচন করবেন? শুধু পাণ্ডিত্য কিংবা লেখকের পরিচিতি এ-জাতীয় নির্বাচনের একমাত্র মানদণ্ড হতে পারে না। সম্পাদকের বিবেচনায় সেই লেখকই উপযুক্ত যিনি সম্পাদকের পরামর্শ শ্রবণে যথেষ্ট মনোযোগ দেবেন, সাম্প্রতিক তথ্য পরিবেশনে যত্নবান হবেন, পাঠক বা ভোক্তার রুচি ও চাহিদাকে প্রাধান্য দেবেন, প্রকাশন সংস্থার নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং সর্বোপরি এ-জাতীয় কাজের জন্য যার হাতে যথেষ্ট সময় আছে এবং নির্ধারিত তারিখে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন।

প্রকাশিতব্য বইয়ের পাণ্ডুলিপিতে সম্পাদক কি পরিমাণ ছবি, মানচিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করতে আগ্রহী সে বিষয়ে তিনি পূর্বেই লেখককে অবহিত করবেন। এ-জাতীয় বই প্রকাশনার পূর্ব নির্ধারিত বাজেটের আলোকেই বিষয়গুলি বিবেচিত হয়ে থাকে। সম্পাদকের সাধ থাকে অনেক কিন্তু সাধ্যের পরিমাণও তাঁর জানা। নির্ধারিত বাজেট অপরিবর্তিত রেখেই সম্পাদককে সকল ইচ্ছার সুসঙ্গত রূপ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

পরিকল্পিত সময়সূচির প্রতি যত্নবান হওয়া এবং সময়সূচি মোতাবেক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজ শেষ করা সম্পাদকের অন্যতম প্রধন কর্তব্য। অনেক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্তকে সামনে রেখে এই সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। পাঠ্যবই প্রকাশনার ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। শুধু পাঠ্যবই কেন, পাঠ্যবহির্ভূত অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। দেশ ও কালের বিশেষ ঘটনা এবং সে সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ কিংবা অনুরাগকে উপলক্ষ করে যদি কোনো বই প্রকাশের পরিকল্পনা বা সংবাদপত্রে বিশেষ নিবন্ধ লেখবার কাজ হাতে নেয়া হয় সেক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়সূচি অনুসরণ করা অপরিহার্য। সমসাময়িক যে কোনো ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়। ঘটনার ঘনঘটা থেমে গেলে, পাঠকের রুচি ও আগ্রহ অবদমিত হলে অত্যন্ত মূল্যবান বইও যথার্থ সমাদর লাভে ব্যর্থ হতে পারে। সাময়িকী প্রকাশনার ক্ষেত্রে তো সময়সূচি কোনো অবস্থাতেই উপেক্ষা করা চলে না। একটি নির্ধারিত তারিখে সাময়িকী প্রকাশ করা একদিকে যেমন অপরিহার্য অন্যদিকে তেমনি সাময়িকীর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববর্তী সংখ্যা বইয়ের বাজারে অনাকর্ষণীয় হয়ে পড়ে। পাঠক বা ক্রেতার কাছে সাময়িকীর চাহিদা ও আকর্ষণ অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্য। তাই, এই সময়টি যাতে পুরোপুরি কাজে লাগানো যায় সে জন্য নির্ধারিত তারিখে সাময়িকীর প্রতিটি সংখ্যা প্রকাশের নিশ্চয়তা প্রদান করা অপরিহার্য।

নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক লেখকের হাত থেকে পাণ্ডুলিপি সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছানোর সকল দায়িত্ব একমাত্র লেখকের নয়, কিছু দায়িত্ব সম্পাদকেরও। লেখকের কাজের অগ্রগতির প্রতি সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখা সম্পাদকের কর্তব্য। পাণ্ডুলিপির এক একটি অধ্যায় লেখা শেষ হলেই সম্পাদক তা 'দ্রুত পড়ে ফেলবেন এবং কোনো পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভব করলে তা লেখককে জানাবেন। লেখক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার কাজে কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করছেন কিনা সে সম্পর্কে সম্পাদক সর্তক দৃষ্টি রাখবেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটি শেষ করবেন। এক্ষেত্রে সম্পাদক কি লেখকের খ্যাতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা মেধা বিচার করে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করবেন? কখনই না। লেখকের ব্যক্তিগত পরিচিতি এখানে গৌণ, মুখ্য বিষয় হলো: সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদকের কোনো পূর্বপরিকল্পনার সহায়ক কিনা তা পরীক্ষা করা ও পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান আছে কিনা তা দেখা। এ সকল বিষয়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব মিললে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে পাণ্ডুলিপিটি যদি প্রকাশন-সংস্থার নীতিবহির্ভূত কোনো বিষয়নির্ভর না হয় এবং যথেষ্ট আর্থিক সাফল্য এনে দিতে পারে এবং পাঠক বা ভোক্তার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয় তা হলে এমন পাণ্ডুলিপি

সম্পাদকের প্রাথমিক বিবেচনায় মনোনীত হতে পারে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে সম্পাদক পাণ্ডুলিপির অন্যান্য বিষয় ছাড়াও পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত বক্তব্য ও তথ্যাদি, এতসম্পর্কিত সাম্প্রতিক জরিপ ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা পরীক্ষা করবেন। সব দেশে সব কালে এমন কিছু লেখক থাকেন যারা বিরল ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তাঁদের কাছ থেকে যখন কোনো পাণ্ডুলিপি আসে তখন তা সম্পাদনার তেমন কোনো সুযোগ সত্যি থাকে না, প্রকাশক বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেন। এ ধরনের লেখকের লেখার বিচারক বিপুল পাঠকগোষ্ঠী। পাঠকের বিচারে তাঁরা প্রশংসিত লেখক। প্রকাশক যদিও এঁদের পাণ্ডুলিপি নির্বাচন কালে যথাযথ সম্পাদনার প্রয়োজন বোধ করেন না, লেখকের নামেই বইয়ের কাটতি সুনিশ্চিত, তথাপি একজন সাবধানী প্রকাশক তাঁর সম্পাদককে পাণ্ডুলিপিটি অবশ্যই আদ্যপান্ত পড়ে দেখতে বলবেন। লেখকের সঙ্গে সম্পাদকের ব্যক্তিগত পরিচয় বন্ধুত্ব কিংবা অনুরাগ সম্পাদনা-কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য সম্পাদনা-কাজ শুরু করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপির লেখক সম্পর্কে পুরোপুরি উদাসীন থাকতে হবে, অন্তরঙ্গতার সকল ছাপ মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিরপেক্ষ ও পক্ষপাতবিবর্জিত সম্পাদনা অপরিহার্য।

প্রখ্যাত একটি পাণ্ডুলিপি এবং স্বল্প পরিচিত কিংবা পুরোপুরি অজ্ঞাত লেখকের একটি উভয়ই সমান গুরুত্ব নিয়ে যদি সম্পাদকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে তা হলে কোনো পাণ্ডুলিপিই সম্পাদকের সুবিচার লাভে ব্যর্থ হবে না। সম্পাদক কোনো অজ্ঞাত লেখকের পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারেন, লেখক সৃষ্টির গৌরবে সম্পাদক গৌরবান্বিত হতে পারেন। এভাবে সম্পাদক খোলা মন নিয়ে পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার মধ্য দিয়ে প্রকাশনা জগতে অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে পারেন। শুধু একের পর এক বই মুদ্রণ ও প্রকাশ করাই প্রকাশকের একমাত্র কর্তব্য নয়- নতুন লেখক সৃষ্টি করা, প্রকাশনা ক্ষেত্রে নতুন লেখকের আবির্ভাব সুগম করা প্রকাশকের নীতিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। প্রকাশকের স্বার্থে সম্পাদক এই গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রত্যেক লেখকের একটা নিজস্ব স্টাইল বা লেখনভঙ্গি থাকে যা সবসময় সকল সম্পাদকের পছন্দ হবে এমন নয়। সামান্য পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করলে যে পাণ্ডুলিপি গ্রহণযোগ্য হতে পারে তাকে আগেই অমনোনীত করে দেওয়া ঠিক নয়। সম্পাদককে লেখককে দিয়েই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়ে নিতে হবে। যে কোনো প্রকাশনা-সংস্থার জন্য লেখক বিশেষ সম্মানের দাবিদার। লেখকের পরিশ্রমের ফসল হিসাবে চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের জন্য পরোক্ষ মূলধন এবং এই মূলধনকে সম্বল করে প্রকাশক উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যান। অতএব লেখক নির্বাচন বা পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার সূত্র ধরে কোনো বিক্ষুব্ধ লেখকগোষ্ঠী যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে সম্পাদক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি দেবেন।

সম্পাদনার কাজে সম্পাদককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। তিনি যে বিষয়ের পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করবেন সে বিষয়ে তার যদি কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা না থাকে তবে তার পক্ষে এ কাজ অত্যন্ত দুরূহ হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকের নিজস্ব জ্ঞান, দৈনন্দিন

কাজের অভিজ্ঞতা, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞান পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদককে উপযোগী করে তোলে। প্রকাশনার কলাকৌশল সম্পর্কেও সম্পাদকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বইয়ের আকার, ছবি ও রঙের ব্যবহার, নির্দিষ্ট টাইপ-ফেসের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক পরামর্শ সম্পাদকের কাছ থেকেই আসে। মুদ্রণ ও প্রকাশনা কাজে নিয়োজিত কর্মীদল সম্পাদকের এই প্রাথমিক পরামর্শগুলো কারিগরি দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালন করেন। হিসাবরক্ষণ ও বাজেট-সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পাদক অবশ্যই একেবারে অনভিজ্ঞ ও উদাসীন হবেন না। প্রকাশন ব্যবসায় টিকে থাকার জন্য সম্পাদনা রীতিনীতির সঙ্গে ব্যবসায়িক কলাকৌশলের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে যে সতর্ক উক্তিটি খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, তা হলো, যদি কোনো প্রকাশক বা সম্পাদক কোনো বই বা বইয়ের বিষয়বস্তুর প্রতি খুব বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন তাহলে সেই প্রকাশক বা সম্পাদক প্রকাশন-ব্যবসাকে একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দেবেন।

৮.৪. সম্পাদকের কর্তব্য

পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কোনো একক ব্যক্তির কাজ নয়। অধিকাংশ প্রকাশন-সংস্থার একটি সম্পাদনা দপ্তর থাকে। এই দপ্তরের জনশক্তি প্রকাশন-সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে ছোট কিম্বা বড় হয়ে থাকে। প্রধান সম্পাদক তার কপি-সম্পাদক এবং সহযোগী সম্পাদকদের সহযোগিতায় পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজ করেন। সংক্ষেপে সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো এভাবে দেখানো যেতে পারে।

১. পাণ্ডুলিপির প্রকৃতি নির্ণয় এবং লেখক নির্বাচন

প্রকৃতি নির্ণয়ে প্রকাশিতব্য বইয়ের আলোচ্য বা বক্তব্য বিষয় বিবেচনা, তথ্য ও উদ্ধৃতিমালার যথার্থতা বিচার, রচনা ব্যাকরণ ও ভাষাশৈলীর যথাযথ প্রয়োগ বিশ্লেষণ এবং এ সবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একজন উপযুক্ত লেখক নির্বাচন এবং দায়িত্ব অর্পণ, এ জাতীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। লেখক নির্বাচনে সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়ানোর জন্য সম্পাদক লেখককে তার পাণ্ডুলিপির একটি অংশের লেখা শেষ করে তা নমুনা হিসাবে জমা দেয়ার অনুরোধ জানাতে পারেন। সম্পাদক এটিকে তার পাণ্ডুলিপি মূল্যায়নের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন এবং যথার্থ বিবেচিত হলে পরবর্তী অধ্যায়গুলো লিখতে বলবেন। প্রকাশনার আনুমানিক ব্যয়ভারও এ পর্যায়ে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

২. লেখকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন

পাণ্ডুলিপির বিষয় ও লেখক নির্বাচন চূড়ান্ত হলে সম্পাদক প্রকাশকের পক্ষে লেখকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে একটি চুক্তি সম্পাদন করবেন। এই চুক্তিপত্রে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে লেখককে দেয় সম্মানীর পরিমাণ ও তা পরিশোধের পদ্ধতি এবং পাণ্ডুলিপি জমা দেয়ার সময়সীমা অবশ্যই লিপিবদ্ধ হতে হবে।

৩. সম্পাদনা-নীতি নির্ধারণ ও পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা

ক. সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পর প্রধান সম্পাদক তার সহযোগী সম্পাদকদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করবেন। প্রকাশন-সংস্থার মৌলনীতির সঙ্গে এই নীতির কোনো বিরোধ থাকবে না। পাণ্ডুলিপিতে চিত্র সংযোজনের যৌক্তিকতাও এই পর্যায়ে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

খ. সম্পাদক-নির্দেশিত নীতির আলোকে কপি-সম্পাদক পাণ্ডুলিপি পাঠ করবেন এবং এর ভাষাশৈলী, বানান, তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদির যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। বানানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধারা বা রীতি ব্যবহৃত হলেও সংশ্লিষ্ট পাণ্ডুলিপিতে প্রচলিত ধারা বা প্রকাশন-সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত বিশেষ একটি ধারা অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানের ক্ষেত্রে এবং তৎসম শব্দের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো একটি রীতি সম্পাদক বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করবেন। কপি-সম্পাদক পাণ্ডুলিপির অধ্যায়, শিরোনাম, ভাল করে পরীক্ষা করবেন এবং বইয়ের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠা যেমন, অর্ধনাম-পৃষ্ঠা, নাম পৃষ্ঠা, গ্রন্থস্বত্ব-পৃষ্ঠা বা মুদ্রণ তথ্যাবলী-পৃষ্ঠা সহ প্রসঙ্গকথা, উৎসর্গপত্র, সূচিপত্র বিষয়ক বইয়ের প্রারম্ভিক পৃষ্ঠাসমূহ প্রচলিত বিধি ও ক্রম অনুসারে তৈরি করবেন।

কপি-সম্পাদক পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের উপযোগী রঙ ও টাইপ ব্যবহারের নির্দেশ লিপিবদ্ধ করবেন এবং কাগজ ও বইয়ের আকৃতি সম্পর্কেও পরামর্শ দেবেন।

গ. কপি-সম্পাদক কর্তৃক প্রাথমিকভাবে সম্পাদিত পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য প্রধান সম্পাদকের কাছে প্রেরিত হয়। প্রধান সম্পাদক পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন বিষয় পুনরায় পরীক্ষা করে দেখেন এবং সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ বলে গৃহীত হলে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেন। সম্পাদক এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে, পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অধ্যায় সম্পর্কে লেখকের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করতে পারেন এং বিশেষ কোনো পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভূত হলে লেখককে দিয়ে তা করিয়ে নিতে পারেন।

৪. মুদ্রণের জন্য পাণ্ডুলিপি প্রেরণ

চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য সম্পাদক প্রকাশন-সংস্থার উৎপাদন বিভাগে পাঠিয়ে দেন। উৎপাদন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ নির্দেশাবলী অনুসরণে তা মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। মুদ্রণকাজ শুরু করার পূর্বে কিংবা মুদ্রণকাজ চলাকালে উৎপাদন বিভাগ প্রয়োজনবোধে সম্পাদক ও বইয়ের নকশা প্রণেতার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন।

৫. প্রুফ সংশোধন করা

মুদ্রণালয় বা প্রকাশন-সংস্থার উৎপাদন বিভাগ প্রাথমিক প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু চূড়ান্ত প্রুফ সংশোধন ও ছাপার নির্দেশ দেয়ার দায়িত্ব পালন করেন সম্পাদনা দপ্তর। সম্পাদক লেখককেও এ কাজে নিয়োজিত করতে পারেন। কিন্তু এ কাজে লেখকের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা

উচিত নয়। প্রুফ পাঠ করার সময় লেখক প্রুফের মুদ্রণপ্রমাদ লক্ষ্য করার চেয়ে নিজের লেখার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং এভাবে একপ্রকার সুখানুভূতির মধ্য দিয়ে নিজের লেখা দ্রুত পাঠ করেন, প্রুফ সংশোধনের কথা তাঁর মনেই থাকে না। লেখার প্রুফ পাঠ করার সময় অনেক লেখক রচনার পরিবর্তন ও পরিমার্জনের প্রতি বেশি মনোযোগ দেন, যার ফলে সাধারণ মুদ্রণপ্রমাদও লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। পাণ্ডুলিপি মুদ্রণকালে লেখক যাতে পাণ্ডুলিপিতে তথ্যগত পরিমার্জন ছাড়া রচনার উৎকর্ষ সাধনের প্রচেষ্টায় কোনো পরিবর্তন না আনেন সেদিকে সম্পাদক সতর্ক দৃষ্টি দেবেন। সম্পাদকই মূলত প্রুফ সংশোধন করেন এবং নির্ভুল ও উপযুক্ত মনে করলে তিনি তা ছাপার নির্দেশ দেন।

৬. বইয়ের অন্ত্যবস্তু প্রণয়ন

বইয়ের অংশের ছাপার কাজ শেষ করার পূর্বে অন্ত্যবস্তু প্রতিটি বইয়ের শেষে একটি নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন: পরিশিষ্ট, টীকা, শব্দার্থ, গ্রন্থপঞ্জী ও নির্দেশিকা। মুদ্রিত বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুসরণে নির্দেশিকার পৃষ্ঠা স্থির করা হয়। বইয়ের মূল অংশের ছাপার কাজ শেষ হলে সম্পাদক মুদ্রিত বইয়ের কপি অনুসরণে বইয়ের অন্ত্যবস্তু তৈরি করেন।

৭. বই বাঁধাই ও প্রকাশিত বইয়ের প্রচার

বই বাঁধাই যদিও প্রকাশন-সংস্থার উৎপাদন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি কাজ তথাপি সম্পাদক বইয়ের গুণাগুণ ও প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে এর বিশেষ কোনো বাঁধাইয়ের ব্যাপারে উৎপাদন বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। বইয়ের প্রচারও মূলত প্রকাশন-সংস্থার বিপণন ও বিক্রয় বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সম্পাদক তার পরিকল্পিত ও সম্পাদিত বইয়ের যথার্থ প্রচার- পরিচিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। লেখকের কাছে, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে বইয়ের সৌজন্য কপি পাঠানো হয়েছে কিনা এবং পত্র- পত্রিকাসহ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে বইয়ের সমালোচনা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা এসব বিষয়ে সম্পাদক সংশ্লিষ্ট বিভাগে খোঁজ-খবর নিতে পারেন, সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে এ সকল কাজ ত্বরান্বিত করতে পারেন।

৮.৫. সম্পাদনার প্রকারভেদ

আমরা আগেই বলেছি সম্পাদনা নানা ধরনের হতে পারে। কিন্তু এই আলোচনায় আমরা শুধু প্রকাশিতব্য বিষয় যা মুদ্রিত হয় তা নিয়েই কথা বলব। সে বিষয়েরও নানা ধরন হয়। তার মধ্যে আমরা তিনটি বিষয় নিয়ে কথা বলব—

- পুঁথি সম্পাদনা
- বই সম্পাদনা
- সংবাদপত্র সম্পাদনা

৮.৫.১. পুঁথি সম্পাদনা

মুদ্রিত বইয়ের আদিরূপ পুঁথি। ছাপার যন্ত্র আসার আগে এই পুঁথিই ছিল জ্ঞান আদান প্রদানের আধার। পুঁথি লেখকের স্বহস্তে লেখা হলেও তার অনেক কপি তৈরি করতেন লিপিকরেরা। তাই একই বিষয়ের পুঁথির অনেক পাঠভেদ পাওয়া যায়। সে সময় এই পাঠভেদ বিশেষ অসুবিধার কারন হত না। লিপিকরেরা বিভিন্ন দেশ-কালে নিয়ে গিয়ে তা পাঠ করতেন। কিন্তু সমস্যা হল মুদ্রিত গ্রন্থ আসার ফলে। মুদ্রিত গ্রন্থ লিপি থেকে বক্তব্য সবকিছুকে নির্দিষ্ট রূপ দেয়। যে নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে একশো কপি বই ছাপা হবে হয়ত। একই পুঁথির হাজার পাঠভেদ, কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূল পুঁথি থেকেই তা দূরতর হয়ে যায়। তখনই আসে সম্পাদকের ভূমিকা। সম্পাদক এই হাজার পাঠ থেকে মূল বা মূলের সর্বাধিক কাছের পাঠটিকে চিহ্নিত করবেন ও ছেপে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবেন। এই কাজটি নানা স্তরে করে থাকেন সম্পাদক।

যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য দুটি। ১. ক্ষণস্থায়ী এবং দুর্লভ পুঁথিকে সম্পাদনা কর্মের মাধ্যমে আংশিক পরিমাণে দীর্ঘস্থায়ী এবং সুলভ করে তোলা। অর্থাৎ পুঁথি অনেকেরই আয়ত্তের বাইরের বিষয় হলেও, সম্পাদিত গ্রন্থ প্রয়োজনে সংগ্রহ করা সম্ভব। ২. তথ্য প্রমাণের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রচয়িতার মূল পাঠ বা তার কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টা করা। অর্থাৎ যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য এবং বিশুদ্ধ পাঠ- পুনর্গঠন করা। এখানে 'মূল পাঠ' অর্থে রচয়িতার অভিপ্রেত পাঠকেই বোঝায়। এর জন্য প্রয়োজন পাঠ-সংশোধন পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি এবং পরবর্তীকালের প্রক্ষেপকে যথাসম্ভব বর্জন করে, একটি বিশুদ্ধ নতুন পাঠ প্রস্তুত করা, যাকে বলা যেতে পারে পুনর্গঠিত পাঠ। লিপি পরম্পরায় পাঠের বিকৃতি, বিচ্যুতি এবং প্রক্ষেপ ইত্যাদি বাড়তে থাকে। তাই পুঁথি যত অর্বাচীন হয়, পাঠ-পুনর্গঠন তত জটিল আকার ধারণ করে। সুতরাং পুঁথি সম্পাদনা কালে পুঁথির লিপিকাল বিচার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন মূল গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। এই ধারণাটি সম্পাদককে করতে হয় কবি শকাঙ্কটি সঠিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে, কাব্যের রচনা কালটি নির্ধারণ করে। কাব্যের রচনাকাল বা তার ইতিহাস জানা না থাকলে বিশুদ্ধ পুঁথি বা রচয়িতার স্বহস্ত লিখিত পুঁথিকেও ভ্রান্তিপূর্ণ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আর এর জন্য প্রয়োজন গ্রন্থ ও গ্রন্থাকারের সময় এবং ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান।

পুঁথি সংগ্রহ:

কোনো সম্পাদক যখন একটি প্রাচীন পুঁথি সম্পদনায় ব্রতী হবেন, তখন প্রথমেই তাঁকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের প্রাপ্ত পুঁথিগুলির সন্ধান করা এবং সেই বিশেষ গ্রন্থের মোট কটি পুঁথি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি কোথায় কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে তার একটি বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করা। এছাড়া সম্পাদনাকালে সেগুলির ব্যবহারের সম্ভাব্যতা বিচারও একান্ত প্রয়োজন। এর পরবর্তী স্তরের কাজ, তালিকাভুক্ত পুঁথিগুলি সংগ্রহ, বা তার ফটোকপি সংগ্রহ, অথবা অন্য কোনো দক্ষ ব্যক্তিকে দিয়ে নকল

করিয়ে নেওয়া। এই নকল করিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, লিপিকরের হাতে যেমন অনুলেখনের সময় নানা ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তেমনি উক্ত হস্তলিখিত প্রতিলিপিতেও সেই একই ধরনের ভুলভ্রান্তি প্রবেশ করবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং সম্পাদক যদি নিজে নকল না করে অন্য কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে নকল কাজ করান, তবে তাঁকে অবশ্যই মূলের সঙ্গে প্রতিলিপির পাঠ মিলিয়ে দেখতে হবে। এর পরে সংগৃহীত পুঁথিগুলিকে প্রথমে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে- তারিখ-সংবলিত এবং তারিখবিহীন পুঁথি। এদের মধ্যে তারিখ-সংবলিত পুঁথিগুলিকে আবার 'সম্পূর্ণ' ও 'খণ্ডিত'-এই দুটি ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন। এবারে এদের মধ্যে থেকে তারিখ-সংবলিত পুঁথি যদি একাধিক পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তাদের মধ্যে যেটি প্রাচীনতম সেটিকেই সম্পাদনার কাজে আদর্শ-পুঁথি হিসেবে বেছে নিতে হবে। প্রাচীন তারিখ সংবলিত এক বা একাধিক খণ্ডিত পুঁথি, পাঠ মেলাবার জন্য গ্রহণ করতে হবে। কারণ একই গ্রন্থকারের একাধিক প্রাচীন পুঁথির মধ্যে পাঠের প্রভেদ দেখা দেয় খুবই অল্প। পুঁথি সম্পর্কে যাঁদের একটু মোটামুটি ধারণা রয়েছে, তাঁদেরই এ বিষয় অবহিত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু তবু দেখা যায় অনেক পুঁথি সম্পাদকের এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণার অভাব রয়েছে।

পুঁথি সম্পাদনার কাজে একাধিক পুঁথি থেকে পাঠ গ্রহণ করা কখনই কাম্য নয়। সম্পাদিত গ্রন্থে এই ধরনের পাঠকে মিশ্রপাঠ (বা Composit text) বলা হয়, যা কোনো সম্পাদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রেই কাম্য নয়। সে পাঠ প্রাচীন পুঁথি থেকে সংগ্রহ হলেও নয়। বরং তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, অথচ সুম্পূর্ণ পুঁথিই সম্পাদনার কাজে আদর্শ বিবেচ্য হওয়া উচিত। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যায়, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্য-সম্পাদনায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থটিতে অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এই পন্থাই অনুসরণ করেছেন। এইভাবে গঠিত রূপাবয়ব যুক্তিসিদ্ধ হলেও, তাকে বিশুদ্ধ সম্পাদনা হিসেবে কোনো ভাবেই গ্রহণ করা চলে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথমদিকের সম্পাদক নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত গ্রন্থের প্রসঙ্গেও এই একই কথা সমান ভাবেই প্রযোজ্য।

পুঁথি নির্বাচন:

এইভাবে উপকরণ সংগ্রহের সঙ্গে সম্পাদককে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তা হল-প্রাপ্ত সকল পুঁথির মধ্যে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পুঁথি কোনগুলি তা নির্বাচন করা। পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই নির্বাচন পর্ব একটি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, গ্রন্থকারের নিজের এলাকা থেকে অথবা তার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুঁথিকেই নির্বাচনে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কারণ পুঁথি যত লেখকের নিজের এলাকা থেকে দূরবর্তী হবে, তার ভাষা ততই কবির নিজের রচিত ভাষা থেকে দূরে সরে যাবে। আবার একটি পুঁথি কতখানি বিশ্বস্ত তথা নির্ভরযোগ্য, তা নির্ধারন বিভিন্ন পুঁথির অংশ বিশেষের পাঠ তুলনা করে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্ভবপর হয়। আর এই বিভিন্ন পুঁথির পাঠের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একথা স্মরণ রাখা প্রযোজন যে, প্রতিটি পুঁথিরই কোনো না কোনো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। সে বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে পুঁথির পাঠ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমেই। আলোচ্য পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্য সন্ধান পুঁথি সম্পাদকের অবশ্য কর্তব্য। সম্পাদক সেখানে

একটিমাত্র পুঁথি অবলম্বন করে কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যেখানে যেহেতু অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে পাঠ মেলাবার সুযোগ থাকে না, ফলে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সন্ধান আরও অনেক বেশি জরুরি।

প্রাপ্ত পুঁথির সংখ্যা যদি সংখ্যায় অবিক হয়, তবে সম্পাদক কর্তৃক পুঁথি সমূহের বংশ পীঠিকা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ লিপি পরম্পরায় বর্তমানে কোনে বিশেষ গ্রন্থের বা কাব্যের যে ক-খানি পুঁথি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, সেগুলিকে পরস্পর সম্পর্কবিহীন একান্ত স্বতন্ত্র মনে করবার কোনো কারণ নেই। যদিও লিপি পরম্পরায় স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এদের মধ্যে অনেক পাঠভেদ, পাঠ-বিকৃতি, প্রক্ষেপ এবং বিচ্যুতি এসে ভিড় করেছে তবুও এই প্রতিটি পুঁথিই যে উক্ত মূল পুঁথিটি থেকে জাত- পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের মাধ্যমে তা আবিষ্কার করা নিতান্ত অসম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুঁথিগুলি যদিও লিপি পরম্পরার বারা অনুসরণ করে এসে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে, তবু তারা যে একটি বিশেষ মূল সম্ভূত একথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথির মধ্যেই যে সব সময় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব এমন নয়। কারণ সেগুলির মূল এক নাও হতে পারে। দুটি বা তিনটি মূল পুঁথি থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে, এই পাণ্ডুলিপিগুলির অনুলিখন হওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে জ্ঞাতিগত বা বংশানুক্রমিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে সম্পাদককে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ প্রতিলিপিতে লিপিকর আদর্শ পুঁথির পাঠ বিচ্যুতি অন্য কোনো পাঠের সাহায্যে বা অন্য কোনো সূত্রেও সংশোধন করে থাকতে পারেন। সুতরাং কোনো প্রতিলিপিকেই সহজে বর্জন করা সঙ্গত হবে না। আবার অনেক সময় লিপিকর নিজেই দুই ভিন্ন লিপিধারায় দুটি পুঁথিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে একটি নতুন প্রতিলিপি তৈরি করতে পারেন। এর ফলে কোনো কোনো সময় দেখা যায়, একটি আদর্শ পুঁথির ভুলভ্রান্তি দ্বিতীয় আদর্শ পুঁথিটির সাহায্যে সংশোধিত হয়ে একটি বিশুদ্ধ পাঠ তৈরি হয়েছে। আবার কখনও কখনও এর বিপরীত, অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ধারার পুঁথির পাঠের সংমিশ্রণে যে নতুন সংমিশ্রিত প্রতিলিপিটি তৈরি হয়, তা বিকৃতপাঠ সংবলিত অশুদ্ধ পুঁথি হওয়াও অসম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে পুঁথির জ্ঞাতিগত বিচার প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ বিভিন্ন লিপিধারার সংমিশ্রণে প্রস্তুত মিশ্র প্রতিলিপির জন্য বংশপীঠিকা প্রনয়ণ পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব নয়। আরও একটি কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে কখনই বিভিন্ন কাণ্ডের বা পর্বের খণ্ডিত পুঁথি, তা সে যতই প্রাচীন তারিখ সংবলিত হোক না কেন, গ্রহণ করা উচিত নয়। এতে পাঠভেদের পরিমাণ থাকে খুব বেশি। কারণ সাধারণভাবে দেখা যায় আলাদা আলাদা কাণ্ডগুলি আসরে গাওয়া হত, ফলে এদের উপর গায়েন ও লিপিকরদের প্রক্ষেপের পরিমাণ থাকে অত্যধিক।

পুঁথির পাঠভেদ সমস্যা:

একথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে, পুঁথি সম্পাদনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, বিভিন্ন তথ্য প্রমাণের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল পাঠ বা তার কাছাকাছি বিশুদ্ধ পাঠ এই পাঠ পুনর্গঠনের অর্থ হচ্ছে, মূল পাঠ পুনরুদ্ধার এবং পাঠ-বিকৃতি অপসারণ করে বিশুদ্ধ পাঠের নির্মাণ। কোনো গ্রন্থ সম্পাদনা কালে

সম্পাদকের মনে কোনো বিশেষ একটি বা একাধিক পাঠ সম্পর্কে যদি সন্দেহ দেখা দেয়, যে সেটি রচয়িতার অভিপ্রেত পাঠ কিনা- তবে সে সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পাদককে বিচার-বিশ্লেষণের কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

১। প্রাপ্ত পুঁথি সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম পাঠনির্ণয়।

২। প্রসঙ্গানুগত্য বা পূর্বাপর প্রসঙ্গ বিচার।

৩। অর্থ গ্রাহ্যতা।

৪। পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ।

৫। রচয়িতার রচনা-শৈলী এবং মানসিক প্রবনতা বিচার।

৬। ভাষা ও ছন্দ বিচার।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, এই ছয় রকমের পরীক্ষা দ্বারা শোধনের মাধ্যমে সম্পাদক যখন নিঃসংশয় হয়ে কোনো পাঠ গ্রহণ করবেন, তখন সেই পাঠ আংশিকভাবে নির্ভরযোগ্য তথা বিশুদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এইভাবে সংশোধিত পাঠকে আভ্যন্তরিক ভাবে সম্ভাব্য (Intrinsically probable) পাঠ বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ সম্ভাব্যতা এবং বাহ্য সম্ভাব্যতার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল, প্রথমটির সম্পর্ক স্বয়ং লেখকের সঙ্গে, আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক লিপিকরের সঙ্গে। অর্থাৎ প্রথম পদ্ধতিতে বিচার্য বিষয় লেখক এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য বস্তু লেখক নন, লিপিকর। এই বাহ্য সম্ভাব্যতা লিপির উপর নির্ভরশীল বলে, একে প্রতিলিপিগত (Transcriptional) সম্ভাব্যতা বা প্রমাণ ভিত্তিক (Documentary) সম্ভাব্যতা বলা হয়।

পুঁথি সম্পাদনা কালে কোনো পাঠ সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে, সম্পাদক আলোচা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে, মোট চার ধরনের সম্ভাব্য সমাধানের কথা ভাবতে পারেন।

১। গ্রহণ (acceptence)। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পাঠটি রচয়িতার মূল এবং বিশুদ্ধ পাঠ বিবেচনায় গ্রহণ।

২। সন্দেহ প্রকাশ (Daoubt)। অর্থাৎ পাঠটি রচয়িতার মূল পাঠ কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ।

৩। পরিবর্জন (Rejection)। অর্থাৎ পাঠটি আদৌ রচয়িতার নয় মনে করে, পাঠটি বর্তন।

৪। পরিবর্তন (Altaration)। অর্থাৎ রচয়িতার মূল পাঠ ছিল সম্পূর্ণ অন্য। সুতরাং সেক্ষেত্রে পাঠ পরিবর্তন বা পাঠ-পুনর্গঠন অবশ্য কর্তব্য।

এইভাবে পুঁথি সন্ধান, সংগ্রহ, নির্বাচন ইত্যাদির পরে, আদর্শ পুঁথির সঙ্গে অন্যান্য পুঁথির পাঠ মিলিয়ে পাঠ সংশোধন ও পুনর্গঠনের কাজ শেষ হলে, সম্পাদকের কাজ হল একটি দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা। পুঁথি সম্পাদনার ক্ষেত্রে এই ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অংশে সম্পাদনা কার্যে ব্যবহাত বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে এবং সম্পাদনার রীতি-নীতি পাঠককে অবহিত করা অবশ্য কর্তব্য। এর মধ্যেই সন্নিবিষ্ট হবে গ্রন্থে ব্যবহৃত পুঁথিগুলির সাধারণ পরিচয়, ব্যবহৃত পুঁথির গুরুত্ব অনুসারে একটি ক্রম-তালিকা প্রণয়ন এবং পুঁথি-সংকেত (Siglum) নির্দেশ করা। প্রাপ্ত সমস্ত পুঁথির তালিকা, সংখ্যা, আদর্শ

হিসেবে গৃহীত এক বা একাধিক পুঁথির সংখ্যা নির্দেশ, আদর্শ পুঁথির যোগাতা বিচার বিশ্লেষণ ইত্যাদি সবই আলোচ্য পুঁথি-পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পুঁথি পরিচিতির-পরবর্তী স্তরে গ্রন্থে ব্যবহৃত পুঁথিগুলির পূর্ণ নাম-ধাম বারবার উল্লেখের পরিবর্তে পুঁথি-সংকেত (Siglum)- এর ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই পুঁথি সংকেত নিজের খেয়াল খুশিমতো ব্যবহার না করে, একটি সাধারণ নিয়মকে অনুসরণ করে, এই সংকেত-চিহ্ন ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে পুঁথি-সংকেতে বর্ণ (পুঁথির প্রাপ্তিস্থানের আদ্যক্ষর বা গ্রন্থাগার বিশেষ বা নগর বিশেষের আদ্যাক্ষরও হতে পারে) এবং সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্ণ চিহ্নটি পুঁথির প্রাপ্তিস্থান নির্দেশক এবং সংখ্যা চিহ্নটি পুঁথির পাঠ বিশুদ্ধির বা পুঁথির গুরুত্বের আনুপাতিক ক্রমজ্ঞাপক বলে ধরা হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিনটি পুঁথি ব্যবহৃত হয়েছে কোনো গ্রন্থে। সম্পাদক তাদের পুঁথি-সঙ্কেত দিয়েছেন, 'এ-১', 'এ-২', 'এ-৩'। এক্ষেত্রে 'এ-৩' এর অপেক্ষা, 'এ-১' সংখ্যক পুঁথিটি যে তার পাঠ বিশুদ্ধি, প্রাচীনত্ব ইত্যাদির গুরুত্ব বিচারে অনেক বেশি মূল্যবান-তা ধরে নিতে হবে। অনেক সম্পাদক এই পুঁথি- সঙ্কেত ব্যবহারে অন্য একটি রীতিও অবলম্বন করে থাকেন। সেটি হল, গ্রন্থে ব্যবহৃত সব পুঁথিকে গুরুত্বের আনুপাতিক ক্রম অনুযায়ী চিহ্নিত করে (যেমন ক, খ, গ, ইত্যাদি) প্রথমে ভূমিকায় একবার তাদের পরিচয় দিয়ে, পরে সর্বত্র সঙ্কেত চিহ্নের মাধ্যমে তাদের উল্লেখ করে থাকেন। এই পরিচয়ের মধ্যে অবশ্যই পুঁথিটি কোথায় সংরক্ষিত এবং সেখানে তার পরিগ্রহণ সংখ্যার (যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের হয় তবেই) উল্লেখ থাকা অবশ্য প্রয়োজন।

পুঁথি পরিচিতির পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করতে হবে, পুঁথিটি সম্পূর্ণ না খণ্ডিত, পত্র সংখ্যা, খণ্ডিত পুঁথির ক্ষেত্রে বিস্তৃত পত্র সংখ্যার উল্লেখ, প্রতিপৃষ্ঠায় চরণের সংখ্যা, প্রতি চরণে অক্ষর সংখ্যা, পত্রাঙ্ক আছে কিনা, পত্রাঙ্ক নির্দেশের প্রকৃতি, হস্তাক্ষরের প্রকৃতি যথা সুন্দর কাঁচা হাতের একাধিক হস্তাক্ষর থাকলে তার উল্লেখ, পুঁথির অবস্থা ভালো অথবা জীর্ণ-কীটদষ্ট কিনা, পুঁথির কাগজ-তাল, তেরেট, তুলট অথবা পরবর্তী বালির কাগজ, এবং এর সঙ্গে কাগজের দৈর্ঘ্য প্রস্থের উল্লেখ, উভয় দিকে অথবা একদিকে লেখা, লেখার কালি কেবল মাত্র কালো অথবা অন্য কোনো রঙের ব্যবহার রয়েছে, পুঁথির পাতায় কোনো চিত্র আছে কিনা, থাকলে তা কি ধরনের চিত্র, এবং লিপিকালের উল্লেখ না থাকলে পত্রের প্রাচীনত্ব বিচার করে একটি আনুমানিক লিপিকালের নির্দেশ, ইত্যাদির উল্লেখ পুঁথি পরিচিতির অন্যতম প্রধান প্রাথমিক বিষয়। এর পরে পুঁথির মালিকের নাম-ধাম, সংগ্রাহকের নাম-ধাম, লিপিকরের নাম এবং পরিচয়, সংগ্রহ স্থানের উল্লেখ, কোথায় কখন পুঁথিটি অনুলিখিত হয়েছে তার উল্লেখ, পুঁথির মূল্য- ইত্যাদির উল্লেখ করা। এদের মধ্যে সব তথ্য হয়তো কোন সম্পাদকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হতে পারে। তবে প্রাপ্ত তথ্যের সবটুকুর উল্লেখ করা সম্পাদকের অবশ্য কর্তব্য। এই সব তথ্যই পাওয়া যায় 'পুষ্পিকা' অংশে। পুঁথির পুষ্পিকা অংশের বিস্তৃত পরিচয় সম্পাদকের অবশ্য দেওয়া উচিত, কারণ লিপিকরকৃত দীর্ঘ পুষ্পিকা অংশের সবটুকুর সঙ্গে পুঁথির পাঠের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক না থাকলেও, এ জাতীয় বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সামাজিক বা ঐতিহাসিক অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা

ঐতিহাসিক বা সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। সুতরাং এই পুষ্পিকা অংশ সম্পাদক বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করবেন।

সম্পাদিত পুঁথির ভূমিকা অংশের একটি মূল্যবান অঙ্গ গ্রন্থকার ও গ্রন্থের পরিচিতি। এটি যথা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ হওয়া দরকার। তার জন্য প্রাপ্ত পুঁথির তথ্য ছাড়াও অন্যান্য বাহ্যিক সূত্র থেকে তথ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের রচিত অন্য কোনো গ্রন্থ থাকলে তারও সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রন্থকার-পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ সম্পাদক গ্রন্থকারের জীবনী সম্পর্কিত প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্য ভূমিকা অংশে সন্নিবেশ করবেন। উক্ত কবি যদি কোনো বিশেষ কাব্যধারার পথ প্রদর্শক তথা স্রষ্টা হন, তবে সেই বিশেষ ধারাটির জন্ম এবং বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনাও ভূমিকা অংশের করা উচিত।

গ্রন্থ শেষে একটি 'পরিশিষ্ট' সংযোজন করা অবশ্য কর্তব্য। তাতে একদিকে যেমন পূর্বোক্ত বর্জিত অংশগুলি তুলে ধরা যায় পাঠকের কাছে, অন্যদিকে তেমনি সম্পাদকের নতুন কিছু বক্তব্য, বা পরবর্তী কালে প্রাপ্ত নতুন কোনো তথ্য সংযোজিত হবার সুযোগ থাকে। আবার সম্পাদিত গ্রন্থটি যদি কোনো পদসঙ্কলন শ্রেণীর হয়, তবে তার বিভিন্ন পদের বর্ণানুক্রমিক একটি সূচি এই পরিশিষ্টে সংযোজিত হওয়া দরকার। সেই সঙ্গে উক্ত পদগুলি যদি একাধিক রচয়িতার হয়, তবে রচয়িতার নামেরও একটি বর্ণানুক্রমিক সূচি পরিবেশন করা যেতে পারে।

৮.৫.২. বই সম্পাদনা

পূর্বে সম্পাদনার নানা দিক নিয়ে আলোচনায় আমরা বই সম্পাদনা প্রসঙ্গে কথা বলেছি। তাই এই অংশে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে চাই কীভাবে কোনো বইয়ের সম্পাদনা সম্ভব হয়। ধরা যাক শিশুদের জন্য কোনো বই সম্পাদনার কাজ করছেন একজন সম্পাদক। তিনি কীভাবে কাজটি করবেন সেটির স্তরগুলি দেখব আমরা।

সম্পাদনাকর্মের সবচাইতে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক বিষয় হলো শিশুদের বইয়ের সম্পাদনা। উন্নয়নশীল ও উন্নয়নগামী অনেক দেশে শিশুদের বইয়ের সম্পাদনার দায়িত্ব পালনে মহিলারাই প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। এর কারণ হয়তো এই, মহিলাদের অবস্থান: শিশুদের অনেক কাছাকাছি এবং শিশুমন বিচারে মহিলারাই অধিক পারঙ্গম। তবে সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি যিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিপালনে সক্ষম, তিনি পুরুষ কিংবা মহিলা হন, তিনিই সম্পাদক হিসাবে যোগ্যতর ব্যক্তি।

শিশুদের বই সম্পাদনার ক্ষেত্রে বইয়ের বিষয়বস্তু ও চরিত্র নির্বাচন বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। বিষয়বস্তু নির্বাচনে সম্পাদকের বিবেচনায় যা প্রাধান্য পাবে তা হলো: বিষয়বস্তু

ক. আপাতদৃষ্টিতে ভাল কিনা;

খ. নতুন এবং আকর্ষণীয় কিনা;

গ. নৈতিক বোধের উদ্বোধক কিনা;

ঘ. দেশাত্মবোধের উদ্বোধক কিনা;

ঙ. চিত্তাকর্ষক এবং বিমল আনন্দদানে সক্ষম কিনা।

দেশকালের প্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়াদির মূল্যায়ন, ব্যাখ্যা ও উপযোগিতা অভিন্ন নাহলেও এ কথা বলা যায় যে, কোমলমতি শিশুদের হাতে নৈতিক চরিত্র, জ্ঞান ও কল্পনাশক্তি বিকাশের পরিপন্থী বিষয়বস্তু-সম্বলিত কোনো বই কখনোই তুলে দেয়া চলবে না। সম্পাদক এ বিষয়টি স্মরণে রাখেন তা হলে শিশুদের বই সম্পাদনার ক্ষেত্রে বড় রকমের কোনো ভুল করার সম্ভাবনা থাকবে না।

শিশুদের বই সম্পাদনায় ভাষা নির্বাচন ও তার প্রয়োগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শব্দ ব্যবহার থেকে শুরু করে বাক্যের গঠন ও প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে শিশু-উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন বয়সের শিশুদের রুচি ও বই পাঠের আগ্রহের কথা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত: একমাত্র সহজ-সরল বই-ই শিশুদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

শিশুদের বই রচনা ও প্রকাশনার জন্য শিশুদের একটি বিশেষ বয়ঃশ্রেণীর কথা শিশুসাহিত্যিক এবং সম্পাদককে জেনে নিতে হবে। কি রচনা, কি সম্পাদনা উভয় ক্ষেত্রে এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকাশনার দৃষ্টিকোণ থেকে শিশুদের বয়ঃশ্রেণী সকলদেশে অভিন্নভাবে অনুসৃত হয় না। এ বিষয়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষ্য করা গেলেও দেশের শিক্ষাপদ্ধতি, সামাজিক পরিবেশ, মানসিক গঠন ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিশুদের বয়ঃশ্রেণী অনুযায়ী পাঠানুরাগের একটি চিত্র তৈরি করা সম্ভব।

শিশু-কিশোর উপযোগী বই সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদক বয়ঃশ্রেণী এবং তাদের উপযোগী বই তথা তাদের মানসিক বিকাশের কথা অবশ্যই মনে রাখবেন। বইয়ের অঙ্কনশিল্পীকেও এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং সম্পাদক অঙ্কনশিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে বইয়ের চিত্র ও রেখা অঙ্কনের ব্যাপারে শিল্পীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। বইয়ের গল্প বা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ রেখা ও চিত্রই কাম্য হওয়া উচিত; তবে ধর্ম, সমাজ বা সামাজিক আচার- ব্যবহারের সঙ্গে এর যেন কোনো বিরোধ দেখা না দেয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুমন সতত পরিবর্তনশীল; আবার এই পরিবর্তনশীল মনে জেগে থাকে এক ধরনের অনুসন্ধিৎসা। শিশুদের কোনো বই বা বইয়ের গল্প, বিষয়বস্তু, রেখা, চিত্র ইত্যাদি যদি শিশুমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তবে তা আগামী দিনের পৃথিবীকে কলুষিত করবে। শিশুমন অত্যন্ত সংবেদনশীল। শুভ-অশুভ যে কোনো কিছুর ছায়া অতি সহজেই সেখানে পড়ে, শিশুরা বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করে। শিশুদের বই হবে শিশুদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। অতএব, শিশুদের প্রতিটি বই যেন এক একটা আলোকরশ্মি হিসাবে শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সম্পাদক সেই দৃষ্টিকোণ এবং উপলব্ধি থেকে শিশুদের-বই সম্পাদনা করবেন।

শিশুসাহিত্যে বইয়ের আকার, কাগজ, টাইপ ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইতে কতগুলো ছবি যাবে, কয় রঙের ছবি, কি ধরনের ছবি, ছবিগুলো লাইন বা হাফটোন বা লাইন-টোন সম্বলিত হবে এসব বিষয়ও বিবেচনায় আনতে হবে। বইটি লেটার প্রেসে বা অফসেটে ছাপা হবে কিনা, অফসেটে ছাপা হলে বইটি কম্পিউটার কিংবা ফটোকম্পোজ করার প্রয়োজন আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে যথাযথ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বিশেষ জরুরি। যেমন, বইয়ের আকৃতির কথায় যদি আসা যায় তাহলে দেখা যাবে, তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য বইয়ের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য ডিমাই

কোয়ার্টো অথবা ক্রাউন কোয়ার্টো অথবা ফুলস্কেপ কোয়ার্টো আকার থেকে যে কোনোটি বেছে নেয়া যেতে পারে। বয়ঃশ্রেণীর উপযোগী বইয়ের টাইপও তেমনি অপেক্ষাকৃত বড় যেমন, ১৮ পয়েন্ট গ্রেট বা ১৪ পয়েন্ট বোল্ড টাইপ ব্যবহার করা ভাল। এভাবে শিশুদের বইয়ের সমস্ত পরিকল্পনা সম্পাদককে পূর্বাহ্নে নিখুঁতভাবে তৈরি করে নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে এজাতীয় বইয়ের একটি ডামি তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। ডামিটি সম্পাদক, প্রকাশক, উৎপাদক এমন কি বিক্রয়-অধিকর্তার হাতের কাছে থাকলে প্রকাশন-সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর বইটি সম্পর্কে আগ্রহী হবে, বইটির উৎপাদন ও বিপণনকর্মে অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠবে এবং এ থেকে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কর্মসূচি প্রস্তুত করা ও তা সুচারুরূপে প্রতিপালনের অনুকূল সুযোগ হবে। লেখকও ইচ্ছা করলে এই কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। বইয়ের ডামি এবং ডামিতে অন্তর্ভুক্ত ছবি ও লে-আউট দেখে লেখক প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারেন যা বইটির রচনা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, সামান্যতম পরিবর্তন এনেও, বইটির সার্বিক ত্রুটিমোচন করা সম্ভব হতে পারে। এভাবে, সম্পাদকের বিশেষ সতর্কতা ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে বই প্রকাশিত হবে তা নিঃসন্দেহে শিশুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

এইভাবে একজন সম্পাদক শুধু শিশুদের জন্য নয়, পাঠ্যবই, বা যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার বইয়ের সম্পাদনা করতে পারেন।

৮.৫.৩. সংবাদপত্রের সম্পাদনা

প্রতিদিন সকালবেলা যে সংবাদপত্র আমাদের হাতে পৌঁছয় তা তৈরি হয় এক দীর্ঘ কর্মবহুল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। খবরের কাগজ পড়ার সময় সংবাদপত্র তৈরির এই বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের মনে থাকে না। চা খেতে খেতে আমরা চোখ বোলাই কাগজের পাতায়, এক ঝলকে দেখে নিই কাছের, দূরের, বিশ্বের নানা প্রান্তের একেবারে সাম্প্রতিক খবর। যে খবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা দ্রুত পড়ে নিই। সময় কম, অনেক কাজ বাকী আছে। তাই চট্‌পট পড়ে ফেলতে হয়। এটা সম্ভব হয় সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে বলেই। যে কাগজ পড়তে পাঠক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন, অনায়াসে পছন্দ মাফিক খবর খুঁজে পান এবং খুব সহজে পড়ে যেতে পারেন, ধরে নিতে হবে সেই কাগজের সম্পাদনা ভাল। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনাই কাগজের উৎকর্ষ নিয়ে আসে। আলাদা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে। সংবাদপত্র উৎপাদনের যে সমস্ত স্তর রয়েছে তারমধ্যে সম্পাদনা হল একটি উল্লেখযোগ্য স্তর। প্রথমে খবর সংগ্রহ তারপর সম্পাদনা এই দুটি কাজ হলেই একটি সংবাদ ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠে।

কারা সম্পাদনা করেন :

সংবাদপত্রে সম্পাদনা যারা করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অবর সম্পাদক বা সাব-এডিটর। একটি বড় কাগজে বহু অবর সম্পাদক থাকেন। নিউজ রুমে বসে সংবাদের কপি সংশোধন, পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনে কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করার কাজে তাঁরা নিয়োজিত থাকেন। এঁদের ওপরে থাকেন মুখ্য-অবর সম্পাদক, এবং তাঁর ওপরে থাকেন বার্তা সম্পাদক। নিউজরুমের সম্পূর্ণ

দায়িত্ব বর্তায় বার্তা সম্পাদকের ওপর। বার্তা সম্পাদক শুধুমাত্র সম্পাদনা নয় সংবাদ সংগ্রহ করার বিষয়টির ওপরও তদারকি ও নজরদারী করেন।

সংবাদপত্র প্রকাশনায় সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এই পর্যায়গুলি জানার আগে দেখা দরকার কীভাবে সংবাদ আসছে। কারণ আগে সংবাদ, তারপর সম্পাদনা। সংবাদ আসে নানা সূত্র থেকে। সংবাদ আনার মূল দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টাররা। রিপোর্টারদের মধ্যে রকমফের আছে। স্টাফ রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপনডেন্ট, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা প্রচুর খবর পাঠান নিউজরুমে। এছাড়া আছে সংবাদ-সংস্থা, যেমন পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টারর্স, এ পি, এ এফ পি প্রভৃতি সংবাদ-সংস্থা দিবারাত্র সংবাদপত্রকে খবর পাঠায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকেও সংবাদ তৈরি হয়। প্রতিদিন অসংখ্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্র অফিসে আসে। এই বিপুল সংবাদ-প্রবাহ থেকে কিছু অংশ বেছে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরি করা হয়। তৈরি করার নামই হল সম্পাদনা। খবর-সম্পাদকেরা নির্বাচিত সংবাদ কপিকে ঘষে মেজে মুদ্রণ উপযোগী করে গড়ে তোলেন। কতটা জায়গা নিয়ে কোথায় বসবে সেই সংবাদ সেটা নির্ধারণ করেন, তারপর রচনা করেন সংবাদের উপযুক্ত শিরোনাম। সংবাদ সম্পাদনায় শিরোনামের গুরুত্ব রয়েছে। পাঠক প্রথমেই দেখেন শিরোনাম, সেখানেই তিনি আভাষ পান সংবাদের বিষয়বস্তুর। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অল্প কথায় সঠিক বার্তাটি শিরনামে নিয়ে আসেন খবর-সম্পাদকেরা।

নিজস্ব সংবাদদাতা ছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসে। এক্ষেত্রে খবর-সম্পাদকের দায়িত্ব বেড়ে যায়। নিজস্ব সংবাদদাতার কাজ প্রাপ্ত সংবাদ, অন্যান্য সংবাদ-সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের তথ্য বিশ্লেষণ যথাযথ সংবাদটি পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যগত অসঙ্গতি, অন্যথায় পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। নানা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে সঠিক তথ্য সংকলন সম্পাদনার গুণগত মান বৃদ্ধি করে। কপি পরীক্ষার কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সাংবাদিকরা অনেকসময় তাড়াহুড়ো করে তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদের কপি তৈরি করে দেন। এক্ষেত্রে খবর-সম্পাদকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কপি পরীক্ষা করে দেখা যে সেটি আদৌ ছাপাবার যোগ্য কিনা। নিউজ রুমে জমা হওয়া অসংখ্য কপির মধ্য থেকে পাঠকের উপযোগী সংবাদ নির্বাচন করে সঠিকভাবে উপস্থাপনার জন্য অবর-সম্পাদকের কপি পরীক্ষার স্থান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি জানেন, জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন খবর কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদপত্রের সম্পাদককে যে নীতিগুলি মেনে খবরের কাগজ সম্পাদনা করতে হয়, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল- ১। সহজ সরল ভাষায় লেখা ২। সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা ৩। যথাসম্ভব ভুল ভ্রান্তি না থাকা।

কারণ খেয়াল রাখতে হবে সামান্য শিক্ষিত মানুষও খবরের কাগজ পড়েন। সারাদিনের অল্প সময় আমরা পাই খবরের কাগজ পড়ার জন্য। সেই অল্প সময়ে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকার দেশ দশের খবর পড়ে নিতে চাই আমরা।

মূল বিষয়টি অল্প কথায় জানতে চায় পাঠক। তাই কোনো বিষয় সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলকে পাঁচ ঢ আর এক হ এ ভাগ করে দেখা হয়। পাঁচ ঢ হল- What, When, Where, Who, Why আর এক H হল- How। যে কোনো সংবাদের সূচনায় পাঠক এই উত্তরগুলি খোঁজে দেখা যায়। তাই সংবাদের সূচনায় এভাবে সংবাদকে সাজানো হয়। অনেকসময় সংবাদের বিষয় ভাবনাকে সুসংহত রূপ দিতে সংবাদকে আবার লেখা হয়। একে বলে 'পুনর্লিখন'। রিপোর্টাররা যা লিখেছেন বা সংবাদের কপিতে যা পরিবেশিত হচ্ছে তা পছন্দ না হলে সম্পাদক আবার খবরটি লিখতে পারেন। যে কোনো সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই পুনর্লিখন।

সংবাদপত্রের সম্পাদনার ক্ষেত্রে টাইপসজ্জা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টাইপ ৬ থেকে ৭২ নানা মাপের হতে পারে। এখন কম্পিউটার স্ক্রিনেই সেটি হয়ে থাকে। টাইপ পরিবারগুলি সম্পর্কে সম্পাদকের ধারনা থাকতে হবে। কোন ফন্ট ব্যবহারে সংবাদপত্র সুন্দর দেখতে হবে তা বুঝতে হবে। মার্জিন যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা দেখাও জরুরি। ছেড়ে রাখা সাদা অংশ সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জাকে সুন্দর করে তোলে। পরিষ্কার লাইন ও মার্জিন সম্পর্কে তাই সম্পাদকের জ্ঞান থাকতে হবে।

শিরোনাম সম্পাদনায় সম্পাদককে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। শিরোনামই পাঠককে খবরের কাগজের কাছে নিয়ে যায়। তাই আকর্ষক অথচ মূল বিষয়টি যাতে পরিষ্কার করে বোঝা যায় সেরকম কোনো শিরোনামকে বেছে নিতে হয় সম্পাদককে। অল্প কথায় সঠিক শব্দ প্রয়োগ, ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে নাটকীয় মুহূর্ত ধরার চেষ্টা থাকে শিরোনামে। আবার খেয়াল রাখতে হবে শিরোনামে যেন কোনো মতামত দেওয়া না হয়। প্রয়োজনে বিষয়কে স্পষ্ট করতে উপশিরোনাম দেওয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন সংবাদকে পাঠোপযোগী করে একটি পৃষ্ঠায় সাজাতে হয়। সাজানোর এই প্রক্রিয়াকে বলে অঙ্গসজ্জা। সম্পাদনার একেবারে শেষ স্তর হল অঙ্গসজ্জা। ডামি সীটের ওপর বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহ সংবাদ-কাহিনী, ছবি, রুল, বক্স প্রভৃতির সাহায্যে পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা তৈরি হয়। সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক হয় কোথায় কোন্ সংবাদ যাবে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে নিয়ে আসা হয় প্রথম পাতায়। আবার তার মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে বড় হরফে বেশি জায়গা নিয়ে ওপরের দিকের সহজে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা হয়। প্রতিটি পাতাকেই আলাদা করে সাজাতে হয়। অঙ্গসজ্জার কয়েকটি নীতি আছে। অঙ্গসজ্জার সময় কতগুলি সাধারণ সূত্র মেনে রাখতে হবে। এগুলো মনে রাখলে কাজের সুবিধা বেশি। এগুলো হল- (১) কাগজের নাম থাকবে সবচেয়ে উঁচুতে। (২) ওপরের বাঁদিক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বড় খবর ঐ জায়গাতে রাখাই শ্রেয়। (৩) সংবাদ কাহিনীগুলি গুরুত্ব-অনুযায়ী নিচে নেমে যাবে। (৪) শিরোনামের মাপ ক্রমশ নীচের দিকে ছোট হবে। (৫) একটি শিরোনাম যেন আরেকটি শিরোনামের সঙ্গে মিশে না যায়। সামান্য হলেও বৈপরীত্য রাখতে হবে। (৬) শিরোনাম বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য আনা দরকার। (৭) ছবির ব্যবহার হলে ভাল, কারণ তাতে বডি টাইপের ধূসরতা ভেঙে যায়। (৮) দু-কলামের মধ্যে বেশি সাদা জায়গা রাখা উচিত নয়।

সাদা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (৯) উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে হবে, এতে অঙ্গসজ্জার সৃজনশীল দিকটি অটুট থাকে।

এইভাবে উপরিউক্ত নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদনা সম্পূর্ণ হয় ও তা পাঠকের কাছে এসে পৌঁছোয়।

৮.৬. অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সম্পাদনা শব্দের অর্থ কী?

২। সম্পাদনা কত রকমের হতে পারে?

৩। যে কোনো প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনার মূল উদ্দেশ্য কী?

৪। একজন সম্পাদক বই সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখক নির্বাচন করবেন কীভাবে?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সম্পাদক কে? সম্পাদকের কাজগুলি কী?

২। সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করুন।

৩। সম্পাদিত পুঁথির ক্ষেত্রে 'মিশ্রপাঠ' কী? সম্পাদিত পুঁথিতে মিশ্রপাঠ কি গ্রহণযোগ্য? কারণ নির্দেশ করুন।

৪। ভালো মানের সম্পাদনা প্রকাশনা ব্যবসাকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

বিস্তারিত প্রশ্ন

১। পুঁথির পাঠভেদ সমস্যার সমাধানসূত্র কীভাবে পাওয়া যাবে? এর নীতি আলোচনা করুন।

২। বই সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয় সম্পাদক খেয়াল রাখবেন আলোচনা করুন।

৩। সংবাদপত্র সম্পাদনার ধাপগুলি আলোচনা করুন।

৪। সংবাদপত্র সম্পাদনে শিরোনাম সম্পাদনের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৮.৭. গ্রন্থপঞ্জি

১। ডঃ অণিমা মুখোপাধ্যায়, 'পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনারীতি', পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০১।

২। ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'বাংলা পুথির নানাকথা', কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, ১৯৯৬

৩। ডঃ তারকনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনা', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০২৩

৪। ডঃ সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গবেষণা: প্রকরণ ও পদ্ধতি', দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ১৯৯০

৫। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, 'বিষয় সাংবাদিকতা', বীণা লাইব্রেরি, ২০১৬

৬। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়(সম্পা) 'সাংবাদ বিদ্যা' পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

একক ৯ : বাংলা প্রকাশনার ইতিবৃত্ত, গ্রন্থবিন্যাস ও অলংকরণ

৯.১. বাংলা প্রকাশনার ইতিবৃত্ত

৯.১.১. উদ্দেশ্য

৯.১.২. প্রস্তাবনা

৯.১.৩. বাংলা বইয়ের প্রকাশনা

৯.১.৪. বিশ শতকের প্রকাশনা

৯.২. গ্রন্থবিন্যাস

৯.২.১ উদ্দেশ্য

৯.২.২. প্রস্তাবনা

৯.২.৩. গ্রন্থের গঠনবিন্যাস

৯.৩. অলংকরণ

৯.৩.১. উদ্দেশ্য

৯.৩.২. প্রস্তাবনা

৯.৩.৪. উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ পদ্ধতি

৯.৩.৪.১. উনিশ শতকের প্রথমার্ধ

৯.৩.৪.২. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

৯.৩.৫. বিশ শতকের বাংলা বইয়ের অলংকরণ

৯.৪ অনুশীলনী

৯.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১. বাংলা প্রকাশনার ইতিবৃত্ত

৯.১.১. উদ্দেশ্য

বইয়ের 'বই' হয়ে ওঠা একটি যৌথ প্রক্রিয়া। কোনো বিষয় লেখক থেকে পাঠক অবধি যাওয়ার আগে অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। সেই ধাপগুলিতে প্রকাশক, প্রুফ দেখছেন যিনি, মুদ্রক, আলংকারিক, বই বাঁধাই করছেন যিনি — এমন অনেক মানুষ তাঁদের দক্ষতা দিয়ে বই নামক 'পণ্য'টি বানিয়ে তোলেন। বাংলা ছাপা বইয়ের এই অভিযানই আমাদের আলোচনার লক্ষ্য।

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

বই ছাপবার প্রাথমিক শর্ত মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানা। আমরা সেই মুদ্রণসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে বাংলার ছাপাখানা ও বাংলায় ছাপা বইয়ের শুরুর দিকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব এই অংশে।

৯.১.২. প্রস্তাবনা

মুদ্রণের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একথা অনস্বীকার্য। ছাপার ইতিহাস ও সভ্যতার ইতিহাস পরস্পরসাপেক্ষ। গোটা পৃথিবীতে ছাপাযন্ত্র আবিষ্কার ও ব্যাবহারের ইতিহাস একরকম নয়।

'ছাপা' শব্দের অর্থ যদি 'ছাপ তোলা' অর্থে ধরা হয়, তবে পৃথিবীতে সে ইতিহাসের সর্বপ্রথম নমুনা পাওয়া যাচ্ছে চীন দেশে। যদিও এক্ষেত্রে কাগজে ছাপার কথা বলা হচ্ছে। কাগজে ছাপার আগে মিশরের ব্যাবিলনে পোড়া ইটের উপরে লেখার ছাপ পাওয়া গেছে। এছাড়া সিলমোহরের ছাপ, কাপড়ের উপর ছাপের নমুনাও রয়েছে। কাগজের উপর লেখার ছাপ চীন দেশ থেকে জাপান কোরিয়া হয়ে ইউরোপের স্পেনে পৌঁছোচ্ছে সেই শিক্ষা। তারপর শুরু ছাপার ইতিহাসের। চীন দেশে বই ছাপার সূত্রপাত ধর্মের হাত ধরে। সঙ্গে ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। আর কাগজের আবিষ্কার। কালক্রমে ছাপার প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়। ইউরোপ ছাড়িয়ে সেই ছাপার প্রযুক্তি আমাদের দেশেও পৌঁছে যায়। পূর্ববর্তী একাধিক এককে আমরা মুদ্রণের ইতিহাস ও প্রযুক্তির বিষয়ে জ্ঞাত হয়েছি। এই অংশে সেই প্রযুক্তির শ্রেষ্ঠ ফসল বাংলা প্রকাশনার বিষয়ে আলোকপাত করব।

৯.১.৩. বাংলা বইয়ের প্রকাশনা

বইয়ের 'বই' হয়ে ওঠা একটি যৌথ প্রক্রিয়া। কোনো বিষয় লেখক থেকে পাঠক অবধি যাওয়ার আগে অনেকগুলো ধাপ রয়েছে। সেই ধাপগুলিতে প্রকাশক, প্রুফ দেখছেন যিনি, মুদ্রক, আলংকারিক, বই বাঁধাই করছেন যিনি — এমন অনেক মানুষ তাঁদের দক্ষতা দিয়ে বই নামক 'পণ্য'টি বানিয়ে তোলেন। বাংলা ছাপা বইয়ের এই অভিযানই আমাদের লক্ষ্য। দ্বিতীয় অংশে থাকে বই ছাপার প্রযুক্তি। কাগজ, কালি, হরফ, ছাপার যন্ত্র এই চারটে উপাদান থাকতে হয় বই ছাপতে হলে। বাংলা বই ছাপার ক্ষেত্রেও এই মেলবন্ধন দরকার হয়েছিল।

ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী ছিল মুদ্রকের যুগ। তাঁরাই হরফ তৈরি করে বই ছেপেছেন, প্রকাশ করেছেন বিক্রিও করেছেন। ইউরোপে জিওফ্রে টোরি, ক্রিস্টোফার প্ল্যাটিন (পকেট সংস্করণ) এঁরা ছিলেন নামকরা মুদ্রক। বাংলায় বই ছাপার শুরুরদিকটা একইরকম। মুদ্রকই প্রকাশক হতেন। উইলকিনসরা তাঁদের দেশের বই প্রকাশের ইতিহাস দেখেছেন। তাই হ্যালহেড বা কেরি বুঝেছিলেন তাঁদেরকেই মুদ্রক ও প্রকাশকের কাজ করতে হবে। এদেশের আরও একজন সেকথা বুঝেছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তাঁর কথা দিয়েই বাংলার মুদ্রক-প্রকাশকদের কথা শুরু করতে হয়। শ্রীরামপুরে ছাপাখানার কাজ শিখে এসে কলকাতায় স্বাধীনভাবে তিনি বই ব্যবসার কাজ শুরু করেন। তাঁর ছাপাখানার নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেটি প্রেস'। এই প্রেস থেকে তাঁর পত্রিকা ছাপতেন। এটি বোধহয় বাঙালি

প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানার প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংবাদপত্র। সংবাদপত্র প্রকাশের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রেস থেকে বইও ছেপেছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তার মধ্যে তাঁর নিজের লেখা বইও ছিল। বাংলাভাষায় ইংরেজি ব্যাকরণ (১৮১৬), দায়ভাগ (১৮১৬-১৭), দ্রব্যগুণ (১৮২৪), চিকিৎসার্ণব ইত্যাদি নানা বই তিনি ছেপে লাভবান হয়েছেন। 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'চাণক্যশ্লোক'-এর মতো বই সম্পাদনাও করেছেন। তবে যে কারণে বাংলা ছাপা বইয়ের ইতিহাস তাঁকে ভুলবে না সেটি হল 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' কাব্য। ১৮১৬ সালে 'ফেরিস এন্ড কোম্পানী' প্রেস থেকে ৬টি ছবি সহ ৩১৭ পাতার বইয়ের প্রকাশক তিনি। (যদিও বইয়ে কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ নেই।) ছবিগুলি আঁকেন রামচাঁদ রায়। ইংরেজিতে রামচাঁদ রায়ের নাম রয়েছে। ছবির ব্লকগুলির নীচেও ইংরেজিতে বর্ণনা দেওয়া। পরে অন্যান্য প্রেস থেকে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে ছবি ছাপা হলে এই ইংরেজি লেখার চলটাই রাখা হয়েছে।

শুধুমাত্র মুদ্রক-প্রকাশক নন, বাঙালির প্রথম বই-বিক্রির দোকানও তাঁরই ছিল বলে জানা যায়। বই বিক্রির জন্য তিনি এজেন্টও নিয়োগ করেন। বাংলা বই ছাপা ও ব্যবসার ইতিহাসে এভাবেই গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য অনেকগুলি 'প্রথম' এর দাবিদার হয়ে থাকবেন।

আমরা ১৭৭৮ থেকে ১৮৬৭ এর মধ্যে বাংলার ছাপাখানা, প্রকাশক ও তাঁদের প্রকাশিত বইগুলি দেখবার চেষ্টা করব। আমাদের এই আলোচনা হবে ছাপাখানা ধরে। কোন্ ছাপাখানায় কারা বই মুদ্রিত করছিলেন, কারা প্রকাশ করছিলেন আর কী ধরণের বই তাঁরা ছাপছিলেন এই তিনটি বিষয় আমরা বোঝবার চেষ্টা করব। তার জন্য কয়েকটি প্রতিনিধিমূলক ছাপাখানা বেছে নেওয়া হল।

শ্রীরামপুর মিশন প্রেস: ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরি ও উইলিয়াম ওয়ার্ড কাঠের প্রেস নিয়ে যখন শ্রীরামপুর মিশনের যাত্রা শুরু করলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপুস্তক ছাপানো ও একই সঙ্গে এদেশের ভাষাকে বোঝা। সেই মতোই ১৮০০ সালের প্রথম বই 'মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত'। ১৮০১ সালে 'ধর্মপুস্তক'। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের কিছু অংশ ছাপা হয় এই সময়। সম্পূর্ণ বাইবেল ছাপা হয় ১৮০৯ সালে। এর আগে ১৮০৫ সালেই পাঁচালির ফর্মে ছাপা হয়েছে 'খ্রীষ্টবিবরণামৃত'। এদেশের মানুষ তখনও 'গদ্য'-এ অভ্যস্ত হননি, তাই পাঁচালির সংরূপে খ্রিষ্টের জীবনী ছাপা। যাতে অভ্যস্ত চোখ ধাক্কা না খায়। ঠিক যেমন পুথির মতো বই ছাপার চেষ্টা, তেমনি সংরূপেও এদেশের পুরোনো অভ্যেসকে ধরে রাখার চেষ্টা দেখা গেল। ধর্মপুস্তক ছাড়াও শ্রীরামপুর প্রেসের বই ছাপার বিষয় ছিল 'পাঠ্যপুস্তক'। কারণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যপুস্তক ছাপত শ্রীরামপুর। এই কলেজের ছাত্রদের দেশীয় ভাষায় বৈষয়িক বিষয়ের পরিচয় দিতে নানারকম অনুবাদ সাহিত্য ছাপা হয় শ্রীরামপুর থেকে। এর ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১), 'লিপিমালা' (১৮০২) দুটি মৌলিক গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হয়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'রাজাবলি' (১৮০৮), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) বইগুলিও ছিল পাঠ্যপুস্তক। এছাড়া চণ্ডীচরণ মুন্শির 'তোতা ইতিহাস' (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' (১৮১৫) এই ধরণের বইও ছাপত শ্রীরামপুর প্রেস। এই প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয় কেরির দুটি বাংলা

গদ্যের বই 'কথোপকথন' (১৮০১), ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)।

এবার আসা যাক বই ছাপার ধরনে। ১৮০১ সালে ছাপা বাইবেলের অনুবাদ 'ধর্মপুস্তক' আর ১৮০২ সালে ছাপা 'লিপিমালা' বইদুটি ছাপার ধরণ একরকম। ধর্মপুস্তকের আখ্যাপত্রেই ধর্মপুস্তক আসলে যে ঈশ্বরের কথা তা ব্যাখ্যা করে সূচিপত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর আখ্যাপত্রের শেষে একটি লাইনের তলায় লেখা 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল', একথা বলে প্রকাশকালের উল্লেখ। এই 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল' অংশটি বলা যেতে পারে শ্রীরামপুরের সিগনেচার বইয়ের আখ্যাপত্রে। শ্রীরামপুর প্রেসে কোনো আলাদা করে মুদ্রক প্রকাশকের নামের উল্লেখ থাকত না। কারণ শ্রীরামপুর প্রেসের নেপথ্যে যাঁরা বই ছাপার কাজ করছিলেন, তাঁরা একাধারে মুদ্রক ও প্রকাশকও বটে। সেই টিম ওয়ার্কের স্বীকৃতি এই লাইনটি। লিপিমালা, ধর্মপুস্তকের ঠিক একবছর পর ছাপা হলেও আখ্যাপত্রের ধরনে বদল আনা হয়েছে। দুটি আখ্যাপত্র। প্রথমটি ইংরেজিতে, দ্বিতীয়টি বাংলায়। এটা নতুন কিছু নয়, ইংরেজি ছাপা বইয়ের ধরনে একটি করে ইংরেজি আখ্যাপত্র জুড়ে দেওয়া। অনেক ভারমুক্ত করা হয়েছে আখ্যাপত্রকে। ইংরেজি আখ্যাপত্রে লেখা 'LIPPI MALA' অথবা 'The Bracelet of Writing' তারপর লেখকের নাম ও তিনি যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক সে কথা জানিয়ে ছাপাখানার নাম ও প্রকাশের তারিখ। বাংলা আখ্যাপত্রে 'লিপিমালা' শব্দটি ছোট ফন্টে লেখা বড় ফন্টে লেখা 'পুস্তক'। তারপর শুধু লেখকের নাম ও পৃষ্ঠা শেষে সিগনেচার লাইন ও প্রকাশকাল। আখ্যাপত্র ওল্টালে বাঁদিকের পাতায় রয়েছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিল। বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় লেখা 'পুস্তক কলেজ ফোর্ট উইলিয়াম'। শুধু বাংলা নয় বিভিন্ন ভাষার ফন্ট তৈরির চেষ্টা যে তাঁরা করছেন তা বোঝা যায়। যদিও সিল বানানোর ক্ষেত্রে আলাদা হরফ কাটার প্রয়োজন নেই তবুও ইচ্ছেটা আন্দাজ করা যায়। এই দুটি বইয়ের বাংলা হরফ একইরকম। হ্যালহেড গ্রামারে যে টানা অক্ষরের হরফের উদাহরণ আমরা দেখেছি, কিছুটা সেরকম। এই হরফগুলিতে যে পঞ্চানন কর্মকারের হাতের ছোঁয়া আছে তা সহজেই অনুমেয়। তবে এই ধরনের হরফেই যে তাঁরা থেমে থাকেননি, তার প্রমাণ মিলবে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে। ১৮২১ সালে 'যাত্রিদিগের অগ্রেসরণ বিবরণ' বা ১৮৩১ সালের 'হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিসমাজের কৃতকর্মরে বিবরণপুস্তক'-এর প্রথম খণ্ডে হরফ বদলেছে। হরফের ডানদিকের বাড়তি টানগুলি নেই। 'নির্ঘন্ট' বা সূচিপত্র যুক্ত হয়েছে। আর ভূমিকা যুক্ত হচ্ছে 'আরম্ভক বাক্য' এই শিরোনামে। রিপোর্ট লেখবার ধরনে বাংলা গদ্য লেখা হচ্ছে, তাই আখ্যাপত্রেই অনেকগুলি তথ্য জানানোর চেষ্টা রয়েছে। যা বদলায়নি তা হল 'শ্রীরামপুরে ছাপা হইল'। ১৮৩৭ সালে অবশেষে এই লাইন ছাপা বন্ধ হল। দীর্ঘ সাইত্রিশ বছর শ্রীরামপুরের ছাপাখানা বাংলা ছাপাবইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

<u>ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস:</u> ১৮১৭ সাল নাগাদ শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেসের মতান্তর ঘটে। যার ফলস্বরূপ কলকাতায় ১৮১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। 'ক্যালকাটা মর্নিং পোস্ট' পত্রিকার একটি সেকেন্ড-হ্যান্ড ছাপার মেশিন আর জেমস্ কিথের তৈরি হরফ নিয়ে তাঁরা ছাপাখানা শুরু করলেন। শ্রীরামপুর প্রেসের মতোই ধর্মীয়পুস্তক, প্রচারপত্র, পাঠ্যপুস্তক

ছাপানোর পরিকল্পনা নিলেন। শুরুতেই ছাপলেন ছোট ছোট খ্রিস্টীয় পুস্তিকা। তারপর স্কুল বুক সোসাইটির বই। এছাড়া লন্ডন মিশনারি, চার্চ মিশনারি, ক্যালকাটা খ্রিস্টান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির বইও তারা ছাপছিলেন। ১৮২২ এর মধ্যে ১০টি বাংলা ট্র্যাক্ট এর ২৫ হাজার কপি তাঁরা ছেপেছিলেন। পরে শ্রীরামপুর মিশন যাঁদের সঙ্গে বিবাদে এই প্রেস তৈরি হয়, তাঁদের সঙ্গেই যুক্ত হয়ে কাজ করলেন এঁরা। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ তো বটেই, জীবনী, নীতিশিক্ষা, ইতিহাস, স্কুলের পাঠ্যপুস্তক নানা বই তাঁরা ছেপেছেন।

ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ১৮২০ সালে প্রকাশিত হয় রামমোহন রায়ের বই 'An Apology for the Pursuit of Final Beatitude'। ইংরেজি নাম ও ইংরেজি আখ্যাপত্র হলেও বইটি আসলে বাংলায় লেখা। বেদপাঠ সাঙ্গ না করলে প্রকৃত ব্রাক্ষ্মণ হওয়া যায় না, এই মতের বিরুদ্ধে লেখা একটি বিধান। বইয়ের নামটি বড় হলেও অল্পকথায় লেখকের নাম, প্রকাশের স্থান, ছাপাখানার নাম ও স্থান, প্রকাশকাল উল্লেখ করা রয়েছে। নিজেদের বই ছাপার ক্ষেত্রে এঁরা এই ছিমছাপ আখ্যাপত্রটি নিয়েছেন, শুধু বাংলা নাম জুড়েছে। ১৮৬৭ অবধি অন্তত বইগুলি এরকমই দেখা যায়। ১৮২২ সাল নাগাদ তাঁরা যে পাঠ্যপুস্তকগুলি ছাপান, সেগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮২২ সালে রেভা পিয়ার্স সাহেব এই মিশন প্রেসের মূল মুদ্রক একটি ভূগোল বই ছাপেন। নাম 'ভূগোল বৃত্তান্ত'। 'স্কুল বুক সোসাইটি'-এর জন্য ছাপা বই। আখ্যাপত্রে প্রথমে বাংলায় পরে ইংরেজিতে বইয়ের নাম, লেখকের নাম ও প্রকাশের স্থান-কাল রয়েছে। রয়েছে ছাপাখানার একটি সিলও। আখ্যাপত্রের পিছনে রয়েছে বইটির কটি কপি ছাপান হয়েছে তার হিসেব। সূচিপত্র ও বিষয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে দুটি পৃথিবীর মানচিত্র। অত্যন্ত ঝকঝকে বাংলা হরফ। পূর্ণচ্ছেদের বদলে ফুলস্টপের ব্যবহার হয়েছে। তেমনি আরেকটি বই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা নিয়ে 'স্ত্রী শিক্ষাবিধায়ক'। এটি ফিমেল জুভেনিল সোসাইটির জন্য ছাপানো বই। বইটির শেষে রয়েছে সমাপ্তিসূচক অলংকরণ। কলকাতা খ্রিস্টান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির বই এরা বহুদিন অবধি ছেপেছেন। বইগুলি ছাপানোর ধরন ছিল পুস্তিকার মতো। আলাদা কোনো আখ্যাপত্র নেই। ইংরেজি ও বাংলায় বিষয়ের নাম লিখে সামান্য অলংকরণের পর মূল বিষয় শুরু হয়ে যায়। শুরুর দিকে ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির বইও এঁরা ছাপতেন। ১৮৫৩ সালে ডাক্তার এডওয়ার্ড রো-এর শেক্সপিয়রের অনুবাদ 'লেম্বস্‌টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা' এখান থেকেই ছাপা হয়। এসময়ের ফন্টগুলি আরও পরিষ্কার হয়েছে। ফন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার কোনো চিহ্ন নেই। ১৮১৮ থেকে ১৯০১ অবধি বাংলা বইয়ের ছাপার কাজ করেছে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। এত বছরের অভিজ্ঞতা তাঁদের ছাপায় পরিষ্কার বোঝা যায়।

<u>স্কুল বুক সোসাইটি:</u> স্কুল বুক সোসাইটির মূল লক্ষ্যই ছিল, পাঠ্যপুস্তক ছাপা। ১৮২৪ সালে স্কুল বুক সোসাইটির নিজেদের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে আমরা দেখেছি তাঁরা স্কুল প্রেস, মিশন প্রেস বা শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বই ছাপিয়ে নিতেন। স্কুল বুক সোসাইটির বই দেখতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বার মতো তা হল, ১৮২৪ সালে এসে পাঠ্যপুস্তক ছাপবার একটি ধরন তাঁরা তৈরি করেন

এবং ১৮৫৮ সালের দিকে এসেও দেখা যাবে সেই বইয়ের ধরনটি অক্ষুন্ন রেখেছেন। বাংলা ও ইংরেজিতে ছাপা বইয়ের নাম, বিষয় ও লেখকের নাম; সেই আখ্যাপত্রের অর্ধেকটাতে ইংরেজিতে তার তর্জমা। প্রকাশের স্থান, প্রেসের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল। বইয়ের শুরুতে সূচিপত্র ও ভুমিকা। তারপর বিষয় শুরু। অত্যন্ত উন্নত মানের ছাপা বই 'বালকদিগের নিমিত্ত' স্কুল বুক সোসাইটি ছাপতেন। বিভিন্ন তালিকা ব্যবহার হলে তা পরিষ্কার করে পৃষ্ঠায় দু-ভাগ করে ছাপা হোত। ১৮২৪ সালে মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ব্যাকরণ সার', ১৮২৭ সালে রাধাকান্ত দেবের 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ' এমনি সব ভালো ছাপার উদাহরণ। স্কুল বুক সোসাইটি ১৮২৫ সালে পিয়ার্সনের 'বাক্যাবলী'। ভূগোল ও জ্যোতিষ বিষয়ে বই। দ্বিভাষিক সংস্করণ। বইটি দেখে মনে হয় সুন্দর ইংরেজিতে ছাপা বইয়ের মধ্যেই একটি বাংলা বই ছাপা রয়েছে। ইংরেজি ও বাংলা ফন্টের সমতা চোখকে আরাম দেয়। বাঙালি খ্রিস্টান শিক্ষক তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' ও এখান থেকেই ছাপা হয়।

<u>ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি:</u> ১৮৫১ সালে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করেছিলেন এই সোসাইটি। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে কিছু ভালো বইয়ের অনুবাদ ও একইসঙ্গে বাংলায় সাহিত্যচর্চার একটি ধারা তৈরি করা। এখান থেকে প্রকাশিত হয় 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ'। বইগুলি জুড়ে থাকতো অসাধারণ সব ছবি। অত্যন্ত উন্নতমানের ছাপার জন্য বিখ্যাত ছিল এই সোসাইটি। এখান থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্রিকাটিও ছাপা হয়। তবে এই সোসাইটির কাজ ১৮৬৫ সালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

<u>তত্ত্ববোধিনী প্রেস:</u> ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভাকে কেন্দ্র করে যে সব বই ছাপা হয়েছিল, সেগুলি এই প্রেসেই ছাপা হয়। ১৮৪৩ এ প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রেসই 'তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়'। এই যন্ত্রালয় থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্তই শুধু নয় নীলমণি বসাক, কালীপ্রসন্ন সিংহ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের বইও ছাপা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের বইগুলি ছাপবার ধরন ছিল সাদামাটা। আখ্যাপত্রে লেখা থাকত 'ওঁ তৎ সৎ'। বই শুরু হোত 'একমোদ্বিতীয়ম্' লিখে। রামমোহন রায়ের ছাপা বই মাথায় রেখে ধর্মের বইগুলি ছাপতেন। ১৮৫২ সালে ছাপা আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের 'অধিকরণমালা' বইতে ছবিও ছাপা রয়েছে। তবে ১৮৫০ সালের পর থেকে তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয় নানান স্বাদের বই ছেপেছেন 'রত্নাবলীনাটক' (১৮৪৯)-এর মতো। নীলমণি বসাকের 'আরেবিয়ান নাইট' (১৮৫০), হরিশচন্দ্র তর্কালংকারের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮৫৬), কালী প্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭) ইত্যাদি। অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নানান বিষয়ের আভাস বোধহয় পরছিল তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়েও।

তত্ত্ববোধিনী প্রসঙ্গেই বলতে হয় বাংলায় পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন যাঁরা তাঁরাও বাংলা ছাপার জগতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই বাঙালিকে দিয়েছেন।

<u>সমাচারচন্দ্রিকা:</u> ১৮২২ সালে কলুটোলায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাচার চন্দ্রিকা প্রেসটি স্থাপন করেন। ভবানীচরণই এই প্রেসের মালিক ও মুদ্রক ছিলেন। তিনি বাংলায় হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ ছাপেন

অভিনব পদ্ধতিতে, তার উল্লেখ আগেই আমরা করেছি। তাঁর প্রায় প্রতিটি বইয়ের বিজ্ঞাপনেই লেখা থাকত 'বিশুদ্ধ হিন্দুমতে' ছাপা। একে তিনি ব্রাহ্মন পণ্ডিত লোক, বিদেশি নন, তাঁর ছাপা 'বিশুদ্ধ হিন্দুমতে' ধর্মগ্রন্থের বই তো লোকে কিনবেই। এই সময় বইয়ের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মনদের প্রতিরোধের সময়। তখন ভবানীচরন পুথির মতো করে বই ছাপছেন। কাটতিও হচ্ছে বেশ। ১৮৩৩শেও বই ছেপেছেন একইরকম। 'বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকা' বইটি পুথির মতো ছাপা। ধর্মীয় প্রশ্ন-উত্তরের বই। 'ধর্মসভাসম্পাদক' ভবানীচরণ বইটি ছাপছেন। পাতার বাঁদিকে মাঝবরাবর পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া। এবং পুথির মতোই শুরুর একটু অংশ বাদ দিলে 'পূর্ণকুম্ভ' নীতি অনুসরণ করে পাতা ভরাট করে লেখা। বই বাঁধাই হয়েছে পাতার উপরের অংশের দিকে। ফলে বইটি হাতে নিয়ে, তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে হবে। বিদেশির বই ছাপার ধরনকে নিজের মত বদলে নিয়েছিল সমাচার চন্দ্রিকা। যদিও কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩), দূতীবিলাস (১৮২৫) বইগুলি ইংরেজি বইয়ের আদলেই ছাপা। আখ্যাপত্রে বইটি কি বিষয়ে সে ব্যাখ্যা করে, বইগুলি সম্পর্কে নানান বিশেষণ ব্যবহার করতেন ভবানীচরণ। যেমন 'সুরসিক রসদায়ক পুস্তক' ইত্যাদি। ভবানীচরণের কাছে শুধু বই ছাপা নয়, বই বিক্রির দিকটাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তাই 'বই' নামক পণ্য যেন ক্রেতা আনতে পারে সেদিকে তিনি খেয়াল রাখতেন। পরবর্তীকালে তাঁর দেখাদেখি অনেকেই বাংলায় ধর্মপুস্তক ছাপতে গিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁকে অনুসরণ করেই। বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনের একটা ধরণ তৈরি করে দিলেন ভবানীচরণ।

<u>সংবাদ প্রভাকর:</u> ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রেস সংবাদ প্রভাকরের উল্লেখ ১৮৩১ সালেই পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রেসটি থেকে উনিশ শতকের নানা সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', 'সত্যধর্মপ্রকাশিকা', 'সর্বরসরঞ্জিনী' পত্রিকাগুলি এই প্রেস থেকেই ছাপা হোত। এছাড়া 'আয়ুর্বেদ দর্পণ', 'বিষ-বৈরী' এধরনের আয়ুর্বেদের বই ছাপতেন এঁরা। ১৮৪০ সালে 'আয়ুবর্দে দর্পণ'-এর তিনটি খন্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খন্ডটির ছাপার হরফ ও বইয়ের মার্জিন সমানভাবে ছেড়ে ছাপা বইটির মান বেশ উন্নত। বইটির মধ্যে একটু বড় বাংলা হরফে শ্লোক ও ছোট হরফে তার বাংলা ব্যাখ্যা একটি পৃষ্ঠার মধ্যে সুচারুভাবে সাজানো। আজকের দিনে আমরা যাকে 'লে-আউট' বলি সেটির দিকে এই প্রেসের নজর ছিল।

<u>বাঙ্গালী প্রেস:</u> ১৮২৩ সালে হরচন্দ্র রায়ের এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'অন্নদামঙ্গল'। 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল'-এর কথা মাথায় রেখেই বোধহয় বইয়ের শুরুতে একটি ছবি ছাপা হয়। ১৩৬ পাতার শেষে সমাপ্তিসূচক একটি ব্লকও রয়েছে।

১৮৪০ সাল থেকে ১৮৭০ বাংলায় 'সস্তা ছাপাখানার স্বর্ণযুগ' বলছেন সুকুমার সেন। এসময়ের বইয়ের তালিকা দেখলেই তা বোঝা যায়। ছাপার খরচ কমছিল, বইয়ের চাহিদাও বাড়ছিল বোঝা যায়। বটতলার প্রকাশকেরাও এসে গেছেন এর মধ্যেই। এ সময় থেকেই বাংলায় মুদ্রকের সঙ্গে প্রকাশকদের আলাদা পরিচিতি দিতে দেখা যায় ছাপা বইতে। এই সময়ে বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত প্রেস আসার আগে একজন প্রকাশকের নাম করতেই হয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বসু। সুকুমার সেন বলছেন তিনি সেকালের

'সর্বোত্তম বাঙালি প্রকাশক'। তাঁর প্রেসের নাম ষ্ট্যানহোপ প্রেস।

স্ট্যানহোপ প্রেস: ১৮৪০ সালে প্রেসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। নামেই বোঝা যাচ্ছে মুদ্রণযন্ত্রের নামে প্রেসটির নামকরণ করা হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের সবকটি বই এখানে ছাপা হয়েছে।

১৮৫২ সালে একটি গীতা প্রকাশ করে স্ট্যানহোপ প্রেস। তার আখ্যাপত্রে লেখা হয় এই গ্রন্থের প্রকাশকের নাম 'শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস তথা শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বসু'। তখন প্রেসটির নাম বলা হয়েছে 'কলিকাতা ইষ্টানহোপ যন্ত্রালয়'। পরে প্রকাশক হন 'শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং' আর মুদ্রক 'ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্র'। ১৮৬১ সালে জয়গোপাল গোস্বামীর 'বাসবদত্তা', ১৮৬৩ তে পিশাচোদ্ধার নাটক এখানেই ছাপা হয়। আরও কত বই যে এঁরা ছেপেছেন। গণিত, বিজ্ঞান, গণিতসূত্র, ভূগোল সূত্র, এর পাশাপাশি রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক', 'মালতীমাধব' নাটকও এখান থেকেই ছাপা হয়। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬৪) টি খুব সুন্দর করে ছেপেছিল এই প্রেস। প্রচ্ছদ জুড়ে ছিল একটি সিল। তারপর খুব অল্পকথায় লেখা একটি আখ্যাপত্র। তারপর কাব্য শুরু। সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশে এই প্রকাশনী সে সময় বেশ নাম করেছিল।

সংস্কৃত যন্ত্র: ১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকরি ছেড়ে দিলে কলেজের সম্পাদক বলেন 'বিদ্যাসাগর খাবে কি করে?' বিদ্যাসাগর সে কথা শুনে না কি বলেছিলেন 'বোলো, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।' সেইমতো বিদ্যাসাগর দোকান দিয়েছিলেন বটে তবে বাংলা বইয়ের। এমন বাংলা বই ছাপলেন বিদ্যাসাগর যে সেসময় যে পাঠ্যপুস্তক ছাপার জন্য তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া গেল না। ১৮৪৭ সালে মদনমোহন তর্কালংকারের সঙ্গে মিলে বিদ্যাসাগর স্থাপন করলেন 'সংস্কৃত প্রেস'। ৬০০টাকা ধার দিয়েছিলেন বন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। এই ধারের জন্যই বোধহয় নীলমাধব মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত হয়ে গেলেন! এই ঋণশোধের উপায় হিসেবে প্রেস থেকে ছাপা হয় 'অন্নদামঙ্গল'। মার্শাল সাহেব পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বইগুলি কিনে নিয়ে বিদ্যাসাগরের ঋণ পরিশোধ করে দেবেন বলেছিলেন একথাও শোনা যায়। আশিস খাস্তগীর যদিও তাঁর 'উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা' বইতে দেখিয়েছেন—

অন্নদামঙ্গলের একটি শুদ্ধ সংস্করণ ছাপার বাসনা প্রকাশ করে মার্শাল সাহেবকে একটি চিঠি লেখেন মদনমোহন তর্কালংকার। সেই অনুযায়ী সংস্কৃত প্রেস ১০০ কপি 'অন্নদামঙ্গল'-এর আগাম অর্ডার দেয়। তারপর ছাপা হয় অন্নদামঙ্গল। ১৮৬০ সালে এই বইটি তৃতীয়বার মুদ্রিত হয়। বইটির প্রচ্ছদে মার্জিনে সামান্য অলংকরণের মধ্যে লেখা হয় বইয়ের নাম, লেখকের নাম। তারপর 'কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে পরিশোধিত' কথাটি লেখা। তারপর প্রকাশের স্থান, প্রেসের নাম, প্রকাশের কাল ও দাম। এরপর আখ্যাপত্র, সূচিপত্র ও মূল বই শুরু। বিদ্যাসাগরের হরফের ভাবনা নিয়ে আগেই কথা বলেছি, তাঁর প্রেস থেকে প্রকাশিত বইগুলি দেখলে তার ঝলক মেলে। এত উন্নতমানের ছাপা বই তার সময়ে আর কেউ ছাপতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। অসংখ্য বই এবং তার অসংখ্য কপি ছেপেছে সংস্কৃত প্রেস। লঙের ১৮৫৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ৮৪,২২০ কপি বই তারা সে বছর ছেপেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা সবকটি বই ছাড়াও 'শিশুশিক্ষা'(৩ভাগ), 'বর্ণপরিচয়' (২ভাগ), বেতাল

পঞ্চবিংশতি, নীলমণি বসাকের 'আরব্য উপন্যাস'(১৮৫৩), অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (১ম,২য়,৩য় ভাগ ১৮৬০), 'চারুপাঠ' (১ম,২য়,৩য় ভাগ ১৮৬৩), পদার্থবিদ্যা (১৮৬৩), ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (১৮৭১), নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' (১৮৭১) এরকম অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা হয়েছে উনিশ শতকে।

সংস্কৃত প্রেসের উদ্দেশ্য জানতে পারা যায় মদনমোহন তর্কালংকারের 'শিশুশিক্ষা'-এর ১ম ভাগে বেথুনকে লেখা একটি চিঠি থেকেই। শিশুদের প্রথম পাঠোপযোগী বই না থাকার জন্য এদেশের বালকেরা স্বদেশীভাষা ঠিকমতো শিখছে না, তাই তিনি এই প্রাইমার লিখতে উৎসাহী হয়েছেন। বইয়ের পাতায় বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে কী করে সেগুলি উচ্চারণ করে লেখাতে হবে তার কথাও বলা আছে। মদনমোহনের সম্পাদিত বইগুলি ১৮৫১ সালের মধ্যেই। এছাড়া অনেক সংস্কৃত বইও সম্পাদিত করে প্রকাশ করে সংস্কৃত প্রেস। বইয়ের গঠনসজ্জার এত নিপুণ পরিচয় সংস্কৃত প্রেস দিয়েছিল যে সেসময় কেউ পাঠ্যপুস্তক ছাপলে সংস্কৃত প্রেসের মতোই ছাপার চেষ্টা করত।

গুপ্ত প্রেস: ১৮৬১ সালে এই প্রেস থেকে ছাপা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা ছাপার জন্য পরিচিত। তবে শুধু পঞ্জিকা নয় পাঠ্যপুস্তক থেকে নাটক, পদ্য ও গদ্যের বইও ছাপে গুপ্ত প্রেস। এই প্রেস থেকে ছাপা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই, যেমন মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১), অক্ষয়কুমার সাহার 'বঙ্গের মহোৎসব'(১৮৭৫), 'যুবরাজের অভ্যর্থনা' (১৮৭৫), 'বিচ্ছেদবিলাপ নাটক' (১৮৭২), 'রত্নাবলী কাব্য' (১৮৭৫) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বই তাঁরা ছাপেন। ১৮৬৪ সালে গুপ্তপ্রেসের প্রকাশক দুর্গাচরণ গুপ্ত কৈলাসবাসিনী দেবীর 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা' প্রকাশ করেন। রচয়িত্রীর কৈফিয়ৎ ছাড়াও এ বইতে রয়েছে প্রকাশকের কৈফয়ৎও। সাহসের সঙ্গে তিনি এই বই প্রকাশ করছেন এমন কথা জানান। আখ্যাপত্র দুটি। একটি ইংরেজিতে একটি বাংলায়। বাংলা আখ্যাপত্রে দুর্গাচরণের পরিচয় প্রকাশক ও রচয়িত্রীর স্বামী এই দুটি পরিচয়ই দেওয়া হয়েছে।

কলকাতার বাইরে অবস্থিত আরও কিছু প্রেস থেকে ভালো বই ছাপা হচ্ছিল। তার মধ্যে বুধোদয় ছাড়াও রয়েছে তমোহর যন্ত্র, আলফ্রেড যন্ত্র, চন্দ্রোদয় যন্ত্র ইত্যাদি। তমোহর যন্ত্রের ছিল নিজস্ব লোগো। পীটস সাহেবের 'ধীরাজ চরিত্র' (১৮৫৪) বর্ধমান রাজার চরিত্র বর্ণনার বই তমোহর যন্ত্র থেকেই ছাপা হয়। শুধু শ্রীরামপুর, হুগলি নয় ঢাকার মুদ্রণযন্ত্র থেকেও ছাপা হচ্ছিল পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের বই। ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্র, ঢাকা নূতনযন্ত্র এমনি সব ছাপাখানার নাম। পদ্যগ্রন্থ 'স্বভাব-দর্শন' (১৮৬২), জোকসের বই 'কৌতুকশতক' এর মতো বই ছেপেছে ঢাকা নূতনযন্ত্র। ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয়েছে ভূগোল, দর্শন ও অনুবাদের বই।

আর কলকাতার মধ্যেই ছিল আরেকটা কলকাতা। যেখানে বই ছাপা হচ্ছিল চিৎপুরের 'বটতলা' নামক স্থানে। সেরকম কিছু প্রেসের কথা বলা যাক।

আরও কত বটতলার প্রেস এভাবে বই ছেপে যাচ্ছিল তাঁর হদিশ দিয়েছেন সুকুমার সেন, শ্রীপান্থ। কবিতারত্নাকর, কমলালয়, কমলাসন ছাড়া হরিহর যন্ত্র, গ্রেট ইডেন, লক্ষ্মীবিলাস, বিদ্যারত্ন, সুধানিধি,

সমাচার সুধার্ণব, জ্ঞানদীপক, কলম্বিয়ান, সুধাসিন্ধু এরকম অসংখ্য প্রেস ও তাদের ছাপা বইয়ের হদিস পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ের শুরুতে যে কথা আমরা বলেছিলাম যে, বটতলার প্রেসগুলি সংস্কৃত যন্ত্র বা স্কুল বুক সোসাইটির তৈরি করে দেওয়া ছাপা বইয়ের ধরনকে সামনে রেখে চলেনি, এই প্রেসগুলির ছাপাবই ও বিষয় দেখে সে কথাই আবার মনে হয়। প্রভাবিত হয়েছেন তথাকথিত শিক্ষিত প্রকাশকের বই দেখে তবুও নিজেদের ছন্দে বইয়ের কাটতি অনুযায়ী বই ছেপে গেছেন এঁরা। বৃহত্তর বাংলাদেশের যে মানুষগুলো ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল চণ্ডীমন্ডপ থেকে তাঁদের কাছে ফেরীওয়ালারা পৌঁছে দিয়েছেন এই সব বই। এ বইয়ের পাঠক কলকাতার চমককে ভয় পান, নতুন সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেন।

৯.১.৪. বিশ শতকের প্রকাশনা

সেদিনের বটতলার প্রকাশনার জগৎ পরবর্তীকালে চিৎপুর ছাড়িয়ে কর্নোয়ালিশ স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট-হেদুয়ার ধার দিয়ে কলেজ স্ট্রীটের দিকে এগোতে শুরু করল। আজকের কলকাতার কলেজ স্ট্রীট বা 'বইপাড়ার' ইতিহাস তাই প্রায় দুশো বছরের পুরোনো। ১৯৩৫ সালে লাইনোটাইপের ব্যবহার বাংলা মুদ্রণশিল্পে নতুনযুগের সূচনা করল। সংবাদপত্র ছাপার ক্ষেত্রে দ্রুততার প্রয়োজন, আর সে প্রয়োজনকে পূরণ করতে সক্ষম হল লাইনোটাইপ। বহুদিনের প্রচেষ্টায় বাংলা লাইনোটাইপের সফল প্রয়োগ করেন সুরেশচন্দ্র মজুমদার। আর তাঁকে সাহায্য করেছিলেন সাহিত্যিক রাজশেখর বসু। বাংলা অক্ষর তৈরি করেছিলেন সুশীলকুমার ভট্টাচার্য। এঁরা সকলেই নতুন যুগের বাংলা মুদ্রণের পথিকৃৎ। ১৯৩৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দিনটিতে বাংলা মুদ্রণে লাইনোটাইপের সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়। এই দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম বাংলা লাইনোটাইপে ১২২টি শব্দ ছাপা হয়। আমরা মনে করতেই পারি এইদিনটির হাত ধরে বাংলা মুদ্রণ নতুন শতকে প্রবেশ করল। তারপর বাংলা প্রকাশনার ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছে। বদলেছে ছাপার যন্ত্রও। কম্পিউটার আসার পর আমরা ডিজিটাল প্রিন্টিঙের দিকেও এগিয়েছি। এইসময়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন নানা বাংলা প্রকাশনা সংস্থা। প্রথম যুগের প্রকাশকদের মধ্যে রয়েছেন হরিহর লাইব্রেরি, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কাত্যায়নী বুক ষ্টল, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, সারস্বত লাইব্রেরি, ডি. এম. লাইব্রেরি, দেব সাহিত্য কুটির প্রমুখ।

যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে বাংলা বইয়ের প্রকাশনা আরো বেশি শিল্পসুষমামণ্ডিত হয়ে উঠল। এম. সি. সরকার এ্যন্ড সন্স, দেব সাহিত্য কুটির, আশুতোষ লাইব্রেরি এইসব প্রকাশনা সংস্থা এসময় ভালো বই ছাপার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। পূজার সময় সুন্দর ছবিওলা বই প্রকাশ করে চমকে দিত সংস্থাগুলি। আর এই প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে ঘিরেই গড়ে উঠছিল এইসময়ের শিল্পী-সাহিত্যিকদের আড্ডা। যা বাংলার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

এ সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলা বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা হল 'আনন্দ পাবলিশার্স'। ১৯৫৭ সাল থেকে তারা মননশীল বই প্রকাশ করে চলেছেন। প্রথম কর্ণধার অশোককুমার সরকার বই প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব যত্নবান ছিলেন। প্রথম প্রকাশ করেন তারা সুবোধ ঘোষ এর বই 'শতকীয়া'। সেই থেকে আজ

পর্যন্ত এই প্রকাশনা সংস্থা বাংলা বই ছাপার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে চলেছেন। দে'জ বুক পাবলিশিং, মিত্র ও ঘোষ এই প্রকাশনা সংস্থাগুলির অবদানও নেহাৎ কম নয়। বাংলা বইপ্রকাশের ক্ষেত্রে যদিও শুরুর আলোচনা আমরা দুই বাংলা মিলিয়েই করলা। কিন্তু স্বাধীনতার পর পশ্চিমবঙ্গে ছাপা বাংলা বই নিয়েই মূলত আলোচনা করা হল। বাংলাদেশে বাংলা বই প্রকাশনা সংস্থাগুলির কথা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না। একটি দেশ, তাদের মাতৃভাষা বাংলা; তাই তাঁরা বাংলা বইয়ের ছাপা নিয়ে যথেষ্ট যত্নবান হবেন স্বাভাবিক। প্রথমা, আগামী, অন্যপ্রকাশ, মাওলা ব্রাদার্স, বাতিঘর — কতগুলি বাংলাদেশের প্রতিনিধিমূলক প্রকাশন সংস্থা।

৯.২. গ্রন্থবিন্যাস

৯.২.১. উদ্দেশ্য

একটি বইয়ের মধ্যেই থাকে তার 'বই হয়ে ওঠবার' ইতিহাস। আমরা পাঠকেরা তা খেয়াল করি না বেশিরভাগ সময়। একটি বই কীভাবে পড়তে হয় এ প্রশ্ন তাই খুব অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। কিন্তু বৈদ্যুতিন মাধমে একটি বই কীভাবে পড়ব তা আমরা আগ্রহের সঙ্গে শিখে নিই। আসলে বই পড়বারও রয়েছে কিছু পদ্ধতি। এতদিনের ছাপাবইতে অভ্যস্ত আমাদের চোখ তা এড়িয়ে যায়। যেদিন পুথির পরে ছাপাবই হাতে পেয়েছিল বাঙালি, সেদিন ধাক্কা খেয়েছিল এই অভ্যাস। এই অংশের আলোচনায় বইকে আমরা একটি 'পণ্য' হিসেবে পরখ করব। বই আসলে কী? একটি বইয়ের মধ্যে কী কী অংশ থাকে? কীভাবে ছাপার পাতা কটা থেকে একটি বই হয়ে ওঠে তা বুঝে নেব এই আলোচনায়।

৯.২.২. প্রস্তাবনা

'গ্রন্থ' শব্দটি এসেছে গ্রন্থন বা গাঁথা থেকে। গ্রন্থের প্রতিশব্দ একাধিক: বই, কেতাব, পুথি, পুস্তক। পুস্তক কথাটা এসেছে 'পুস্ত্' থেকে। পণ্ডিতদের মতে ফারসিতে চামড়ার কাগজকে বলে 'পুস্ত'। তার থেকে 'পুস্তক'। আবার একদল পণ্ডিতের মতে 'পুস্ত' অর্থ 'বাঁধাই' তাই থেকে 'পুস্তক'। পুস্তকের সঙ্গে গ্রন্থ কথাটার আত্মীয়তা আছে। ছাপাকাগজ একত্র করে গাঁথা হলে তবে হবে 'বই'। ইউনেস্কোর সূত্রানুযায়ী উনপঞ্চাশ বা তার বেশি মুদ্রিত পৃষ্ঠা যার আছে তাকেই বলা হবে 'বই'। এর কম হলে 'প্যাম্ফলেট' (Pamphlet) বা 'বুকলেট' (booklet), বাংলায় পুস্তিকা[1]। বই কথাটা এসেছে আরবি 'ওয়হি' থেকে, অর্থ দিব্যবাণী। তাই থেকে দিব্যবাণী সম্বলিত বই। হিন্দি 'বহি' শব্দের অর্থ খাতা; মরাঠি বহি কথার অর্থ খাতা। বইয়ের ইংরেজি book এসেছে পুরোন ইংরেজি boc থেকে, অর্থাৎ বীজ গাছ। বই জার্মানে হল buch, ইতালীয় ভাষায় libro, ফরাসিতে livre, রুশ ভাষায় kniga, চীনাতে shu। এবার আমরা এই আলোচনায় একটি বইয়ের গঠনসজ্জা কেমন হয় তা দেখে নেব।

[1]অনির্বান রায়, বই যখন বই, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১৩, পৃ: ১-৩।

৯.২..৩. গ্রন্থের গঠনবিন্যাস

একটি ছাপা গ্রন্থে মোটামুটি যে যে অংশগুলি দেখতে পাই তা এরকম:

প্রচ্ছদ বা বইয়ের মলাট (book cover), প্রাথমিক আখ্যাপত্র (half-title page), আখ্যাপত্র (title), প্রকাশনার সময় প্রকাশক মুদ্রকের নাম ঠিকানা ইত্যাদির বিবরণ (imprint), উৎসর্গপত্র (dedication), কৃতজ্ঞতা স্বীকার (acknowledgement), সূচিপত্র (contents), প্রয়োজনে সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা (list of abbreviation), মুখবন্ধ বা ভূমিকা (preface), গ্রন্থ-পরিচিতি (introduction), মূল পাঠ্যাংশ (text), পরিশিষ্ট (appendix), পরিভাষা (glossary), গ্রন্থবিবরণী (bibliography), নির্দেশিকা (index)। বাঁধানো বইয়ে মলাটের উপরে আরেকটি আবরণ চড়ানো থাকে একে জ্যাকেট বলা হয়। বইয়ের শেষের জ্যাকেটের অংশে লেখক পরিচিতি বা বইয়ের রিভিউ ইত্যাদি দেওয়ার চল রয়েছে। আজকের পাঠক জানেন যে কোনো ছাপা বইতে শুরুর পাতাটি প্রচ্ছদ। পুস্তানি অর্থাৎ প্রচ্ছদের কাগজকে ধরে রাখার জন্য যে মোটা কাগজ ব্যবহার করা হয়, সেই কাগজের সঙ্গেই শুরুতে ডানদিকের একটি পাতা থাকে। সেই পাতায় পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত টাইপ ফেসের থেকে বড় হাতের অক্ষরে পৃষ্ঠার মধ্যাংশে বা উপরের দিকে শুধুমাত্র বইয়ের নাম ছাপা হয়। এটি প্রাথমিক আখ্যাপত্র। প্রাথমিক আখ্যাপত্রের পরে থাকে আখ্যাপত্র। আখ্যাপত্রে বইয়ের নাম, লেখকের ও সম্পাদকের নাম, উপাধি, বইয়ের খণ্ডের ক্রমিক সংখ্যা, প্রকাশকের নাম, ছাপার স্থান, প্রকাশের সাল ইত্যাদি থাকে। আখ্যাপত্রটি ওল্টালে পরের বাঁদিকের পাতায় বইটির ছাপা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়া হয়। আর ডানদিকের পাতায় উৎসর্গপত্র। তারপরের পাতায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার। এরপর থাকে লেখকের কথা বা ভূমিকা। তারপর সূচিপত্র। ভূমিকা-সূচিপত্র শুরু হয় ডানদিকের পাতা থেকে। এরপর মূল বিষয়। মূল বিষয়ের শেষে পরিশিষ্ট অংশ থাকতে পারে। থাকতে পারে পরিভাষা অংশ। এরপর গ্রন্থবিবরণী। বইটির মূল বিষয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে কোন কোন সহায়ক গ্রন্থ লেখকের লেগেছে তা লিপিবদ্ধ করা থাকবে বইয়ের এই অংশে। বইটিতে ব্যবহৃত শব্দ ও ব্যক্তিনামের উল্লেখ করা হয় নির্দেশিকা অংশে। বইয়ের বিষয়ের উপর নির্ভর করে এই সাজানোর পদ্ধতি বদলে বদলে যেতে পারে। যেমন গল্প-কবিতার বইতে গ্রন্থবিবরণী নাও থাকতে পারে। বিষয় ছাড়াও বইয়ের এই গঠনসজ্জার বদল নির্ভর করে সময়ের উপর। উনিশশতকে যে পদ্ধতিতে বই ছাপা হোত এখন সে পদ্ধতিতে হয় না, ফলে বই ছাপানোর প্রয়োজনে থাকা বইয়ের অপরিহার্য কিছু অংশ বাতিল হতে বসেছে আজ। যেমন বই বাঁধাইকরের জন্য দেওয়া চিহ্ন 'সিগনেচার' বা ধরতাই বুলি (catch word)। হ্যালহেডের গ্রামার বইতে কিন্তু ছিল এ সবকটি। সে সময় বইয়ের অংশগুলি কেমন ছিল দেখে নেওয়া যাক। বই ছাপবার পর বই বাঁধাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আগেই সে কথা মাথায় রেখে বইয়ের সাইজ অনুয়াযী কাগজ কেটে কাগজের দিস্তাগুলিকে সাজানো হয়। একে বলা হয় 'gatherings'।

প্রতিটি দিস্তা বা এর প্রথম পৃষ্ঠার শেষে সাধারণভাবে বাঁদিকে একটি সংখ্যা বা অক্ষর বসানো থাকে। একে বলে 'Signature' বা বাঁধাইকরের চিহ্ন। পরের দিস্তায় এই সংখ্যা বা অক্ষর ফিরে আসে আবার।

বইয়ের শেষে এই সংখ্যা বা অক্ষরগুলি মিলে বাঁধাইকরকে পাতা সাজানোর সূত্র ধরিয়ে দেয়। একে বলে 'Register'। এসবই ঘটে একটি পৃষ্ঠায় মূল পাঠ্য অংশের বাইরে ছেড়ে রাখা মার্জিনে। আমাদের খেয়াল থাকবে এই মার্জিন অংশ কিন্তু পুথির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সেখানে শব্দের অর্থ, টীকা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ইত্যাদি লেখা থাকত। বই হাতে লেখা নয় তাই পুথির মার্জিনে লেখা বিষয়গুলির জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ তৈরি করে নেওয়া গেছে বইতে। বইয়ের মার্জিনের চারটি অংশ। উপর (Head), নীচ (Tail), বাঁদিক বা পৃষ্ঠার ভিতরের দিক (Inner), ডানদিক বা পৃষ্ঠার বাইরের দিক (Outer)। বইয়ের মার্জিন অংশে থাকে পৃষ্ঠা সংখ্যা, বাঁধাইকরের চিহ্ন আর ধরতাই বুলি (Catchword)। বইয়ের বাঁদিকের পাতার নীচে ডানদিকের পাতার প্রথম শব্দ, ডানদিকের পাতার নীচে পরের পৃষ্ঠার প্রথম শব্দ লেখা থাকে। যদিও এখন ধরতাই বুলির চল প্রায় নেই। মার্জিনের উপরের অংশে বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় থাকে বইয়ের নাম, প্রবন্ধের নাম। একে বলে 'Running Title'। বইয়ের আখ্যাপত্রের নীচেরঅংশে যেখানে প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য থাকে তাকে বলে 'Imprint'। আর এই একই তথ্য যদি বইয়ের শেষে থাকে তাকে বলে 'Colophon'। অনেকসময় ছাপাবইয়ের অধ্যায় শুরুতে অক্ষরগুলি সুন্দরভাবে বড় করে লেখা হয় একে বলে 'Ornamental Initials'। সাধারণত ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে বড় হাতের অক্ষরে ছাপা হয়।

উনিশশতকে বাংলায় ছাপাবইতেও এরকম উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়। বলাইবাহুল্য শুরুর দিকে বাংলা বইয়ের গঠনসজ্জা এমন ছিল না। গোয়া থেকে ছাপা বই বাংলাদেশে আসতে সময় লেগেছে প্রায় দুশো বছর। এতদিনের অপেক্ষায় বাঙালির খেদের কারণ থাকলেও সুবিধে ছিল বেশ কিছু। ইউরোপীয় ছাপা বই সামনে থাকার কারণে কেমন হবে আদর্শ ছাপা বই, কীভাবে তা ছাপতে হবে তার ম্যানুয়াল পেয়ে গেলেন হরফ নির্মাতা পঞ্চানন কর্মকার বা 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' এ ছবি আঁকিয়ে রামচাঁদ রায়েরা। হ্যালহেডের কাছেও ছিল তাঁরই লণ্ডন থেকে ছেপে আনা বই (A Code of Gentoo Laws 1776)। অথচ ইউরোপীয় বইয়ের আদর্শ থাকা সত্ত্বেও গঠনসজ্জার একরূপতার বদলে বিভিন্ন প্রবণতাই দেখা গেছে বাংলা বইয়ের ছাপবার শুরুতে। প্রথমেই আসি ১৭৭৮ সালে হুগলিতে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের 'A Grammar of the Bengal Language'-এর কথায়। বাংলা বইয়ের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। হুগলিতে ছাপা এই বইটিতে প্রথম বাঙালি বাংলা হরফ দেখতে পেল। এর আগে যেসব বইতে বাংলা হরফ ছাপা হয়েছে তা লন্ডন থেকে ছেপে আনা। হ্যালহেডের 'A Grammar of The Bengal Language' বইটির পাতার মাপ ছাপাখানার ভাষায় ক্রাউন কোয়ার্টো। অর্থাৎ ১০×৭১/২ ইঞ্চি। মুদ্রিত এলাকার আয়তন ৬৩/৪×৪৩/৪ ইঞ্চি। চারপাশে ছাড়ের সাদা অংশ। যাকে আমরা বাংলায় বলি 'শোভন সংস্করণ' বা 'ডিল্যুক্স'। প্রতি আট পৃষ্ঠায় একটি বিভাগ, প্রিন্টার্স সিগনেচার, ইংরেজি বড় হরফ, লং 'এস', অধ্যার আরম্ভে গয়নাগাটি (ornament) নিয়ে বইটি একেবারে বিলেতী ছাঁদে ছাপা হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বইটির প্রতি পাতায় 'catchword' বা 'ধরতাই বুলি' ব্যাবহার করতেও ভোলেননি পরিশ্রমী প্রকাশক। নামপত্রে বইয়ের নাম, লেখকের নাম, মুদ্রণের স্থান ও

বাংলা হরফে মুদ্রিত দুটি শ্লোক। এরপর 'PREFACE'। এটি ইংরেজিতে লেখা দীর্ঘ এক মুখবন্ধ। মুখবন্ধে রয়েছে বইটি ছাপার উদ্দেশ্য অর্থাৎ 'ফিরিঙ্গী' দের উপকারের জন্যই এই বই সেকথা ফলাও করে বলা। মুখবন্ধের শেষে সমাপ্তিসূচক নক্‌সা। মুখবন্ধ শেষে 'The CONTENTS.' সূচীপত্র শুরু হচ্ছে বাঁদিকের পাতা থেকে। এরা সম্ভবত একসঙ্গে চারপৃষ্ঠা ছাপতে পারেননি, ছেপেছেন দুপৃষ্ঠা। এরপর 'ERRATA' 'শুদ্ধিপত্র'। শুদ্ধিপত্র পর্যন্ত পৃষ্টাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে রোমানে। 'ADVERTISEMENT.', এর পৃষ্ঠায় কোনো পৃষ্ঠাসংখ্যা নেই। তারপর বই এর বিষয় শুরু। বড় ইংরেজি হরফে বইয়ের নাম লিখে অধ্যায় সংখ্যা ও অধ্যায়ের নাম লিখে বিষয় শুরু। শেষে সমাপ্তি বোঝাতে 'THE END' লেখা। বইটিতে অনেক নক্‌সার ব্যাবহার চোখে পড়বে পাঠকের। যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রমের পরিচয় দেন হ্যালহেড তাঁর বইটি ছাপতে। বইয়ের গঠনসজ্জা কেমন হবে তার একটি আদর্শ তিনি দিয়ে গেলেন এই বইতে। পরবর্তীতে ১৮০০ সালের পরে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস যে বইগুলি ছাপবেন তাতে কিন্তু সবসময় গঠনসজ্জার এই আদর্শকেই ধরে রাখা হয়নি। বাংলা বই ছাপার কারণেই হয়ত তাদের বইয়ের আখ্যাপত্র শুধু বাংলায় লেখা হয়েছে।

শ্রীরামপুর মিশন, স্কুল বুক সোসাইটি বা বিদ্যাসাগর বইয়ের গঠনসজ্জার যুক্তিটি বুঝে আদর্শ ছাপা বই পাঠকের হাতে তুলে দিলেও এটা ভাবা ভুল হবে এটাই এই সময়ের বইয়ের গঠনসজ্জার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রবণতা ছিল। নামী প্রেসের বাইরেও যেসব বই ছাপা হচ্ছিল তাদের মধ্যে বইয়ের গঠনসজ্জার ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো একরূপতা ছিল না। তাদের ছাপা বইয়ের গঠনসজ্জায় একরূপতা আনতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছে। বইয়ের গঠনসজ্জার যুক্তিটি তাদের প্রতিনিয়ত বই ছাপতে ছাপতে বুঝতে হয়েছে।

৯.৩. অলংকরণ

৯.৩.১. উদ্দেশ্য

ছাপার অক্ষরের সঙ্গে ছবি কি অনিবার্য? ছবি কেন এসে জোড়ে লেখার সঙ্গে, কী কী ভাবে সেই জোড় তৈরি হতে পারে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অংশে। দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে, উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা বইতে ছবি জুড়েছিল কোন যুক্তিতে তা নিয়ে। বাংলা বইতে ছবি ছাপবার জন্য ছিল নানা প্রযুক্তিও। কীভাবে সেই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করলেন আলংকারিকেরা সে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অংশে বিংশ শতকে বইয়ের অলংকরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৯.৩.২. প্রস্তাবনা

বাংলা বইয়ের অলংকরণ প্রসঙ্গের শুরুতেই এবিষয়ে আলোচনা করবার কারণ 'অলংকরণ' শব্দের অর্থে যে 'বাড়তি', 'বাহ্যিক অতিরঞ্জন' এর অর্থটি থাকে, সেটিকে আমরা গ্রহণ করব না। হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'[2]-এ 'অংকরণ' শব্দের অর্থ করেছেন মণ্ডন, ভূষণ, প্রসাধন, ভূষাকর দ্রব্যমাত্র। রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'[3]-এ 'অলংকরণ'-এর অর্থে বলেছেন, সজ্জা, নকশাকাটা, প্রসাধন, অতিরঞ্জন। এই 'ভূষাকর দ্রব্যমাত্র', 'অতিরঞ্জন'-এর অর্থটি যে বইয়ের ছবির ক্ষেত্রে থাকে না, সেটাই আমরা দেখব। বইয়ের অলংকরণের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই 'সামগ্রিকতা'র দৃষ্টিভঙ্গিকেই আমরা নেব।

এখন প্রশ্ন লেখার সঙ্গে ছবি জুড়ছে কেন? ছবি জুড়ছে তার কারণ সে 'ছবি' বলেই। ছবিই আসলে প্রথম, লেখা আসে তারপর। ভাষা শেখবার প্রথম পর্যায়ে মানুষ 'চিত্রলিপি'কেই বেছে নিয়েছিল। 'পাখি' বোঝাতে পাখি, 'মানুষ' বোঝাতে মানুষের ছবি। মিশরীয় লিপি বা সুমেরীয় লিপি এভাবেই একসময় মানুষের ভাববিনিময়ের কাজ করেছে। পরে সে ছবি থেকে চিহ্ন তৈরি করে মানুষ তৈরি করেছে তাঁর ভাষার লিপি। লিপি আবার ক্রমশ উচ্চারণনির্ভর হয়েছে। এভাবে ধীরে ধীরে বস্তুটি থেকে লিপি ও তার উচ্চারণ আলাদা হয়ে গেছে।

যা প্রয়োজনের বাহন তাও শিল্প হয়ে উঠতে পারে। ছবির সঙ্গে লেখার ঠিক ঠিক সঙ্গত হলে তাকে শিল্প না বলার কোনো কারণ নেই। শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার মধ্যে থাকে সামগ্রিকতার আভাষ। যেখানে বইয়ের ছবিগুলি বইটির মূল সুরটিকে ধরে নিজেই একটি ছবি হতে পারে সেক্ষত্রে সেই ছবিও শিল্প। প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। কারণ প্রচ্ছদ শুধুমাত্র বইয়ের বিষয়ের আভাষ দেয় না, সে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পাঠকের সামনে হাজির করে।

অলংকরণের কথায় বলতে হয়, ইউরোপের ষোড়শ শতাব্দীর অনেক ছাপাবইতে আমাদের পাণ্ডুলিপির মত মার্জিনে মন্তব্য ছাপা হয়েছে। পৃষ্ঠায় নানা অলংকরণের সঙ্গে মার্জিনে মন্তব্য। একে আমরা অলংকরণ বলতে পারি না তবে ছাপাবইকে পুথির কত কাছাকাছি আনা যায় তার প্রচেষ্টার প্রমাণ এই বইগুলি।

পুথি থেকেই ছাপাবইতে ছবি ও অলংকরণের ভাবনা শুরু। তারপর বইয়ে ছবি ছাপবার ইতিহাস আলাদা হয়ে গেছে ধীরে ধীরে পুথি থেকে। ছবি ছাপবার জন্যই কত ছাপা পদ্ধতির আবিষ্কার সেই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে অগ্রগামী ছিল চীন, জাপান, কোরিয়ার মত দেশগুলি। ১৪৬০ থেকে ১৪৬৫ সালের মধ্যে ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ছবি দেওয়া বই ছাপা হতে শুরু করেছে। এসময়ের অনেক বইতে দেখা যায় পুথির মতোই আগে লেখার অংশ ছাপা হয়েছে পরে কোনো মিনিয়েচর শিল্পী ছবি এঁকে দিয়েছেন। ছবির বই ছাপায় প্রথমে জার্মানি পরে নেদারল্যান্ডস, ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও ছবিওয়ালা বই ছাপা হয়েছে। পুথির ক্ষেত্রে যে পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করে থাকতে হত লেখক ও শিল্পীকে, ছাপাবইয়ের ক্ষেত্রে তার বদল হল। মুদ্রক-প্রকাশক ও

---

[2]হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', প্রথম খণ্ড, অ-ন, ১৩৪০-১৩৫৩; কলিকাতা:সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪ পৃ: ১৯১।

[3]রাজশেখর বসু, 'চলন্তিকা', কলকাতা:এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন মুদ্রণ ১৪১০, পৃ: ৪৫।

পাঠকের অভিরুচি অনুযায়ী বইতে ছবি যুক্ত হল।

৯.৩.৩. উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ পদ্ধতি

ছবি ছাপবার কারণেই মুদ্রণযন্ত্রের নানা পরিবর্তন হল। এবার সেদিকটি নিয়েই আমরা আলোচনা করব। পুথির হাতে আঁকা ছবির যুগ শেষ হলে উনিশ শতকের বাংলা বই ছাপার জন্য যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, তা এরকম—

১। কাঠখোদাই

২। ধাতুর পাতে এনগ্রেভিং

৩। ধাতুর পাতে এচিং

৪। লিথোগ্রাফ এবং ক্রোমোলিথোগ্রাফ

উনিশ শতকের একেবারে শেষে, বলা ভালো বিশ শতকের শুরুতে 'হাফটোন ব্লক' পদ্ধতিতে ছবি ছাপা হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায় এই পদ্ধতিতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

১। <u>কাঠখোদাই পদ্ধতি</u>:

বইতে ছবি ছাপার জন্য কাঠখোদাই পদ্ধতি সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। চীন এভাবেই ছবি ছেপেছে। কাঠখোদাইয়ের জন্য প্রথমে শিল্পী কাগজের উপর ছবিটি এঁকে নেন, তারপর ট্রেসিং পেপারের উপর সেই ছবির প্রতিলিপি এঁকে উল্টো করে কাঠের ফলকে আঁকেন। বুলি বা নুরুন জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে নরম কাঠে হালকা চাপ দিয়ে ধীরে ধীরে ছবিটি কেটে নেওয়া হয়। ব্লক তৈরি হল, এবার রঙের পালা। প্রথমে স্ক্রুয়ের সাহায্যে প্রিন্টিং মেশিনে ব্লকটি আটকে নেওয়া হয়। তারপর রঙের রোলার ব্লকের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেই রঙিন ব্লকটি ছাপাযন্ত্রের চাপের ফলে পৃষ্ঠায় ছবিটির ছাপ তোলে। অনেকটা কাঠের স্ট্যাম্পের মতই। একাধিক রঙের জন্য একাধিক ব্লক তৈরি করে ছেপে নেওয়া হত। যতদিন প্ল্যাটেন প্রেস ছিল, বাংলায় শুধু বই নয় কম খরচে বিল, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, পোস্টার সবই ছাপা হয়েছে কাঠখোদাই পদ্ধতিতে।

২। <u>ধাতুর পাতে এনগ্রেভিং:</u>

এনগ্রেভিং-এ ব্যবহার করা হয় কাঠের বদলে ধাতুর ব্লক। যে কোনো শক্ত জিনিযে খোদাই করাকে বলে এনগ্রেভিং, আর ধাতুপাতে এনগ্রেভিং এর কাজ হয় রিলিফ পদ্ধতিতে। এতে মেশিন বা হাতের সাহায্যে ছাপ তোলা হয়। ধাতুর উপর আঁকা ছবিকে মসৃণ করে নিয়ে রোলারের সাহায্যে রঙ বুলিয়ে কাঠখোদাইয়ের মতোই মেশিনে ছবিটির ছাপ তোলা হয় বইয়ের পৃষ্ঠায়। ধাতুপাতে এনগ্রেভিং হল কাঠের তুলনায় টেঁকসই ও ছবিতে সূক্ষ্মরেখা ফুটিয়ে তুলতে সফল পদ্ধতি।

৩। <u>ধাতুপাতে এচিং:</u>

ছবিতে সূক্ষ্মরেখা তো ছাপা হোল কিন্তু এবার সমস্যা হচ্ছে বিভিন্ন রঙের শেড তৈরি করতে অসুবিধা হোল। আর সেই সমস্যার সমাধান করতে এল এচিং পদ্ধতি। তামার বা দস্তার পাতের উপর পাতলা মোমের প্রলেপ দিয়ে তার উপর শক্ত সুচের সাহায্যে মূল চিত্রটিকে উল্টো আঁচড় কেটে

রেখাঙ্কন করতে হয়। আঁচড়গুলি মোমের আবরণ ভেদ করে তামার বা দস্তার পাতে দাগ কেটে যাবে। রেখাঙ্কনের কাজ সম্পূর্ণ হলে, নাইট্রিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে পাতটি চুবিয়ে রাখতে হয়। তারপর মেশিনে প্লেট চাপিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলে ছবি কাগজে উঠে আসে। এচিং পদ্ধতিতে রঙের টোন তৈরি হয়। শেড বানানো যায় এবং সূক্ষ্ম অলংকরণ ছাপানো যায়। বাংলা বইয়ে ছবি ছাপবার ক্ষেত্রে বহু বছর কাঠখোদাইয়ের সঙ্গেই এচিং-এর কাজ চলেছে।

৪। <u>ইলেক্ট্রো ব্লক পদ্ধতি:</u>

যখন অনেক কপি ছবি ছাপবার দরকার পড়ল তখন এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই ব্যবহার করা হোল ইলেক্ট্রো ব্লক পদ্ধতি। এতে কাঠখোদাই ব্লক থেকে ধাতুর প্লেট তৈরি করে নেওয়া হত। সেই ধাতুর প্লেট থেকে অনেক ছবি ছাপা যেত। আবার ধাতুর মূল প্লেটটিকে অবিকৃত রেখে দেওয়ার জন্যও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেত।

৫। <u>লিথোগ্রাফ:</u>

খোদাই চিত্রের সঙ্গে লিথোগ্রাফের পার্থক্য হচ্ছে, লিথোগ্রাফে ছবিকে খোদাই করবার প্রয়োজন হয় না। গ্রিক ভাষায় 'লিথো' অর্থে 'পাথর' আর 'গ্রাফ' শব্দের অর্থ 'লেখা' বা 'ছবি'। এক খণ্ড পাথরের উপর ছবির ছাপ তুলে তা দিয়ে ছবি ছাপা হলে তাকে বলে 'লিথোগ্রাফ'। অন্যান্য ছবির প্লেটের মতোই এই পাথরের প্লেটটিও মুদ্রাযন্ত্রে লাগিয়ে পৃষ্ঠায় ছবি তুলে নিতে হবে। এভাবে ছাপা সাদা-কালো লিথোকে বলে 'মনো-লিথো'। লিথোগ্রাফিতে রঙিন ছবিও ছাপা যায়। তাকে বলে 'ক্রোমো-লিথো'। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি রঙের জন্য আলাদা আলাদা পাথর ব্যবহার করা হয়।

১৮২৩ সালেই কলকাতায় 'এশিয়াটিক লিথোগ্রাফি প্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। জেমস রিগু ও জি। উড নামে দুজন শিল্পীর উদ্যোগে বাংলায় লিথোগ্রাফিতে ছবি ছাপার সূত্রপাত হয়।

৬। <u>লিনোকাট:</u>

এই পদ্ধতি কাঠখোদাই প্রিন্টের মতো। কাঠের বদলে লিনোলিয়াম নামে একটা পদার্থ এই কাজে ব্যবহৃত হয়। কাঠের তুলনায় লিনোলিয়াম নরম। কাঠখোদাই পদ্ধতির মতো এখানেও প্রথমে ছবির একটা উল্টো রূপ আঁকতে হয়। লিনোকাট থেকে বহুরঙের ছবি ছাপানো যায়।

৭। <u>স্টেনসিল:</u>

এটাও এক ধরনের ছাপাই ছবি। মোটা কাগজের বা পাতলা টিনের পাতের উপর ছবি
এঁকে সেটাকে কাটা হয়। স্টেনসিলে একাধিক রঙ লাগানো যায়।

হাফটোন ব্লক আসার আগে পর্যন্ত উনিশ শতকের বাংলা বইতে উপরের পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে ছবি ছাপার ক্ষেত্রে। এবার এইসব পদ্ধতি বাংলা ছাপাবইয়ে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে দেখা যাক।

উনিশ শতকে এইসব ছবি ছাপবার পদ্ধতি বিশ শতকেও বেশ কিছুকাল বহাল থাকছে। প্রকাশক ও মুদ্রকের অভিরুচির উপর নির্ভর করছিল তাঁরা কি ধরনের বইতে কি ধরনের ছবি ছাপবেন ও তা ছাপার পদ্ধতিও তাঁদের গ্রন্থচিত্রণের ধারণার উপর নির্ভর করছিল। বিশ শতকে এসে এই ছবি ছাপা পদ্ধতির

বড় বদল ঘটছে কম্পিউটার আসার ফলে। ডিজিটাল প্রিন্টিঙের নতুন এক সময়ের সূচনা করছে।

৯.৩.৪. বাংলা বইয়ের অলংকরণ

উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ বাংলা বইতে উনিশ শতকে ছবি ছাপবার অনেক আগেই বিদেশি শিল্পী প্রকাশক মুদ্রকেরা এখানে শুধু কাঠখোদাই নয় ধাতুখোদাই করেও ছবি ছেপেছেন। ইংরেজি বইতে সে সব ছবি ছাপা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই। ১৭৮৫ সালে জর্জ গর্ডন এর প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল মিস এমিলি ব্রিটলের 'The India Guide; or Journal of a Voyage, to the East Indies'। 'বারো সিক্কা' দামের বইতে ছিল ধাতুর প্লেট। সে বছরই ড্যানিয়ল স্টুয়ার্ট-এর ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত আরেকটি কবিতার বই 'The Bevy of Calcutta Beauties', যাতে ছিল রিচার্ড ব্রিটট্রিজ-এর আঁকা ধাতু এনগ্রেভিং-এ হুগলি নদীর তীরে ধর্মতলার ছবি। তারপর ১৭৮৮ তে 'এশিয়াটিক রিসার্চেস'—এর প্রথম খণ্ডে উইলিয়াম জোন্সের 'On the Gods of Greece, Italy and India' প্রবন্ধে চোদ্দটি দেবদেবীর কাঠখোদাই ছবি প্রকাশিত হয়। এরপর আরও বই প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজের ছাপাখানা থেকে যেখানে কোথাও উনিশটির মত প্লেটও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষে বইতে ছবি ছাপবার অবস্থা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় তখন ছবি ছাপবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। বিদেশ থেকে ছবি ছাপিয়ে আনতে হচ্ছিল না। এইরকম প্রতিবেশে বাঙালি মুদ্রকেরা বই ছাপতে আসছেন।

এখানেও আমরা আগে যেমন বলেছিলাম, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 'প্রথম'। শ্রীরামপুরের কম্পোজিটর কলকাতায় এসে হলেন প্রকাশক। বই ব্যবসাটা ভালোই বুঝেছিলেন গঙ্গাকিশোর। বইয়ের সঙ্গে ছবি ছাপলে পাঠকের কাছে তা আকর্ষণীয় হবে জানতেন গঙ্গাকিশোর। আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে গঙ্গাকিশোরই বোধ হয় সেই ব্যক্তি যিনি বুঝেছিলেন পুথির পাটাচিত্রে অভ্যস্ত চোখ ছাপা বইতেও ছবি খুঁজবে। ১৮১৬ সালে কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেস থেকে তিনি প্রকাশ করেন বাংলার প্রথম সচিত্র বই ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'। বিজ্ঞাপনে লিখলেন 'পুস্তকের প্রতি উপক্ষণে এক২ প্রতিমূর্ত্তি থাকিবেক।' ছবি ছাপবার শিল্পী খুঁজতে বেশি কষ্ট করতে হয়নি, কারণ আগেই দেখিয়েছি ছবি ছাপবার কাজ হচ্ছিলই আগে থেকে। সূক্ষ্ম কাজে দক্ষ স্বর্ণকারেরা তখন ছবি ছাপার কাজ করছিলেন। তাঁদের সাহায্যে ছটি ছবি খোদাই করে প্রকাশ করলেন 'অন্নদামঙ্গল'। তার মধ্যে দুটি ধাতু খোদাইয়ের ছবির শিল্পী রামচাঁদ রায়। বাকিগুলোতে শিল্পীর নাম উল্লেখ নেই। ছটি ছবির পরিচয় ইংরেজিতে দেওয়া।

১। Unno Poornah অন্নপূর্ণা, ২। Soonder সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা, ৩। Soonder E. Durroawn সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রেবেস, ৪। Soonder সুন্দরের বকুলতলায় বৈশন, ৫। Biddah and Soonder বিদ্যাসুন্দরের দর্শন, ৬। Soonder and Cotual সুন্দর চোর ধরা।

এর মধ্যে ধাতুখোদাই দুটি- 'সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা' ও 'সুন্দরের বর্দ্ধমান পুর প্রেবেস'। যেগুলি 'Engraved by Ramchand Roy'।

ইংরেজিতে এইভাবে ছবির বর্ণনা দেওয়া সচিত্র অন্নদামঙ্গল থেকেই পরবর্তী প্রকাশকেরা নিয়ে থাকবেন। কারণ সচিত্র অন্নদামঙ্গল এর পরে পরেই অন্যান্য ছাপাখানা থেকে যেসব 'অন্নদামঙ্গল'

প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ছবি ও ইংরেজিতে তার বর্ণনা দিতে ভোলেননি মুদ্রক। স্বাভাবিকভাবেই সচিত্র অন্নদামঙ্গল সমাদৃত হচ্ছে পাঠক মহলে। বিখ্যাত হচ্ছেন শিল্পী রামচাঁদ রায়। পরবর্তীতে গঙ্গাকিশোর যখন 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ছাপছেন তখনও শিল্পী রামচাঁদ রায়। ১৮১৮ সালে রাধামোহন সেনের 'সঙ্গীত তরঙ্গ' বইতেও রামচাঁদ রায়েরই এনগ্রেভিং রয়েছে। তার এক বছর আগে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' থেকে প্রকাশিত একটি বইতে কাশীনাথ মিস্ত্রির ধাতুখোদাই ছিল। এরপর কলকাতায় আসেন কাঠখোদাই ও ধাতু খোদাইতে দক্ষ লোক জন লসন। তিনি ১৮১৯ সালে স্কুলবুক সোসাইটির জন্য ছাপা একটি বই 'সিংহের বিবরণ' এ একটি সিংহের ছবি খোদাই করে দেন। তাই দেখে নাকি ছাত্ররা বই রেখে স্কুল থেকে পালিয়ে যায়! এমন কথা বলছেন লং। তবে লসনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ১৮২২ সাল থেকে ছাপা সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'পশ্বাবলী'। মোটামুটি এসময় থেকেই বইতে ছবির চাহিদা বাড়তে থাকে। পাঠক সুন্দর বই পড়বেন বলে যেমন বইয়ে ছবি ছাপা হচ্ছে, তেমন ছবি ছাপার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তৈরি হয়েছে। ততদিনে ছাত্রদের জন্য পাঠ্যবই প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। ভূগোলের মানচিত্র, ইতিহাসে রাজার ছবি, পশুপাখির বিবরণ এসবেই তখন ছবি ছাপার দরকার হচ্ছিল। আরও ছোটদের জন্য প্রাইমারে অক্ষর পরিচয়ের জন্য বাংলা অক্ষরের সঙ্গে ছড়া ও ছবি ছাপতে হচ্ছিল। যে কারণে এ সময়ে স্কুল বুক সোসাইটির বইতে আমরা ভালোই ছবি পাচ্ছি। ১৮২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া'-এ একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় "শিরোনামে। সেখান থেকে জানা যায় শুধু পাঠ্যপুস্তক নয় এসময় যেমন হরেক বিষয়ের বই ছাপা হচ্ছিল তেমন তাতে ছবি ছাপার চলও চলছিল। বড় ছোট, দামি-সস্তা সবরকম প্রেস থেকেই ছবিসহ বই ছাপা হচ্ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছবিসহ ছাপা বইয়ের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে- 'সঙ্গীততরঙ্গ' (১৮১৮), 'বিদ্যাসুন্দর' (১৮২৩), 'বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিনী' (১৮২৪), 'গৌরীবিলাস' (১৮২৪), 'আনন্দলহরী' (১৮২৪), 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৮২৪), 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮২৪), 'জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা' (১৮২৪), 'অন্নদামঙ্গল' (১৮২৮), 'হরিহরমঙ্গল' (১৮৩১), 'কালী কৈবল্যদায়িনী' (১৮৩৬), 'ভগবদ্গীতা' (১৮৩৬), 'পক্ষীর বিবরণ' (১৮৪৪), 'মনস্তত্ত্বসার সংগ্রহ' (১৮৪৯)।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কাঠ ও ধাতু খোদাই ছাড়া লিথোগ্রাফিতে ছবি ছাপবার চেষ্টা হয়। ১৮৪৭ সালে 'শাহনামা' গ্রন্থে প্রথম লিথো ছবির ব্যবহার দেখা যায়। যদিও তার অনেক আগেই কলকাতায় লিথোপ্রেস চালু হয়ে গেছে। ১৮২৩ সালে ফরাসী শিল্পীদের উদ্যোগে লিথোপ্রেস চালু হয়। 'সমাচার দর্পণ'—এ ১৮২৯ সালেই কলকাতার লিথোপ্রেসের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সে বইয়ের সন্ধান আমরা পাইনি। তবে 'শাহনামা'-এর আগে লিথো ছবির বইটি পাওয়া না যাওয়ায় এটিকেই প্রথম বাংলায় লিথোছবি সহ বইয়ের নিদর্শন হিসেবে ধরতে হবে।

এই সময়ের কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম—বিশ্বম্ভর আচার্য, রামধন স্বর্ণকার, মাধবচন্দ্র দাস, রূপচাঁদ আচার্য, বীরচন্দ্র দত্ত, রামসাগর চক্রবর্তী, মনোহর মিস্ত্রী ও তাঁর পুত্র কৃষ্ণ মিস্ত্রী। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছবিসহ বাংলা ছাপাবইয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বোঝা যায় ছবি ছাপার পদ্ধতি সহজ

হয়েছে। সহজলভ্য হয়েছে ছবি ছাপবার উপাদান। ছবি ছাপবার খরচও কিছুটা কমেছে। শিল্পীরাও এসময়ে পাচ্ছেন প্রশিক্ষণ। তাই শুরুর দশকে 'সমাচার দর্পন'-এ লিথোগ্রাফি জানা শিল্পীর খেদ এবার পূরণ হচ্ছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতার 'শিল্পবিদ্যোৎসাহিনীসভা' একটি শিল্পবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করে 'School of Industrial Art' নামে। এই বিদ্যালয়ের উদ্যোক্তা ও সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। লন্ডন থেকে টি এফ ফাউলার নামে একজন শিক্ষককে নিয়ে এসে কাঠখোদাই ও ধাতুখোদাই শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

এই সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ১৮৫০ সালের 'ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি' বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'। এই সোসাইটি থেকে 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' নামে অনুবাদের একটি সিরিজ প্রকাশিত হত। এখানে প্রতিটি বইতেই থাকত ছবি। সেসব ছবির প্লেট লন্ডন থেকে আনানো হত। সচিত্র 'রবিনসন ক্রুশো' থেকে লর্ড ক্লাইভের চরিতসব বিষয়ের বইতেই এঁরা ছবি ছাপতেন। এই সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫১ সালে 'পেনি ম্যাগাজিন'-এর ধরনে তিনি ছাপেন সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'। উনিশ শতক জুড়ে রয়েছে এ ধরনের ছবিওয়ালা বই ও পত্রিকা। ১৮৫১ সালে স্কুল বুক সোসাইটির 'উষ্ট্রের মনোরঞ্জন ইতিহাস' পুস্তিকা, আর সে বছরই প্রকাশিত 'ঠাকুরদাদার হস্তি বিষয়ক ইতিহাস'-এর পাতায় রয়েছে অসাধারণ সব ছবি। শুধু স্কুলবুক সোসাইটি কেন তাদের দেখাদেখি আর যারা পাঠ্যপুস্তক ছাপছিলেন তারাও বইতে ছবি যোগ করলেন। যেমন ১৮৫২ তে সুধাসিন্ধু প্রেসে ছাপা 'শিশুবোধক'। বটতলায় হরিহর প্রেসের 'শিশুবোধক'এ সবেতেই ছিল ছবি। ১৮৫৯ সালে সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণীবৃত্তান্ত' বইটি তো ছিল বিখ্যাত। প্রতি পাতা বাঘ, সিংহ, হায়না, সিন্ধুঘোটকের ছবিতে ভরা। ততদিনে বোধহয় ছাত্ররাও বুঝে গেছে এগুলো ছবি! তাদের ফরমায়েশও তাই বেশি ছবির। অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ'-এর তিনটি ভাগ, 'পদার্থবিদ্যা' মতো জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকও তাই ছিল সচিত্র। ১৮৬৪ সালের মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক রামনারায়ণ দাসের 'অস্ত্রচিকিৎসা' বইতে ছিল বাইশটি ছবি। গিরিশচন্দ্র তর্কালংকারের 'জীবতত্ত্ব'-র বইতে ছিল আটাত্তরটি ছবি। ছবির সংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। বটতলার বইয়ের ছাপাই বা বাদ যায় কোথায়। সুকুমার সেন, শ্রীপান্থ এঁরা তো তার খতিয়ান দিয়ে গেছেন তাঁদের লেখায়। ১৮২৫ সালের ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যের 'দূতীবিলাস'-এ ছিল ১২টা লাইন এনগ্রেভিং। 'সম্ভোগ রত্নাকর' বইতে ছিল ১৬খানা ছবি। নাটক, প্রহসন, আদিরসের বইতে ছবি ছাপতে ভুলত না বটতলার প্রকাশকেরা। ভালো ছবি ছাপতেন মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। শেক্সপিয়রের নাটকের অনুবাদ 'অপূর্বোখ্যান'-এ ছিল উনিশটি ছবি। ১৮৭৫ এ প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে ছ'টি লিথো ছবি ছাপা হয়েছিল। এরকম আরও কত 'ছবি'র গল্প রয়েছে উনিশ শতকের বইয়ের পাতায় পাতায়। যদিও দুঃখের বিষয় সেসব বইয়ের খুব সামান্যই আমরা সংরক্ষণ করেছি।

৯.৩.৪.১. উনিশ শতকের প্রথমার্ধ

'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮২২): পীয়র্স সাহেবের লেখা বইটির প্রকাশক স্কুল বুক সোসাইটি। ছেপেছিল সার্কুলার রোডের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস। এই বইয়ের শুরুতে আখ্যাপত্রের শুরুতে বাড়তি কাগজ যোগ করে পৃথিবীর মানচিত্র 'ভূগোল' নামে। পরে শব্দের নির্ঘণ্ট শেষ হলে 'ভূগোলের চিহ্ন' নামে আরেকটি ছবি। বইয়ের মধ্যেও রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রের ছবি। বইয়ের বাইরের মানচিত্রগুলি আলাদা কাগজে জোড়া। নীচে স্কুল বুক সোসাইটির লোগো ও সঙ্গে লেখা স্কুল বুক সোসাইটির জন্য এনগ্রেভ করা হোল। সম্ভবত ধাতুখোদাইয়ের কাজটি কাশীনাথ মিস্ত্রী। অসম্ভব পরিষ্কার দুটি মানচিত্র পাঠ্যপুস্তকের ছবি হিসেবে একেবারে মানানসই।

'শ্রীশিব নারদ সম্বাদে শ্রীশ্রীদুর্গা মাহাত্ম্য' (১৮২১): বইটিতে প্রকাশকাল থাকলেও স্থান বা ছাপাখানার উল্লেখ নেই। সংকলকের নামও নেই। ৬৯ পাতার এই বইয়ের শুরুতে আখ্যাপত্রের আগে দুটি পৃষ্ঠাজোড়া ছবি রয়েছে। 'অন্নদামঙ্গল'-এর ছবির ধাঁচে আঁকা অপূর্ব সুন্দর দুটি ছবি। ছবিতে বাদশাহি আমলের বাড়িঘর, বেশভূষার স্পষ্ট ছাপ।

'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' (১৮২৩): দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' ছাপা হয়েছিল 'বিন্দুবাসিনী যন্ত্র' থেকে। বইটিতে দুটি কাঠখোদাই ছবি রয়েছে। প্রথম ছবিটি দেশীয় পটের আঙ্গিকে। কিন্তু দ্বিতীয় ছবিতে দেশি-বিদেশ মিশেল। বাড়ির চেহারা ইংরেজদের তৈরি বাড়ির মতোই। সঙ্গে বিলেতি ধরনের পর্দা। তবে চোগা-চাপকান পরা মানুষের ছবিতে বাদশাহি ছাপ।

'অন্নদামঙ্গল' (১৮২৩): 'বাঙ্গালী ছাপাখানা' থেকে প্রকাশিত অন্নদামঙ্গলে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল'-এর মতোই ঠিক ছ'টি ছবি ছিল। ছবির বিষয়গুলিও এক। তবে ছবিগুলি একটু আলাদা। শুরুতেই শুধু অন্নপূর্ণার ছবির বদলে রয়েছে শিবের ভিক্ষাপাত্র হাতে ছবিও। শিল্পীর নাম বিশ্বনাথ মুখার্জী। ১৮১৬ তে ছাপা অন্নদামঙ্গল-এর ছবির সঙ্গে বেশ পাল্লা দেওয়ার মতোই আঁকা।

'দূতীবিলাস' (১৮২৫): ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্র থেকে প্রকাশিত ১৩২ পৃষ্ঠার 'দূতীবিলাস'-এ ছবি ছিল বারোটি শিল্পীর নাম নেই। ছবিগুলি কোনো ঘটনার ছবি নয়। গল্পের চরিত্রদের ছবি। বারো জন চরিত্রের বারোটি ছবি। সে সময়ের অন্য কোনো বইতে এরকম শুধুই চরিত্রের ছবির কথা আমাদের জানা নেই। এখানেই ভবানীচরণের চমক।

উনিশ শতকের ছবিতে দুটি ধারা আমরাও খেয়াল করেছি। এক ধরনের মধ্যে বাদশাহি ও দেশীয় শিল্পের মিশেল আর আরেক ধরনে রয়েছে বিদেশি শিল্পের প্রভাব। যেমন 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী'-তে গঙ্গার ছবি যখন আঁকা হয়েছে তখন পটচিত্রের প্রভাব আবার যখন যজ্ঞের ছবি আঁকা হয়েছে তখন ঐ 'ভিনিসীয় দেওয়ালগিরি' লাগানো। যাকে পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন 'দোআঁশলামি'।[4] এই 'দোআঁশলামি' যে

[4]Purnendu Pattrea,"The Continuity of the Battala Tradition: An Aesthetic Revaluation", Asit Paul (edited), 'Woodcut Prints of Nineteenth Century Calcutta', Kolkata: Seagull Books, 1983, pp. 59-71

স্বাভাবিক একথাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাদের সঙ্গে ওঠা বসা, তাদের ছবির প্রভাব তো পড়বেই আঁকায়। একেবারেই ঠিক কথা। তাহলে কী হল, না যে বিষয়ে লেখা হচ্ছে তা বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারা বা সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ আর ছবিতে আঁকা হচ্ছে 'ভিনিসীয় দেওয়ালগিরি'। ইংরেজরা যখন বইতে ধর্মতলার ছবি দেবদেবীর ছবি জুড়ছিল, তার কারণ ছিল নতুন দেশ ও সভ্যতার কথা নিজের দেশের মানুষকে জানানো। বইগুলির বিষয় দেখলেও তা স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ ছবি এখানে তাদের বিবরণের সাক্ষ্য বহন করছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে যখন পাঠ্যপুস্তকে ছবি ছাপা হচ্ছিল; এই যেমন পীয়র্স সাহেবের ভূগোলের বই বা স্কুল বুক সোসাইটির অন্য বইগুলি তখন ছাত্রদের পাঠ বোঝাবার তাগিদে বই ছাপা হচ্ছিল। সবটাই প্রয়োজনের কারণে ছবি ছাপা। কিন্তু গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী তাগিদ ছিল ছবি ছাপার? বই বিক্রির। ছবি ছেপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বইতে ছবি ছেপে তাঁরা যে বেশ মুনাফা করেছিলেন তেমন প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহলে বলা যায় উনিশ শতকের শুরুতে বইয়ে ছবি ছাপা হচ্ছিল হয় প্রয়োজনে না হলে ভালো বিক্রির আশায়।

তারপরেও কিছু কথা বলতে হয় উনিশ শতকের বাংলা বইয়ের ছাপা প্রসঙ্গে। যদি ধরে নিই বইয়ে ছবি ছাপা হয়েছিল কিন্তু লেখার সঙ্গে তাদের সংগতি সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া যায় না, তাহলেও ছবিগুলির দাবি ইতিহাসের কাছে কিছু কম হয় না। পুথিতে ছবি আঁকার যা স্বাধীনতা ছিল চিত্রকরের ছাপায় কিন্তু ছিল না। ছবি আঁকার আগে শিল্পীকে ভাবতে হত কীভাবে ছাপবেন সেটি। তখনও শিল্পীর রঙ-তুলির সহযোগী প্রযুক্তি আসেনি। কাঠ বা ধাতু সবেতেই ছবি ছাপবার কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। 'চোগা-চাপকান পরা রামসীতা'-র ছবিতে দুই দেশের শিল্পের মেলবার পরিসরের ইতিহাস আঁকা হল।

৯.৩.৪.২. উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ

<u>'দেবীযুদ্ধ' (১৮৫২):</u> জয়নাথ বিসীর 'দেবীযুদ্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রেস থেকে। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থই এঁরা ছাপতেন। তার মধ্যে 'দেবীযুদ্ধ' উল্লেখযোগ্য তার ছবির জন্য। একটি ছবিতে গঙ্গাদেবীর আঁকা প্রতিকৃতির নিচে লেখা 'তারিণীচরণ স্বর্ণকারের কৃত'। ছবিগুলিতে বিদেশি প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের ছবিটি এঁকেছেন মাধবচন্দ্র দাস। পিছনে শামিয়ানায় ছাপা ফুল অবধি খোদাই করা হয়েছে। জগদ্ধাত্রী বা দুর্গার একচালা মূর্তির ছবিতে আলপনার সূক্ষ্ম কাজ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীর কাজ বলে মনে হয়।

<u>'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬):</u> অক্ষয়কুমার দত্তের বই 'পদার্থবিদ্যা'-এ ছিল রঙিন প্রচ্ছদ। সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা এই বইয়ের পাতার মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরীক্ষার ছবি। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের ছবি সূক্ষ্ম রেখায় আঁকা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের কথা আলাদা করে বলছি তার কারণ 'School of Industrial Art'। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা যখন বইয়ের ছবি আঁকতে আসছেন তখন বইয়ের ছবিতে কিছু পার্থক্য তো

হওয়ার কথা। যেমন 'দেবীযুদ্ধ' বইতে ছবিগুলির ফ্রেমিং, তার ভারসাম্যের বোধ চোখে পড়বার মতো। ফিগারের চারপাশে ফাঁকা অংশকে শিল্পী ব্যবহার করেছেন অসামান্য দক্ষতায়। কোথাও সুন্দরী নারীর পিছনে মেঘ-বিদ্যুতের খেলা, কোথাও রাজার পিছনে শামিয়ানার ভাঁজ ব্যবহার করা হয়েছে ছবির বিভিন্ন তলকে চিহ্নিত করতে। এটি যে আর্টস্কুলের শিক্ষার প্রভাব সেটি সহজেই অনুমেয়। তবে এই সময়ে বইয়ে ছবি ছাপবার জন্য আলাদা করে যাঁদের কথা বলতে হয় তারা 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি' বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'।

১৮৫০ সালে উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও হাওড়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হজসন প্র্যাট সাহেবের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'। প্রথমে এ সভার সদস্যরা ভেবেছিলেন 'পেনি' পত্রিকার আদলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করবেন। পেনি পত্রিকার আদলে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ' (১৮৫১) ও 'রহস্য সন্দর্ভ' (১৮৬৩) পত্রিকাদুটি। আর অনুবাদের বইয়ের সিরিজ বেরিয়েছিল 'গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ' নামে। হান্‌স অ্যান্ডারসনের গল্প থেকে রবিনসন ক্রুশোর গল্প সবই তাঁরা ছেপেছিলেন। বই ছাপার সঙ্গেই এদের বইয়ের আকর্ষণ ছিল ছবি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বইয়ের ভিতরে। ততদিনে 'সংস্কৃত প্রেস' এসে গেছে। তাঁদের বইতে উপরে রঙিন প্রচ্ছদ থাকছে। মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের বইয়ের ক্ষেত্রে বইয়ের মধ্যের বাড়তি অলংকার ঝেড়ে ফেলে, রঙিন হরফে বইয়ের নাম অধ্যায় শুরু বা সমাপ্তিতে সামান্য পৃষ্ঠা বিভাজিকার জন্য অলংকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে। আর রঙিন প্রচ্ছদ বলতে কিন্তু আজকের মতো ছবিওয়ালা প্রচ্ছদ নয়। বইয়ের আখ্যাপত্রটিই চারপাশে সামান্য বর্ডার সহযোগে রঙিন কাগজে ছাপা হচ্ছে। এই প্রচ্ছদের পিছনের পাতা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাবহার করা হচ্ছে। যদিও প্রচ্ছদে কখনো কখনো একটি সিলমোহর ছবির মতো ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন মাইকেল মধুসূদনের বইগুলিতে। স্ট্যানহোপ যন্ত্রে ছাপা অন্য বইগুলির থেকে মধুসূদনের বই ছাপায় আলাদা যত্ন দেখা যেত। বইয়ের আখ্যাপত্রের একটি প্রতিলিপির মাঝখানে একটি সিলমোহর ছাপা হত। বইয়ের প্রচ্ছদে আলাদা করে ছবি দিয়ে প্রচ্ছদকে সাজানো হচ্ছে ১৮৬৭ সালেরও পরের দিকে বইয়ের প্রচ্ছদে ছবি ছাপবার প্রবণতা বাড়ছে।

উনিশ শতকের বইয়ের ছবি প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলার আছে। সেটি শিল্পীর স্বীকৃতি। বইয়ের ছবিতে যে সবসময় শিল্পীর নামের উল্লেখ থেকেছে তা কিন্তু নয়। যেমন ১৮১৬ সালের 'অন্নদামঙ্গল'-এই রামচাঁদ রায় ছাড়া আর কে কাঠখোদাই করেছেন তার নামের উল্লেখ নেই। যেখানে খোদাই পাতের মধ্যেই নাম পাওয়া গেছে সেখান থেকেই আমরা যে দু-চারজন শিল্পীর নাম জানতে পারছি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিল্পীর নাম বেশি চোখে পড়বে। কারণ শিল্পীদের আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাদের শিল্পী সত্তার প্রতিষ্ঠার আত্মপ্রকাশ ঘটছে বইয়ের মধ্যে ছবি এঁকে। উনিশ শতকের শুরুতে বইয়ের মধ্যে ছবি যোগ করবার যে বাণিজ্যিক কারণ ছিল সেখান থেকে এগিয়ে এসে উনিশ শতকে বইয়ের মধ্যেকার ছবি 'ছবি' হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করছে। লেখার সঙ্গে সুন্দর একটি ছবি যোগ

হচ্ছে। সেই ছবি লেখার বাইরেও একটি ছবি হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখানে লেখক আর শিল্পী সহযোগী গ্রন্থনির্মাতা। এর পরের শতকের ইতিহাস হবে মেলবার ইতিহাস। উনিশ শতকের শেষদিকে হাফটোন ব্লকপদ্ধতি জটিল হলেও ছবি ছাপবার ক্ষেত্রে আনেকটা নিখুঁত হচ্ছে। বিশ শতকে আসছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলালের মতো শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ যাঁদের দিয়ে বই আঁকিয়ে নিচ্ছেন এবং নিজেও ভাবছেন বইয়ের ছবি নিয়ে। শান্তিনিকেতনে নানা শিল্পের মেলবার জায়গা তৈরি হচ্ছে। বইয়ের ছবি আর শুধুই ছবিও থাকছে না হয়ে উঠছে লেখা ও পড়ারই অংশ।

ছবি ৩: ১৮১৬ সালে ছাপা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'অন্নদামঙ্গল'

BIDDAH AND SOONDER,
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন।

ছবি ৪: ১৮৫২ সালে ছাপা 'দেবীযুদ্ধ'

D:\Suvendu\NSOU\NEP Book\NEP\NSE-BG-01\Alok
1st prf.\Dt. 17.03.2025

মহিষাসুরের সভা।

ছবি ৫: সহজপাঠ

ছবি ৬: টুনটুনির বই

৯.৩.৫. বিশ শতকের বাংলা বইয়ের অলংকরণ

উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে বাংলা বইয়ের অলংকরণে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরির হাফটোন ব্লকে ছবি ছাপবার কারণে। হাফটোন ব্লকের প্রয়োজনীয়তা দেখা গেল নানা রঙের শেডকে ছবিতে ফুটিয়ে তোলবার জন্য। একজন শিল্পী তার প্যালেটে নানান রঙের মিশ্রণ ঘটিয়ে ছবিতে রঙ করেন। কিন্তু সেই ছবি ছাপতে গেলে তা কালো কালিতেই ছাপতে হবে। শিল্পীর আঁকা ছবির কত কাছে আর ছাপা ছবি যেতে পারে! এই অতৃপ্তি থেকে কিছুটা আনন্দ দিল হাফটোন ব্লক। বিদেশ থেকে ফটোগ্রাফি নিয়ে গবেষণা করে এসে উপেন্দ্রকিশোর হাফটোন ব্লক তৈরি করলেন। যা ফটোগ্রাফির নিয়ম মেনে চলে। সম্পূর্ণ কালো বা সাদা রঙের মধ্যেও সূক্ষ্ম শেড তৈরি করে বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপ আনা যায় এই ব্লকের সাহায্যে। আর যদি সরাসরি ফটোগ্রাফি ছাপতে হয় কাগজে তাহলে ফটো ছাপবার উপযুক্ত ব্লক এই হাফটোন ব্লক। লন্ডনে মুদ্রণ সংক্রান্ত সুবিখ্যাত পত্রিকা 'পেনরোজেস পিক্টোরিয়াল অ্যানুয়াল' এ পরপর তিনবছর ১৮৯৭, ৯৮, ৯৯ তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাঁর। যা বিদেশে সমাদৃত হয়।

১৮৯৫ সাল থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ব্লক নির্মাণের ব্যবসা শুরু করেছিলেন কলকাতায়। তখন তাঁর কোম্পানির নাম ছিল 'ইউ রে আর্টিস্ট' নামে। প্রবাসীর প্রচ্ছদ এখান থেকেই ছাপা হোত। ১৩১০ বঙ্গাব্দে আষাঢ় সংখ্যায় প্রবাসীতে রাজা রবিবর্মার একটি রঙিন তৈলচিত্র হাফটোন ব্লকে ছাপা হয়। এটি বাংলার মুদ্রণ ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেকথা প্রবাসী এই সংখ্যায় পাঠককে জানায়। ১৩২০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ প্রথম সন্দেশ পত্রিকা ছাপা হয় এখান থেকেই। শুধু পত্রিকার বিষয়ে নয় আমরা জানি শিশু-কিশোর পাঠ্য এই পত্রিকায় ছাপা ছবি এখনো প্রশংসার যোগ্য। ১৩২০ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২২ বঙ্গাব্দের পৌষ অবধি এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার ছিল উপেন্দ্রকিশোরের উপর। তারপর দায়িত্ব নেন তাঁর পুত্র সুকুমার রায়। সন্দেশ সেকালের বহুপঠিত একটি পত্রিকা। ৩২ পাতার ডবল ক্রাউন সাইজের এই পত্রিকার অঙ্গসজ্জা, ছাপা ছবি, উজ্জ্বল রঙিন প্রচ্ছদ শিশুকে আকর্ষণ করার সঙ্গে বড়দেরও ছিল প্রিয়। সন্দেশে ফটোগ্রাফও ছাপা হোত।

১৯১০ সালে উপেন্দ্রকিশোর তাঁর কোম্পানির নতুন নামকরণ করলেন 'ইউ রায় এন্ড সন্স'। জনপ্রিয় 'টুনটুনির বই' এই নতুন সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়। পুত্র সুকুমার রায়ের উৎসাহ দেখে তাঁকেও মুদ্রণ নিয়ে পড়তে পাঠান লন্ডনে। ফিরে এসে সুকুমার সন্দেশ পত্রিকার সম্পাদনার ভার নেন। এছাড়া নিজের লেখা বই 'হ য ব র ল', 'পাগলা দাশু', 'আবোল তাবোল', 'হেশোরম হুঁশিয়ারের ডায়েরি' প্রভৃতি বইতে তাঁর অনবদ্য ছবি গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে নতুন এক ধারার জন্ম দিল। লন্ডনে থাকার সময় রবীন্দ্রনাথের হাতে সুকুমার তুলে দেন সন্দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যা। রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি হন তেমনটাই বাবাকে চিঠিতে জানাচ্ছেন সুকুমার রায়। রবীন্দ্রনাথের কথা যখন এসেই গেল তখন তাঁর গ্রন্থনির্মাণ ভাবনা নিয়ে কিছুটা বলা যাক। এসময়ে উপেন্দ্রকিশোরদের মত রবীন্দ্রনাথও তাঁর শান্তিনিকেতনে বইছাপার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। বিশ্বভারতীতে ঝক্‌ঝকে হরফে নির্ভুল ছাপা; উপযুক্ত ছবির প্রয়োগে বাহুল্যবর্জিত

ছিমছাম বইপ্রকাশ করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছবি আঁকতেন। দেশবিদেশ ঘুরে ছবির প্রদর্শনী করছেন। ১৯৩৬ সালে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত 'গেছোদাদা', 'খাপছাড়া' অথবা 'সে', 'গল্পস্বল্প' তে ছবির সঙ্গে রেখার যে মেলবন্ধন ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ তা গ্রন্থচিত্রনে আলাদা একটি মাত্রা যোগ করে।

শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ তাঁরাও গ্রন্থনির্মাণ নিয়ে ভাবছেন। নিজেদের বইয়ের ছবি নিজেরাই আঁকছেন।

<u>গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর:</u> পাশ্চাত্যের কিউবিজম ঘরানার শিল্পী। সেই ঘরানাতেই আঁকেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র প্রচ্ছদ। 'জীবনস্মৃতি'র পাতাতেও রয়েছে তাঁর আঁকা অসামান্য কিছু ছবি। 'ভোঁদর বাহাদুর' এর মত ফ্যান্টাসীধর্মী বইতেও রয়েছে তাঁর শিল্পকর্ম। কার্টুন ও ব্যাঙ্গচিত্র আঁকাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

<u>অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর:</u> অবনীন্দ্রনাথও ইউরোপীয় ঘরানার শিল্পী। কিন্তু অচিরেই শান্তিনিকেতনে নিজস্ব দেশীয় চিত্রভাষা খুঁজে নেন। রবীন্দ্রনাথের 'বিস্ববতী', 'চিত্রঙ্গদা'-এর ছবি তাঁর হাতেই আঁকা। অবনীন্দ্রনাথের নিজের লেখা ও ছবির ভাণ্ডারও বেশ সমৃদ্ধ। ছোটদের জন্য লেখা 'নালক', 'ক্ষীরের পুতুল' বা 'ভূতপত্রীর দেশে' বইতে লেখার সঙ্গে ছবির এক অনন্য মেলবন্ধন করেন তিনি।

<u>নন্দলাল বসু:</u> নন্দলাল বসু শুধুমাত্র শিল্পী নন শিল্পাচার্য; তাই কেমন হবে বাংলার শিল্প থেকে গ্রন্থনির্মাণ সে বিষয়ে তাঁর ভাবনাও তিনি নানা বইতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯২২ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন তিনি। তারপর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে নতুন বঙ্গীয় চিত্রভাষা তৈরির চেষ্টা করেন তিনি। যাতে থাকবে ধ্রুপদী ও লোকচিত্রকলার ছায়া। তাই তাঁর হাতেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠের ছবির ভার দেন। ১৯৩০ সালে সহজপাঠের ছবি, ১৯৫৪ সালে 'চিত্র বিচিত্র' বইতে 'চলন্ত কলকাতা', 'শীত', 'হাট' ছবিতে তাঁর কাজ দেখতে পাওয়া যায়। 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা'ও তাঁর বিখ্যাত একটি কাজ।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে উপেন্দ্রকিশোর ও শান্তিনিকেতন গোষ্ঠীর বাদেও যাঁদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তাঁরা হলেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'ঠাকুরমার ঝুলি' এর কাঠখোদাইয়ের ব্লকে ছাপা শঙ্খমালা, মধুমালা, চ্যাঙব্যাঙের ছবি আমাদের সকলের শৈশবকে রঙিন করেছে। এই শৈশবের স্মৃতিতে আরো একজনের নাম থাকে তাঁর নাম সুখলতা রাও। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যা। সন্দেশের পাতায় শুধু সুকুমার নয় সুখলতা রাওয়ের ছবিও রয়েছে। নিজের লেখা 'দুখিয়ার দুখ', 'গল্প আর গল্প' নিজেরই আঁকা অনবদ্য সব ছবি। সদ্য শৈশব পেরোনো কিশোর-কিশোরীর অ্যাডভেঞ্চারের ভাবনাকে উশকে দেওয়ার জন্য ছিল যতীন্দ্রকুমার সেনের ছবি। রাজশেখর বসুর উৎসাহেই বিজ্ঞাপন ও বইয়ের অলংকরণের জগতে আসেন তিনি। পরে রাজশেখর বসুর 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কজ্জলী', 'গড্ডলিকা' এইসব গল্পগ্রন্থের ছবি এঁকে দেন যতীন্দ্রনাথ।

বিংশ শতকের প্রথমার্থ ও দ্বিতীয়ার্ধ মিলিয়ে গ্রন্থচিত্রণের কাজ করেছেন আরো অনেক শিল্পীরাই। তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, চিন্তামণি কর, পরিতোষ সেন, খালেদ চৌধুরি, রেবতীভূষণ ঘোষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতকের শেষ দিক জুড়ে

আছে হিমানীশ গোস্বামী, ময়ুখ চৌধুরি, অজিত গুপ্ত, প্রকাশ কর্মকার, গনেশ পাইন, যোগেন চৌধুরি, প্রণবেস মাইতি, নারায়ণ দেবনাথদের কাজ। এখনো কাজ কয়রে চলেছেন দেবব্রত ঘোষ, সুব্রত চৌধুরি, দেবাশিষ রায়, কৃষ্ণেন্দু চাকীর মত শিল্পীরা।

বিশ শতকের প্রথম তিনদশকে বাংলা গ্রন্থচিত্রন ইউরোপীয় প্রভাব থেকে বিশেষ মুক্ত হতে পারেনি। উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যতীন সেন এঁরা সকলেই অনুকরণ করছিলেন কোনো না কোনো বিদেশী পত্রিকাকে। তবে একটি ভালো বাংলা বইয়ের প্রকাশনা কেমন হবে তা দেখালেন এঁরা। শুধু ভালো ছবি নয় বইয়ের গঠনসজ্জা নিয়েও এঁরা ছিলেন যত্নবান। শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের হাত ধরে বাংলা বইয়ের ছবির একটি অন্য ধারা এরপর শুরু হল। নন্দলাল বসুরা দেশীয় শিল্পকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলার নিজস্ব একটি চিত্রভাষা তৈরি করছিলেন শান্তিনিকেতনে। তার প্রভাব দেখা গেল বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত বইগুলিতে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্পকলার যে মেলবন্ধন তাঁরা ঘটাচ্ছিলেন, তার সার্থকতা দেখা গেল সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। ডি। জে। কিমার বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ করে সত্যজিৎ যে অভিজ্ঞতা পেলেন তা দিয়ে ১৯৪৩ সালে 'সিগনেট প্রেস' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা খুললেন। যে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠা করল, গ্রন্থনির্মাণ আসলে একটি শিল্প। একটি বইয়ের প্রচ্ছদে রুচির প্রকাশ ও আতিথেয়তায় পাঠককে মুগ্ধ করে রেখেছিল সিগনেট প্রেস।

ছবি আর লেখা মিলেই যে একটি গ্রন্থের সঠিক বহিঃপ্রকাশ সম্ভব, একথা সকলেই বুঝতে পারলেন বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। লেখা আর ছবির যোগ্য সঙ্গতের আরেকটি প্রকাশমাধ্যমের কথা এখানে বলে রাখতে হয় তা হোল কার্টুন, কমিকস্, গ্রাফিক্স। বিংশ থেকে একবিংশের দিকে যাত্রা শুরু করল গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাস। বিশ শতকের গোড়া থেকেই বিভিন্ন সংবাদপত্র-পত্রিকায় বাংলায় ছোট ছোট কার্টুন বা কমিকস্ স্ট্রীপ দেখা গেছিল। ব্যঙ্গচিত্রে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। তবে ১৯৬০ নাগাদ বাংলায় কার্টুন ও কমিকস্ স্ট্রীপে বড় বিবর্তন দেখা যায়। ১৯৬২ থেকে নারায়ণ দেবনাথ শুকতারায় 'হাঁদা-ভোঁদা', 'বাটুল দি গ্রেট' নিয়ে কাজ শুরু করছেন। তারপর 'শুঁটকি মুটকি', 'নন্টে ফন্টে', 'বাহাদুর বেড়াল' 'ঋণশোধ 'কমিকস্' লিখছেন ময়ুখ চৌধুরি সন্দেশের পাতায়। কাফি খাঁ ওরফে প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ীর 'কার্টুন পেজ' যুদ্ধোত্তর মধ্যবিত্ত বাঙালীকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। যুদ্ধ থেকে ফুটবল ম্যাচ, মধ্যবিত্ত কেরানি থেকে বাড়ির বিধবা পিসি সকলেই উঁকি দিচ্ছিল শিল্পীদের ঘরোয়া তুলির ছোঁয়ায়।

গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে ছবি যেমন অনেক সময়ই লেখার শর্তে জুড়ছিল; কার্টুন কমিকস্-এ লেখা জুড়লো ছবির শর্তে। অনেকসময় ব্যঙ্গচিত্রের ক্ষেত্রে দেখব সেখানে লেখারও দরকার পরছে না, ছবিই সব বলে দিচ্ছে। কার্টুন, কমিকস্ এসব কিছুই তাই আরো একবার প্রমাণ করে ছবি লেখার সঙ্গে জোড়ে তাদের স্বাভাবিক ছন্দেই। তাই পুথি থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ মানুষ যখনই নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে গেছে সে ছবির কথা ভেবেছে। লেখা আর ছবি মিলে ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে আমাদের মুদ্রণশিল্প।

ছবি ৭: হাঁদা-ভোদা (নারায়ণ দেবনাথ)

৯.৪ অনুশীলনী

বাংলা প্রকাশনার ইতিবৃত্ত

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত পৃথিবীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কী? বইটির মুদ্রণের ধরন কীরকম?

২) গুটেনবার্গের আগে যদি ছাপ তোলবার যন্ত্র থকেই থাকে তবে গুটেনবার্গের উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার কী?

৩) বাংলায় মুদ্রিত কোন্ বইতে প্রথম বাংলা হরফ দেখতে পাওয়া যায়? বইটির প্রকাশকাল কী?

৪) 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬৪) টি কোন্ প্রেসে প্রথম ছাপা হয়েছিল? সেই প্রসের প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের প্রেস থেকে ছাপা দুটি বইয়ের নাম করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে যে বইছাপা হোত তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২) 'স্কুল বুক সোসাইটি' এর ছাপা বই নিয়ে আলোচনা করুন।

৩) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই কোন্ প্রেস থেকে ছাপা হোত? তাঁর প্রেসের আলোচনা করুন।

৪) উনিশ শতকে ভারতবর্ষে ছাপাখানার কদর বাড়বার কারণগুলি আলোচনা করুন।

বড় প্রশ্ন

১) বিশ শতকে বইয়ের প্রকাশনার বদল কীভাবে সম্ভব হল, আলোচনা করুন।

২) বাংলার ছাপাখানার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩) পাশ্চাত্যের ছাপাখানার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসে কোথায় পার্থক্য

তৈরি হয়েছে বিস্তারে ব্যখ্যা করুন।

৪) উনিশ শতকে প্রতিনিধি স্থানীয় প্রকাশনা সংস্থাগুলির একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

গ্রন্থবিন্যাস ও অলংকরণ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) 'গ্রন্থ' শব্দের উৎপত্তি, 'গ্রন্থ' শব্দের সমার্থক শব্দ ও তার বিভিন্ন অর্থের পরিচয় দিন।

২) হাফটোন ব্লকে ছবি ছাপবার উদ্যোগ বাংলায় কার? হাফটোন ব্লকে ছাপা ছবির উদাহরণ দিন।

৩) বাংলায় মুদ্রিত বাংলা ভাষার প্রথম সচিত্র বইটির নাম উল্লেখ করুন। সেই বইটিতে কটি ছবি ছিল? ছবিগুলির শিল্পীদের নাম উল্লেখ করুন।

৪) প্রথম কোন্ বাংলা বইতে লিথো ছবির ব্যবহার দেখা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১) কাঠখোদাই ও লিথোগ্রাফের পার্থক্য লিখুন।

২) গ্রন্থচিত্রণের ইতিহাসে শান্তিনিকেতনের ভূমিকা কি?

৩) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছবি ছাপবার পদ্ধতিসহ কয়েকটি বাংলা বইয়ের উল্লেখ করুন।

৪) 'ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটি' বা 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ'-এর ছাপা বই নিয়ে আলোচনা করুন।

বিস্তারিত প্রশ্ন

১) একটি গ্রন্থের উদাহণ দিয়ে তার গঠনবিন্যাস আলোচনা করুন।

২) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ছাপা বইয়ের অলঙ্করণের সঙ্গে দ্বিতীয়ার্ধে ছাপা বইয়ের অলঙ্করণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩) উনিশ শতকে বাংলা বইতে ছবি ছাপবার পদ্ধতির ধারনা দাও।

৪) বিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণে প্রতিনিধিমূলক শিল্পীদের কথা আলোচনা করুন।

৯.৪ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'বাংলা পুথির নানাকথা', কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, ১৯৯৬

অণিমা মুখোপাধ্যায়, 'পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা রীতি', কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১

অতুল সুর, "কাগজ ও কালি", 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল', ১৯৬৭; আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬

সুকুমার সেন, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮

অতুল সুর, 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর', কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫
আশিস খাস্তগীর, 'উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা', কলকাতা: সোপান, ২০১৪
গোলাম মুরশিদ, 'বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
গৌতম ভদ্র, 'ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?' কলকাতা: ছাতিম বুকস্, ২০১০
স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', কলকাতা: অবভাস, ২০০৭
স্বপন বসু, 'উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থচিত্রণ', কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১